সূচী পত্র।

নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণীকে আমার এই গ্রন্থের [illegible]
স্বামিত্ব বিক্রয় করিয়াছি। এই "মণিপুরের ইতিহাসের" ১ম সংস্করণে
"শ্রীমু—প্রণীত" এইরূপমাত্র লেখা ছিল। কিন্তু এই ২য় সংস্করণে
যদিও প্রকৃত [illegible] দিলাম।
থাকি, তথাপি ইহা যে ভবিষ্যতের [illegible] উপাদান [illegible]
সন্দেহ নাই।

পাঠক মহাশয় ইহার মধ্যে এমন বিবরণ ও অনেক পাইবেন, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তক বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এবং ইহাতে এমন সকল ঐতিহাসিক ঘটনা আছে, যাহা নবন্যাস ও নাটকের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তরঞ্জক হইতে পারিবে—অথচ তাহার এক বর্ণ ও সত্য ভিন্ন নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া এবং সম্ভবমতঃ তত্ত্ব লইয়া যাহা কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, তাহাই কেবল লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। এই পুস্তককে দ্বিভাগে বিভক্ত করা গেল—সাধারণ ইতিহাস ও দলীল বিভাগ। দলীল বিভাগটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে রাজকীয় কার্য্য-পরম্পরার সূত্র ও শৃঙ্খলা উত্তমরূপেই বোধগম্য হইবে।

সূচনাকালে সংবাদপত্রে যত পৃষ্ঠা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, লিখিতে লিখিতে পুস্তকখানি বৃহত্তর হইয়া পড়িল—ছবিও বেশী বই কম হয় নাই।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণরূপে সংশোধন ও উপযুক্ত ভাব-প্রকাশক শব্দাবলীর সন্নিবেশ পূর্ব্বক গ্রন্থকারকে চির বাধ্যতা ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার।

কলিকাতা, কার্ত্তিক, ১২৯৮ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা এই মণিপুরের ইতিহাস পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলেন বই খানি বেশ—অতি চমৎকার। কিন্তু ভাল বই হইলে কি হইবে

. . .. ২২৬০৩ সাধারণের সুবিধার্থ মূল্য বৃদ্ধি করা হইল না। এবার পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিলেই আমার ব্যয় ও পরিশ্রম সফল হয়।

কলিকাতা,
৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল। } প্রকাশিকা।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

বঙ্গের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় চিরদিনই আমার পরম পূজনীয় ব্যক্তি। আমি বরাবরই তাঁহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়া জানি। কাল প্রভাবে তিনি এখন অতি বৃদ্ধ ও প্রায় চলচ্ছক্তি হীন হইয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে আমি কয়েক-খানি পুস্তক লিখিয়াছি। এক্ষণে আরও নানারূপ গ্রন্থ তাঁহার অনু-করণে রচনা করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যথার্থ সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেরূপ শক্তি ও অবসর আমার নাই। তথাচ মনোমোহন বাবুর নামানুসারে যে দেশ বিখ্যাত "মনোমোহন লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সহিত আমার এই "মণিপুরের ইতি-হাসের" চির সম্বন্ধ থাকে, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। তজ্জন্য উক্ত লাইব্রেরীর বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারিণী মনোমোহন বাবুর পৌত্রী—শ্রীমতী

সূচী পত্র।

নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণীকে আমার এই গ্রন্থের [illegible] স্বামিত্ব বিক্রয় করিয়াছি। এই "মণিপুরের ইতিহাসের" ১ম সংস্করণে "শ্রীমু—প্রণীত" এইরূপমাত্র লেখা ছিল। কিন্তু এই ২য় সংস্করণে আমার সম্পূর্ণ নাম দিলাম।

কলিকাতা,
৪১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(স্বরচিত)

আমার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত বাহারপুর গ্রামে। আমাদের গ্রাম ছোট হইলেও বেশ জানিত ও গণিত পল্লী। আমাদের গ্রাম সাতগাছিয়া থানার এলাকাধিন্। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথের মেমারি ষ্টেসনের ১ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব দিকে আমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত বাঁধা পাকা রাস্তা এবং আমাদের নিজ গ্রামেই একটী মধ্য শ্রেণীর ভাল ডাকঘর আছে। বাহারপুরের পরম ধার্ম্মিক সদাশয় ও সদাব্রত পরায়ণ জমিদার ৺ গোপী মোহন চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বধর্ম্মপরায়ণ ৺ রাধাকৃষ্ট চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আমি। নদীয়া জিলার অন্তঃর্গত রাণাঘাট নিবাসী পরম ধার্ম্মিক ও কার্য্যদক্ষ বিষয়ী ৺ রাম মোহন মিত্র মহাশয় আমার মাতামহ। আমি জাতিতে কায়স্থ—দাস ঘোষ

[illegible]ন্ কেনেলের জলে কৃষিকার্য্য পরিচালনের সুব্যবস্থার জন্য প্রায় লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছি। তাহাতে এই প্রায় অনাবৃষ্টির যুগে আজি ২২—২৩ বৎসর কাল যাবৎ সাধারণে চাষের ও স্নান পানের জল পাইয়া যে কি উপকৃত হইতেছে, তাহা এখানে লেখা অনাবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঐ সম্বন্ধে ইডেন্ কেনাল ইরিগেশন য়্যাক্ট নামে যে আইন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার প্রথম মুসবিদাকারক ও সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগ কর্ত্তা আমি। এই কার্য্যের জন্য তদানীন্তন কমিশনার (যাঁহার নামানুসারে দার্জ্জিলিঙ্গে লাউইস জুবিলী সেনিটেরিয়ম স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) মহোদয় আমাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সবিনয়ে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার ঐ কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত এল্ হেয়ার সাহেব বাহাদুর বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি কিছু দিন আমাদের বর্দ্ধমান জিলার কালেক্টর ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব মহাশয়ের বিরুদ্ধে আজ কাল অনেক কথা শুনিতে পাই কিন্তু আমি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কার্য্য দক্ষতা, দেশোপকার প্রিয়তা ও সদাশয়তায় সে সময় মোহিত হইয়াছিলাম। তিনি যখন কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর ছিলেন সে সময়েও আমার নিজের কোন কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার উক্ত গুণের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বাঙ্গালী পাঠক আমাকে নরকে পাঠাইলেও আমি সত্য কথা বলিতে বাধ্য। এই দ্বিতীয় সংস্করণকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য যেরূপ সময়ক্ষেপ ও পরিশ্রম করা উচিত ছিল দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আমি পারি নাই।

সূচী পত্র।

(ইতিহাস)

দলীল বিভাগ

চিত্রের তালিকা।

ভ্রম সংশোধন।

	পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
ইতিহাস...	১১৪	১৩	১২৯৮	১২৯৭
ঐ	১২৫	৮	১২৯০	১৮৯১

ইংরাজ সৈন্যের প্রবেশ

১ পৃষ্ঠা।

মণিপুরের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ।

কোন দেশের ইতিহাস পড়িতে হইলে, সে দেশ কোথায়, তাহাতে পর্ব্বত, হ্রদ, নদ, নদী ও ভূমির অবস্থা কিরূপ, স্বভাব ও শিল্প-জাত পদার্থ কি প্রকারের, অধিবাসীর সংখ্যা কত ও কিরূপ আকৃতি প্রকৃতির লোক তথায় বাস করে, ইত্যাদি বিষয় জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মে। ফলতঃ ঐতিহাসিক বিবরণ সম্যক্ উপলব্ধি পক্ষে এসমস্তই অবগত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রে মণিপুরের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বিবরণাদি পাঠকগণের গোচর করিব।

অবস্থান—মণিপুর ভারতের উত্তরপূর্ব্ব দিকে, স্বাধীন বা পার্ব্বতীয় ত্রিপুরার ঠিক উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এবং উভয় রাজ্যের প্রান্ত সীমার মধ্যে ১৪।১৫ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। সুগম পথ থাকিলে পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহের সহর হইতে শিলচর বা কাছাড় পার হইয়া, সহজেই মণিপুরে যাওয়া যাইত। ময়মনসিংহ হইতে শিলচর পর্য্যন্ত একটি সরল রেখা টানিয়া, সেই রেখা পূর্ব্বদিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, তাহা ঠিক মণিপুর রাজধানী বা তাহার নিকট দিয়া

যাইবে। শিলচর হইতে মণিপুর রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ৮।১০ ক্রোশ মাত্র দূর এবং মণিপুর সহরটী ২০।২২ ক্রোশের বেশী অন্তরে হইবে না। শ্রীহট্ট হইতে ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে গেলেই মণিপুর রাজ্যে উপনীত হওয়া যায়। শ্রীহট্ট বা শিলচর হইতে উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয় পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইতে হইলে, মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়াই সুবিধা।

চতুঃসীমা—মণিপুরের উত্তর সীমা নাগা-পাহাড় বা নাগাপর্ব্বত-জেলা এবং বিভিন্ন নাগাজাতির অনাবিষ্কৃত পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহ। পশ্চিম সীমা ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের কাছাড় জেলা। পূর্ব্বসীমা উত্তর ব্রহ্মের শান প্রদেশ। দক্ষিণ সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট নহে; সে দিকে লুসাই, কুকি ও সুতি জাতীয় অনার্য্য লোকের দেশ। এই প্রদেশ ও মণিপুর রাজ্য মধ্যে স্বাভাবিক সীমা বিশেষ কিছুই নাই এবং মনুষ্য কর্তৃকও কখন বিশেষরূপে কিছুই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এই সকল জাতির উপর মণিপুরেশ্বরের সাময়িক প্রভুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সীমার খর্ব্বতা বা বিস্তৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং দক্ষিণ সীমাটী পরিবর্ত্তন শীল। উত্তর সীমা সম্বন্ধেও অনেক পরিমাণে এইরূপ কথা খাটে। ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন পূর্ব্ব সীমারও সর্ব্বদা গোলযোগ ঘটিত। ১৮৩৪ সালে ইংরাজ মধ্যস্থতা করিয়া, কুবো উপত্যকা হইতে ঠিক উত্তর দিকে একটি আনুমানিক রেখা কল্পনা করেন এবং তাহাই ব্রহ্ম ও মণিপুর রাজ্যের সীমা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহা পেম্বার্টনের সীমা-রেখা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এইরূপে কতক দিন চলে; কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রহ্মবা বারম্বার দৌরাত্ম্য করায়, ১৮৮১ সালে ব্রহ্ম ও মণিপুররাজের সম্মতিক্রমে ভারত গভর্ণমেণ্ট আবার মধ্যস্থ হইয়া, একটি সীমাসমিতি

(বাউণ্ডারি কমিশন) নিযুক্ত করেন। সেই সমিতি, আঙ্গোচিঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণীর শিরোদেশ হইতে সিরোইফেরার গিরির শিখরদেশ পর্য্যন্ত স্বভাব-সৃষ্ট সহজ-বোধ্য সীমা-রেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

ইংরাজ-ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে মণিপুর এবং আর একটি স্বাধীন বা অর্দ্ধ স্বাধীন রাজ্য আছে। সেটি পার্ব্বত্য ত্রিপুরা। স্বাধীন ত্রিপুরার আয়তন মণিপুরের প্রায় অর্দ্ধেক। ময়মনসিংহ, শিলিগুড়ি বা ঢাকা হইতে ব্রহ্মরাজধানী মান্দালয় উদ্দেশে শর-নিক্ষেপ করিলে, সেই শর কে স্বাধীন ত্রিপুরার উপর দিয়া যাইতে হয়। এইরূপ গৌহাটি, শিলং, শ্রীহট্ট বা শিলচর হইতে নিক্ষিপ্ত শর, মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়া তবে মান্দালয়ে পৌঁছিবে। স্বাধীন ত্রিপুরার চতুর্দ্দিকেই ইংরাজ-প্রভুত্ব শনৈঃ শনৈঃ স্থাপিত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

মণিপুরের উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে নাগা, কুকি, লুসাই, সুতি প্রভৃতি জাতির অল্প-পরিসর দেশ আছে বটে, কিন্তু এই সকল জাতি নামে মাত্র স্বাধীন। ফলতঃ তাহারা জঙ্গলী, অসভ্য, পাহাড়ীয়া বলিয়াই স্বাধীন। অর্থাৎ সে স্বাধীনতা, তাহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, বল, বিক্রমের ফল নহে, নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই অগ্রাহ্য ভাবে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ইংরাজের অনুগ্রহে তাহা রক্ষা পাইতেছে। কিন্তু ঐ কারণে এবং নিবিড় বন, দুর্গম পথ, দুরারোহ গিরিবর্ত্ম, গভীর গুহা ও অনুর্ব্বরা ভূমির কল্যাণ যতই কেন স্বাধীন থাকুন না, আমাদের গবর্ণমেন্টের কাছে নিশ্চয়ই তাহারা নতশির থাকিতে এবং পাকতঃ সকল বিষয়েই অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে।

অতএব মণিপুর রাজ্যের উল্লিখিত সীমাগুলি, প্রকারান্তরে ব্রিটিশ রাজ্যেরই অংশ। আবার ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজ থিবর অধিকৃত দেশ এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত এবং শান প্রদেশ উত্তর ব্রহ্মের একটি

বিভাগ রূপে গণ্য হওয়াতে, মণিপুরের পূর্ব্ব সীমান্তেও ব্রিটিশ পতকা স-গৌরবে উড়িতেছে। আর পশ্চিম সীমার তো কথাই নাই—সে দিকে দণ্ডবিধি-দণ্ডিত, পুলিস-শাসিত ও সিবিলিয়ান-বিরাজিত কাছাড় জেলা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ব্রিটিশাধিকার, মণিপুর-রাজ্যটিকে পূর্ব্ব হইতেই ঘিরিয়াছিল, এখন তো অভিনব ব্যবস্থায় প্রকারান্তরে কবলিত করিতেছে। ইহা স্বাভাবিক—প্রবলের সংঘর্ষে দুর্ব্বল নত হইবে বিচিত্র কি? লৌহ-পাত্রের সহিত মৃণ্ময় ক্ষুদ্র পাত্রের সর্ব্বদা সংঘর্ষণ ঘটিলে, যতই কেন সাবধানে রাখা হউক না, অচিরাৎ ভঙ্গ হইবেই হইবে।

প্রতিভান্বিত পঞ্জাব-সিংহ মহারাজা রণজিৎ সিংহ স্বীয় প্রজ্ঞা-চক্ষে ইহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন "সব্ লাল হো যাগা"। সমগ্র ভারতে তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে।

বিস্তার—উত্তর দক্ষিণে মণিপুর রাজ্যের সর্ব্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ক্রোশ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে তদ্রূপ বিস্তৃতি প্রায় ১০ ক্রোশ। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রায় ১৮০ বর্গ ক্রোশ হইবে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য—আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্ম ব্যাপিয়া যে দুর্গম ও বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাহার ঠিক মধ্যস্থলস্থ উপত্যকা লইয়াই প্রধানতঃ মণিপুর রাজ্য সংগঠিত। ইহার বিস্তার, পশ্চিম সীমার দিক্ অপেক্ষা পূর্ব্ব ভাগে কিছু অধিক; মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত কম; আবার, উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণ দিকে অনেক বেশী। উপরে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থের গড় পরিমাণ দিয়াছি মাত্র। ভারতের মান-চিত্রে দেশটী দেখিতে কতকটা বৃন্তহীন বার্ত্তাকুর মত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মণিপুর পর্ব্বতময় দেশ; ইহাতে শত শত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সানু, অধিত্যকা ও উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে

ব্রহ্ম সীমায় কুবো একটি বিখ্যাত উপত্যকা। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান উপত্যকায় মণিপুর রাজধানী অবস্থিত। সমগ্র রাজ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ বিঘা ভূমি আছে, তন্মধ্যে আবাদ-যোগ্য ভূমির পরিমাণ কিঞ্চিন্নূ্যন ২ লক্ষ বিঘা মাত্র হইবে।

মণিপুরের পর্ব্বতশ্রেণী সমূহ সাধারণতঃ উত্তর-দক্ষিণে সংস্থিত। তাহাদের মধ্যে মধ্যে ব্যবধানও আছে এবং কোথাও বা অনুচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল, মহোচ্চ গিরিরাজির সংযোজক শৃঙ্খল রূপে, পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পর্ব্বত-শ্রেণী সকল দক্ষিণে, মণিপুর ছাড়াইয়া, চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্য দিয়া, ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া, পরিশেষে একবারেই মাটির সহিত মিশিয়াছে। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি বিভিন্ন—কোথাও অত্যুন্নত মন্দির-চূড়ার ন্যায় কেবলই কঠিন শিলাময়, কোথাও বা মনোহর ঘন বনরাজি-সমাচ্ছন্ন, কোথাও বা অনুর্ব্বর, প্রশস্ত, প্রস্তরখণ্ড সমূহে পর্য্যাপ্ত। নিজ মণিপুর-উপত্যকার পশ্চিম দিকেই গিরি সকলের উপরিভাগ ঢালু আকারের এবং উপত্যকার পার্শ্বদেশস্থ পর্ব্বত সমূহের ঊর্দ্ধ প্রদেশ অপেক্ষাকৃত সমধিক সমতল ও দীর্ঘায়ত। তথায় কৃষিকার্য্যও হইয়া থাকে।

মণিপুরে স্বাভাবিক জলাশয় (অর্থাৎ হ্রদ) অনেক আছে। গিরি-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে অনতিবৃহৎ হ্রদ সকল দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতোপরিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ স্থান বিশেষে রহিয়াছে। রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদটীর নাম লোগটাক। পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে উপত্যকার দিকে যাইতে সম্মুখ ও দক্ষিণ ভাগে ইলাই সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্শ্বস্থ অনুচ্চ পর্ব্বত নিচয়, তাহার জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অতি সুন্দর দেখায়। লোগটাক

হ্রদের দক্ষিণ তীর, পর্ব্বত-পাদ-মূল পর্য্যন্ত, অকর্ষিত পতিত ভূমি—কুশ, কেশে, দূর্ব্বা প্রভৃতি নানা প্রকার ঘাসের জঙ্গলে আচ্ছাদিত, সে দিকে বৃক্ষাদি প্রায়ই নাই।

লোগটাকের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গ্রাম ও নগরাদি বিরাজ করিতেছে। উত্তর দিকের এক কোণে রাজধানী মণিপুর অবস্থিত। সহরের অনতিদূরেই গিরিরাজি পরিশোভমান। এ বিভাগে বৃক্ষাদি বিস্তর আছে এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ স্থান।

মণিপুরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মত বৃহৎ নদী একটিও নাই, কিন্তু দামোদর ও রূপনারায়ণের মত খরবেগবতী নদী কয়েকটী আছে। কাছাড় হইতে মণিপুর যাইতে হইলে যে সকল নদী পার হইতে হয়, তাহাদের নাম জিরি, মুক্রু, বরক, ইরং, লেংবা ও লেমিটাকা। জিরি, ব্রিটিশ ও মণিপুর রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। জিরির যে স্থলে গভর্ণমেণ্টের রাস্তা অতিক্রম করিতেছে, সেখানে নদীর বিস্তৃতি ৮০।৮৫ হাতের বেশী নহে। অজয় বা ময়ূরাক্ষি নদীর সহিত জিরির তুলনা হইতে পারে। শীত ও গ্রীষ্মকালে, জিরিতে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; কেবল বর্ষাকালেই খেয়ার প্রয়োজন হয়। জিরির পূর্ব্ব দিকে মুক্রু নদী। ইহা জিরির সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। ইহার জল অতি নির্ম্মল; বর্ষাকালে ইহা প্রচণ্ড গতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। অন্য সময়ে মুক্রু হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মণিপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বরকই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পণ্য নদী। মুক্রু, ইরাং ও তিপাই নদী, লুশাইদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া, রাজ্যের উত্তরাংশ বিধৌত করিয়া বরকের সহিত মিলিয়াছে। আরও নিম্নে জিরির জল বরকে আসিয়া পড়িতেছে। বরক নদীতে (অনেক দূর পর্য্যন্ত) প্রায় বারমাসই

নৌকা চলে। শীত ও গ্রীষ্মকালেও বরকে এক কোমর গভীর জল থাকে। মণিপুর রাজধানীর নিকট দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাকে "মণিপুর" বলিয়া থাকে। "মণিপুর" ইরাবতীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মণিপুর রাজ্যের নদী সকল উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ পর্ব্বত সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রায়ই উত্তর ব্রহ্মের নিংথি বা চিণ্ড-উইন নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনটি নদী লোগটাক হ্রদে গিয়া পড়িয়াছে এবং একটি মাত্র তাহার জলদ্বারা পরিপোষিত হইয়া, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া মণিপুর রাজ্য ছাড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন মণিপুরে শত শত খাল ও জোল আছে—বর্ষাকালে সে গুলি পর্ব্বত সমূহের গাত্র বেড়িয়া, পাদ-প্রক্ষালন করিয়া, উপত্যকার রস ও শোভা বাড়াইয়া, কল কল শব্দে, মৃদু মন্দ বা তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয়; অন্য সময় সে গুলিতে বারি বিন্দু মাত্রও থাকে না।

মণিপুর রাজ্য মধ্যে এমন স্থান বিরল, যাহার ২।৩।৪ ক্রোশের মধ্যে পর্ব্বত-শ্রেণী বা পৃথক্ পর্ব্বত নাই। সে সব ভূধর শ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্ আখ্যা এবং অংশ বিশেষের পৃথক্ পৃথক্ নামও আছে। যে পর্ব্বত বা তাহার যে অংশ যে জনপদ-সন্নিহিত, অনেক সময় সেই স্থানের নামানুসারেই তাহার নাম করণ হইয়াছে। অনেক পর্ব্বতেই কন্দর ও গহ্বর দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৪।৫টি বৃহদায়তন ও প্রসিদ্ধ। সে সব গুহার মধ্যে ১৫০।২০০ লোক বিনা ক্লেশে বাস করিতে পারে। বিশেষতঃ সীমান্ত প্রদেশে এমন একটি বিশাল গহ্বর আছে, যাহার প্রস্তরাচ্ছাদিত সুদৃঢ় ছাদের তলে ৭।৮ শত লোক পরম সুখে সমবেত হইয়া মজলিস করিতে পারে।

নির্ঝর ও প্রস্রবণ—মণিপুর রাজ্যের পর্ব্বত-শ্রেণীর গাত্র ও

শিখর দেশ ভেদ করিয়া, অনেক গুলি জল-প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্য প্রদর্শন করে। আবার কত নির্ঝর কৃষ্ণ-অঙ্গে শ্বেত মেখলার ন্যায় শোভা ও শৈত্য বিস্তারিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি দেখিতে বড় সুন্দর। অধিকাংশ নির্ঝরই মৃদুতেজে, শ্রুতি-মধুর শব্দে হৃদয়ে প্রফুল্লতা জন্মায়। কোন কোনটি বা প্রচণ্ড বেগে ও গভীর নিনাদে স্বীয় সজীবতা ও প্রাধান্যের পরিচয় দেয়। আবার পর্ব্বত-দেহ ও সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেকগুলি উৎস উৎপন্ন হইয়া কি মনোরম ক্রীড়াই প্রদর্শন করে। এই সকলের প্রাচুর্য্য ও সাহায্য বশতঃই মণিপুরের নদ নদী ও অন্যান্য জলাশয় দারুণ গ্রীষ্মের দুরন্ত উত্তাপেও প্রায় একবারে বারি-বিহীন হয় না। ফলতঃ প্রকৃতির ভয়াবহ মধুর আকৃতি প্রকৃতি সন্দর্শনের বাসনা থাকিলে মণিপুরে যাও; তত্রত্য পর্ব্বত, উপত্যকা, অধিত্যকা, সানু, কন্দর, কানন, হ্রদ, নদ, নদী, উৎস, প্রস্রবণাদি তোমার সে অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ করিতে পারে।

ভূমির বাহ্যভাব—দেশের উত্তর (অর্থাৎ মণিপুর রাজধানীর) দিক হইতে ভূমি ক্রমশঃ লোগটাক হ্রদ পর্য্যন্ত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। হ্রদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ ক্রমশঃ উন্নত। এই গোলটাক হ্রদটি মণিপুরের একটি প্রকাণ্ড সরোবর-বিশেষ এবং তাহারি চতুপার্শ্বস্থ পাহাড়ে যেন রাজ্যটি নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড় ভিন্নও উন্নত অথচ প্রায় সমতল ভূমি প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, সেগুলির অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকার, অল্পাংশ বৃহদায়তন।

প্রাজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে সমগ্র মণিপুর-উপত্যকা জুড়িয়া, একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। কালবশে, মৃত্তিকাও প্রস্তরাদি সঞ্চয়ে, ক্রমশঃ তাহার চতুপার্শ্ব পূরিয়া উঠিয়াছে;

সুতরাং জলভাগ ক্রমশঃ অল্প পরিসর হইয়া, পরিশেষে বর্ত্তমান লোগটাক হ্রদে পরিণত হইয়াছে। লোগটাক এখনও নাকি ক্রমশঃ খর্ব্বাকৃতি হইতেছে। জল ও স্থল লইয়া, প্রকৃতি দেবী পৃথিবী মধ্যে অনেক স্থানেই এইরূপ খেলা খেলিয়াছেন ও খেলিতেছেন এবং বোধ হয়, চিরদিনই খেলিবেন।

অরণ্য—পর্ব্বতময় মণিপুর রাজ্যের অধিত্যকা উপত্যকা প্রভৃতি বহু স্থলে বৃহদাকার বনস্পতিব্যূহ বিরাজিত ও অতুল শোভায় শোভিত। তাহাদের বহুদূর-প্রসারী সুবিশাল শাখাপল্লবময় সমুচ্চ শিরোদেশ নালিমার ঘন ঘটায় অতি সুদৃশ্য। কাছাড় ও মণিপুর উপত্যকা-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী, উত্তর-দক্ষিণে দিগন্তব্যাপী ভূধরনিচয় ঘন নিবিড়ারণ্যে সমাচ্ছন্ন। গিরিরাজির পাদমূল হইতে শিখর-দেশ পর্য্যন্ত নানাজাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষে মণ্ডিত।

জলযান ও গৃহাদি প্রস্তুত জন্য মণিপুরের পার্শ্বস্থ গিরি-গাত্র হইতে যে সকল বৃহৎ বৃক্ষ ছেদিত হইতেছে, তাহাতে কত যাইবে? বৃহৎ বৃক্ষের বিশাল কানন এখনও অটুট অবস্থায় আছে।

বন্য বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর, জারুল, পারুল, বংশীবট (ইহারই নির্য্যাসে রবার হয়), অর্জ্জুন, ইন্দ্রযব, কেলিকদম্ব, তমাল, ওক, তুঁদ প্রভৃতি মহা-মহীরূহ (গবর্ণমেণ্টের রাস্তার ধারে না থাকিলেও) সর্ব্বত্রই প্রাপ্য। হীরক পর্ব্বতশ্রেণীতে দেবদারু জাতীয় নানাপ্রকার মহোচ্চ বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-সীমান্তে, কুবো উপত্যকায় মূল্যবান সেগুণ বৃক্ষ শত সহস্র বিদ্যমান। জঙ্গলের মধ্যে, কোন কোন স্থানে ঘন-বিশিষ্ট বংশীবটের শাখা-পল্লবচয়বিনির্ম্মিত কি সুচারু ছায়ামণ্ডপ! আহা! কোথাও বা নাগেশ্বর চম্পকের বহুদূর-ব্যাপী অপূর্ব্ব কুঞ্জ। সুখের বসন্তে তাহাদের স্বর্গীয় কুসুম-সৌরভে চতু-

দ্দিক আমোদিত ও ভ্রামকের মন প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে অপরাহ্নে বংশীবট-মণ্ডপে বসিয়া যিনি কখন সেই পরিমলের আঘ্রাণ সুখানুভব করিয়াছেন, তিনি আর এ জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

উত্তরাঞ্চলে, পর্ব্বতব্যূহের মধ্যে উপত্যকা বিভাগীয় তরুগণ অতি বৃহদাকার। সে সকল স্থানে বাঁশের ঝাড় প্রায়ই নাই। ক্ষুদ্র বৃক্ষও অল্প পরিমাণ মাত্র পরিলক্ষিত হয়। নতুবা মণিপুরের প্রায় অন্য সর্ব্বত্রই বংশগুচ্ছ, ঝাঁটিগাছ, ঝাউবনাদি বৃহদ্বনস্পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে অনুগত দাস দাসীর ন্যায় তাহাদের মুখ চাহিয়া যেন রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত, সহস্র প্রকারের লতা বল্লরী স্ত্রী-কন্যাবৎ তাহাদের আশ্রয়ে ও অঙ্গে জড়াইয়া অতুল শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, এবং মানবদেহের ব্যাধিউপশমের পরম সহায় হইতেছে। কেবল, স্থানে স্থানে লতা গুল্ম এত ঘন ও পাদপকুলের সহিত এত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, তাহা পার হইয়া বন্যজন্তুরাও যাইতে পারে না। কুত্রাপি বা বনলতাব্যূহ এরূপ আশ্চর্য্য প্রকারে অসূর্য্যম্পশ্য মণ্ডপ-ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইয়া নর-শিল্পীকে ধিক্কার দিয়া, সেই পরমকারণ পরম শিল্পীর মহিমাগানে হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠে।

মণিপুর ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে—হীরক পর্ব্বতশ্রেণীর গাত্র-দেশে—স্বভাবজ চা বৃক্ষের বন দেখিতে পাওয়া যায়। মণিপুর রাজ্যের নানা স্থানে বন্য নীল এবং রঙ-প্রস্তুতোপযোগী নানা প্রকার বৃক্ষ বল্লরীও যথেষ্ট আছে। জিরি নদীর তীরবর্ত্তী ও রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন, প্রায় আর কোন স্থানেরই আরণ্য বৃক্ষাদি এ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত ও মানব-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অধিবাসী, বন্য ও গ্রাম্যজন্তু, পশু, পক্ষী প্রভৃতি।

ভারত গভর্ণমেণ্টের পরামর্শানুসারে, ১৮৮১ সালে মণিপুরের মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ, স্বীয় রাজ্যের লোক সংখ্যা করাইয়াছিলেন। সে সময় ২ লক্ষ ২১ হাজার ৭০ জন লোক, মণিপুর রাজ্যের স্থায়ী প্রজা ছিল। তন্মধ্যে পুরুষ ১,০৯,৫৫৭ জন। স্ত্রী ১,১১,৫১৩ জন। তবেই দেখা যাইতেছে যে মণিপুর রাজ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক কিছু বেশী। তথায় সর্ব্বশুদ্ধ ৯৫৪ খানি গ্রাম এবং ৪৫,৩৩২ টি বসত বাটী আছে। প্রতি অর্দ্ধ-বর্গ-ক্রোশ পরিমিত স্থানে গড়ে প্রায় ৬খানি গ্রাম এবং ২৭ জন করিয়া লোক বসতি করিয়া থাকে। গড়পড়তায় প্রতি গৃহে প্রায় ৫ জন করিয়া লোক হয়।

ধর্ম্ম ও জাত্যনুসারে, অধিবাসীদিগকে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, মণিপুর রাজ্যে—

হিন্দু	১,৩০,৮৯২
মুসলমান	৪,৮৮১
নাগা, কুকি, লুসাই প্রভৃতি বন্য জাতি	৮৫,২৮৮

পলিটিকেল এজেণ্ট ও তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন খৃষ্টান মণিপুরে বাস করে। ব্যবসা বাণিজ্যার্থে দুই চারি জন বৌদ্ধও কখন কখন তাথায় থাকে।

ব্যবসানুসারে, অধিবাসীগণের শ্রেণী বিভাগ করিলে, এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) উচ্চ শ্রেণী—(সর্ব্বপ্রকারের রাজকর্ম্মচারী, বিদ্বান, গুরু, পুরোহিত, বৈদ্য ইত্যাদি)—১২,১৬৯ পুরুষ, ২,৮৫৮ স্ত্রী।

(২) সরাই ও বাসাবাটী রক্ষক, ভৃত্য প্রভৃতি ৭,৩২৪ পুরুষ, ৭,৬৭২ স্ত্রী।

(৩) ব্যবসায়ী—(মহাজন, কুঠিয়াল, আড়তদার, বাহক ইত্যাদি) ৫৭২ পুরুষ, ১৪,৮৬১ স্ত্রী।

(৪) কৃষক, মেষপালক, গোমহিষাদি রক্ষক প্রভৃতি—৫১,০৫৭ পুরুষ, ৫২,৮৮০ স্ত্রী।

(৫) শিল্পী, কারিকর ও শ্রমজীবী। ২,১২৫ পুরুষ, ৯১৭ স্ত্রী।

(৬) অন্যান্য লোক ও নিষ্কর্ম্মার দল—বালক, বৃদ্ধ ও অনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ীদিগকেও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে—৩৬,৩১০ পুরুষ, ৩২,৩২৫ স্ত্রী।

জাতি ও ধর্ম্ম—মণিপুর হিন্দুর রাজ্য; রাজবংশ বিষ্ণুমন্ত্রে উপাসক। বিলক্ষণ অনুভব হইতেছে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা অর্জ্জুনের পুত্র কীর্ত্তিবান বভ্রুবাহনের সময় হইতেই মণিপুরে কৃষ্ণমূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি, নবদ্বীপচাঁদের সাক্ষাৎ-ভক্ত গোস্বামী ঠাকুরেরা সেখানে গিয়া, সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন, সজীবতা সম্পাদন ও অনেকানেক স্থলে নূতন বীজ বপন করিয়াছেন। অধুনা কিন্তু মণিপুর-রাজার গুরুকুল বহরমপুর নগরে বাস করিতেছেন।

রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে দেবালয়, মঠ, ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি বিস্তর বিদ্যমান। সে সমস্তের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, মহারাজার সরকার হইতে নিষ্কর ভূমি দেওয়া আছে এবং নানাপ্রকারে সাহায্য দান করা হইয়া থাকে। হিন্দু মণিপুরীরাও তদ্রূপ দেবকার্য্যে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অর্থদানে সতত মুক্ত-হস্ত। খৃষ্টধর্ম্মের প্রোটেষ্টাণ্ট শাখা যেমন ইংলণ্ডের রাজধর্ম্ম, মণিপুরের রাজধর্ম্ম, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বৈষ্ণবী তন্ত্রের শাখা।

হিন্দু মণিপুরীরা, প্রধানতঃ ৮টি জাতিতে বিভক্ত। আবার

উপজাতিও অনেক আছে। বঙ্গের ও মণিপুরের জাতিবিভাগের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য আছে। রাজপরিবার ক্ষত্রিয়—বভ্রুবাহন-বংশসম্ভূত, তদ্ভিন্ন হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অধিক। এই ক্ষত্রিয়েরা চন্দ্রবংশীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন। সুদূর রাজপুতানার ন্যায়, মণিপুর রাজ্যে ক্ষত্রিয় জাতির মানসম্ভ্রম যথেষ্ট। ক্ষত্রিয় গৌরবে মণিপুর পরিপূরিত ও গৌরবান্বিত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ব্যবসা। আমাদের দেশের কোল, ধাঙ্গড়ের মত, মণিপুরে একটি সর্ব্বনিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহাদিগকে লোই বলিয়া থাকে।

মণিপুরে হিন্দুদিগেরই প্রাধান্য অধিক এবং তাঁহারাই উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোক। হিন্দু মণিপুরীয়া বেদ-বিহিত শাস্ত্র ও প্রথানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দেব-দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত দেব দেবী ভিন্ন (বিশেষতঃ ইতর শ্রেণীর মধ্যে), আরও প্রায় তিন শত নূতন দেব-দেবীর নাম শুনা যায়। যাহাকে বলে "দেশ-চলতি", সে গুলি তাই।

মণিপুরে যে সকল মুসলমান অধিবাসী আছে, তাহারা বা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ, বঙ্গদেশ—বিশেষতঃ আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম হইতে কতক বা ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া সেখানে বসতি করিয়াছে। মুসলমান রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াও অনেকে সে জাতির পরিপুষ্টি সাধক হইয়াছে। মুসলমানেরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত—সিপাহি, বাগানী, সূত্রধর ও বাসননির্ম্মাতা। মণিপুরী মুসলমানেরা শিয়া বা সুন্নী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহে—তাহারা কেবল একমাত্র আল্লাকে জগদীশ্বর এবং মহম্মদকে তাঁহার প্রেরিত দূত ও ধর্ম্ম-প্রচার কর্ত্তা বলিয়া জানে ও মানে।

লুসাই, নাগা ও কুকি জাতিরা অসংখ্য শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত।

তাহারা সাধারণতঃ এক দয়াময় পরমশক্তিকে বিশ্বাস করে—তথাচ পর্ব্বতে, কন্দরে, গ্রামে, জঙ্গলে, অসংখ্য (মঙ্গলময় ও অনিষ্টকারী) দেব ও প্রেতযোনি আছে ভাবিয়া, তাহাদিগকেও ভয় বা ভক্তি করিয়া থাকে। তাহারা সে সকলকেই অসীম ক্ষমতাধারী বলিয়া বিশ্বাস করে, সুতরাং কাহাকেও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিতে সাহসী হয় না। সেই সকল কাল্পনিক দেবদেবীকে, নানাপ্রকারে—ষোড়শোপচারে বলিদানের সহিত পূজা করিয়া থাকে। এই সকল পার্ব্বত্য জাতি, পরকাল আছে বলিয়া জানে, কিন্তু এ জীবনান্তে তাহাদের পরমাত্মার তথায় কি হইবে, তাহা কোথায় কিরূপে থাকিবে এবং নিজ-কৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ কিরূপে ঘটিবে, ইত্যাদি বিষয়ে, প্রত্যেক জাতির, এমন কি বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে মতৈক্য প্রায়ই নাই। পার্ব্বত্য জাতীয়েরা অনেকাংশে একপ্রকার হিন্দু—অন্ততঃ তাহাদের অনেক-শ্রেনী হিন্দু দেব-দেবীর পূজা ও আরাধনা করিয়া থাকে। নাগা অর্থাৎ নাগবংশীয় জাতিদিগের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রকারান্তর। কুকি, লুসাই প্রভৃতিরাও কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ ও পূজা-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া থাকে। তথাচ প্রত্যেক জাতির বিহিত দেব-উপদেব, প্রেতযোনি এবং বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দুয়ানীর সহিত এগুলি এত সংশ্লিষ্ট ও সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নাগা, কুকিদিগের ধর্ম্ম কি, তাহা অনেক সময় আদৌ বুঝিতে পারা যায় না।

আকৃতি, প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি—এই পুস্তকে যে সকল প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকমণ্ডলী মণিপুরী, কুকি প্রভৃতির গঠন তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। মণিপুরীরা প্রায়ই গৌরাঙ্গ—স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরমাসুন্দরী। তবে তাহাদের নাক

কিছু বসা, কপাল কিছু টানা ধরণের। নিখুঁতস্রী নর-নারীও মণিপুরীদের মধ্যে অনেক আছে।

মণিপুরীদের অঙ্গাবয়ব মঙ্গলীয় জাতীয়দের ধরণের। কিন্তু নাগা, কুকি প্রভৃতি জাতির আকৃতি অনেক বিভিন্ন। তবু কিন্তু যাহারা বন-পর্ব্বত ছাড়িয়া মণিপুরে বসবাস করিতেছে, তেমন লোক মাত্রেরই চক্ষের চাহনিতে একটু বিশেষত্ব আছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সেই অপাঙ্গ দৃষ্টি, চক্ষের সেই বক্র মনোহর ভাব, দর্শকের নয়ন সহসা আকর্ষণ করে।

সম্ভ্রান্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার, অন্যান্য স্থানের হিন্দুবৎ বিশুদ্ধ। তবে এ পক্ষে তাহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা বৃন্দাবন অঞ্চলের হিন্দুদের ধরণে অধিক চলিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর আচার ব্যবহার অবশ্যই ততটা মার্জ্জিত বা বিশুদ্ধ নহে। মণিপুরী মুসলমানদের আচার ব্যবহারেও কোন বিশেষত্ব নাই।

মণিপু ী সম্ভ্রান্ত মহিলারা কতকটা আদব, কায়দা, আব্রু রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু ইতর ভদ্র কেহই অন্তঃপুররুদ্ধা নহে। কেহই পরিচিত বা অপরিচিত পুরুষের সমক্ষে সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠনবতী থাকে না। হিন্দু মণিপুরী পুরুষেরা কিছু অলস ও আমোদপ্রিয়। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। ! শস্য বপন, কর্ত্তন প্রভৃতি কঠিন কার্য্যেও পুরুষদের সহিত হীনাবস্থার স্ত্রীলোকেরা সতত যোগদান করে। কিন্তু অন্য সকল কার্য্যে মণিপুরী রমণীরাই প্রায় অগ্রণী হইয়া থাকে। মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা হাট-ঘাট, বাজার ঘরে এবং দোকানপাট চালায় এবং তাহারাই প্রায় পণ্য দ্রব্য ইতস্ততঃ লইয়া যায় এবং যাবতীয় গৃহকার্য্য—রন্ধন, গৃহাদি মার্জ্জন, বস্ত্রবয়ন, সূতাকাটা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সমাধা করিয়া থাকে। শিল্প ও

নানাবিধ কারুকার্য্যে তাহারা বিশেষ ব্যুৎপত্তিশালিনী এবং নৌকা-সঞ্চালন প্রভৃতি বিপজ্জনক কার্য্যেও তাহারা পরাঙ্মুখী হয় না। মণিপুরীর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ সহায়। মণিপুরী মহিলার মত পরিশ্রমী রমণী ভারতবর্ষে বুঝি আর কোথাও নাই।

উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে লোই জাতি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু। যাবতীয় নীচ ও কঠিন কার্য্যে তাহারা বিনা বাক্য-ব্যয়ে অগ্রসর হয়। কিন্তু অধিবাসী মুসলমানদের মত পরিশ্রমীজাতি মণিপুর রাজ্যের মধ্যে আর কোন শ্রেণীই নহে।

নাগা, কুকি প্রভৃতিরা কিয়ৎপরিমাণে জুম, জোনার ফসল উৎ-পাদনে এবং বৎসরের সকল মাসেই জঙ্গলের ফল, মূল, মধু, কাষ্ঠ আহরণে বা তীর ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা হস্তে, শিকারান্বেষণে আবশ্যক মত নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সচরাচর তাহারা আমোদে, আহ্লাদে, উল্লাসে-বিলাসে, নৃত্য-গীতে, উৎসব-উৎসাহে এবং অন্যান্য বিবিধ ক্রীড়াদি রঙ্গে কালাতিপাত করে।

মণিপুর রাজ্যাধীন পাহাড়ী জাতিদের আচার ব্যবহারগত বৈষম্য বিস্তর। নাগারা নানারূপ ধরণে (কখনও বা অতিক্ষুদ্র আকারে) কেশ কর্ত্তন করে। কুকিদের মধ্যে চিরুনামা শাখার লোকেরাও তদনুরূপ করিয়া থাকে। অন্য সমস্ত কুকিরা দীর্ঘ চুল রাখে ও পশ্চাৎ দিকে ঝুঁটি বাঁধে। নাগারা সচরাচর কোন টুপি বা পাগড়ি ব্যবহার করে না। কিন্তু (চিরু ভিন্ন সমস্ত) কুকিদের উহা ব্যতীত পরিচ্ছদ সমাপ্ত হয় না। নাগারা নানা প্রকার কর্ণাভরণ ব্যবহার করে। কিন্তু (চিরু ভিন্ন) কুকিরা তত নয়—তাহারা সূত্রখণ্ডে একটি পদ্মরাগ বা অন্য লোহিত প্রস্তর লাগাইয়া তাহা কর্ণে ঝুলাইয়া দেয়।

অথবা কর্ণমূলে বৃহৎ ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে একটি কাষ্ঠ বা ধাতুনির্ম্মিত শলাকা (গুঁজি) প্রবেশ করাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে গোলাকার বৃহৎ রৌপ্য পদক সংলগ্ন করিয়া রাখে। এই অলঙ্কার দেখিতে কতকটা আমাদের দেশের পাশার মত। কিন্তু পাশার এক দিক ছোট, অন্য দিক বড়; সেই অলঙ্কারে দুই দিকই সমান এবং পাশার সম্মুখ স্তবক অপেক্ষা তাহার সম্মুখ ভাগ অনেক বড়। এই অলঙ্কার কুকিদের অতিশয় আদরের জিনিষ; কিন্তু নাগারা কখনই তাহা ব্যবহার করে না। মারিং নামক এক জাতীয় নাগা মণিপুর রাজ্যে আছে। তাহাদের মুখের গঠন ও সাধারণ আকৃতি, উত্তরাঞ্চলের নাগাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দীর্ঘ কেশ ও মস্তকের সম্মুখে শৃঙ্গাকৃতি ঝুঁটি দেখিয়া মারিং নাগাকে সহজেই চিনিয়া, অন্য পার্ব্বত্য জাতি হইতে পৃথক্ করা যায়। মণিপুরের উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব সীমান্তে কুকি, শান, চীন প্রভৃতি জাতির বসতি। নাগা, কুকি প্রভৃতি জাতিরা মণিপুর সীমাতেই আবদ্ধ নহে মণিপুরের—উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলের পর্ব্বত ও অধিত্যকার উপরে তাহাদের নানা শ্রেণী বাস করে। তন্মধ্যে যাহারা মণিপুর রাজ্যের প্রজা, কেবল তাহাদেরই কথা লেখা হইল। রাজ্যের দক্ষিণ দিকে কুকি, লুসাই ও সুতিজাতির বাস। শেষোক্ত দুই জাতির প্রথমোক্তের সহিত তুলনায় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার ব্যবহারগত বহুল পার্থক্য থাকিলেও সকলেই বন্যজীবন কতকটা একই ভাবে যাপন করে। মণিপুর প্রদেশের সকল পাহাড়ীয়া জাতিই প্রায় গৌরবর্ণ—তবে কৃষ্ণকায়ও যে একেবারে নাই, এমত নহে।

এই সব জাতির আকৃতি ও গঠন একরূপ নহে। মণিপুরীরা খর্ব্বাকৃতি ও সচরাচর স্থূলকায়। কুকিদের দেহের দৈর্ঘ্য মণিপুরীদের

মত বা কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু নাগা ও লুসাইয়েরা সচরাচর সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইয়া থাকে। হিন্দু মণিপুরীরা ধীর, শান্তপ্রকৃতির লোক। তাহারা শিষ্টাচারী ও বিনয়ী, কিন্তু (কতকগুলি) বাঙ্গালীর মত তোষামোদকারী নহে। হিন্দুস্থানীর উগ্রতা, বাঙ্গালীর নমনীয়তা ও আসামীর চাতুরী-হীনতা একত্র মিশ্রিত করিয়াই যেন মণিপুরী প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। মণিপুরাধিপতি মহারাজগণের দৃঢ়তা ও আত্ম-নির্ভর প্রচুর থাকায়, বহুকাল ধরিয়া ইংরাজ রাজপুরুষেরা, তাঁহাদিগকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সুবিধাজনক কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। একশত বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট সাহায্য লইতেছেন এবং তাঁহারাও ইংরাজানুকূল্যে উপকৃত হইতেছেন, এই পর্য্যন্ত। 'মণিপুর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ—তাহা শত প্রকারে প্রকাশ করিয়া আসিতেছে—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনও বশ্যতা বা অধীনতা স্বীকার করে নাই বা ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয় নাই। হতভাগ্য ভারত ভূমে এ দৃশ্য নিতান্তই বিরল। ইহা যে মণিপুরীদের সম্পূর্ণ স্বাধীন-চিত্ততার নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মণিপুরীরা ধূর্ত্ততা ও শঠতা বর্জ্জিত হইলেও বিষয়-বুদ্ধি সাংসারিক জ্ঞান এবং মনস্বীতা-হীন নির্ব্বোধ নহে। কি কালের গতি বিচিত্র—সেই কালের চক্রে ভবিতব্যতার প্রভাবে সে সমস্ত সদ্‌গুণ যতই থাকুক, কিছুতেই অধীনতার শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না।

সে যাহা হউক, আমাদের মত উদর-জ্বালায় হাহাকার করা, মণিপুর রাজ্যে নাই। ভিতরে যাহাই হউক, বাহ্যিক মান সম্ভ্রম রক্ষার কৃত্রিম আড়ম্বর এবং প্রকৃত "নাস্তি" অবস্থা গোপনার্থ "অস্তি"র ভাণ-মূলক ভণ্ডামীর জাল বিস্তারের ব্যাপারও তথায় দৃষ্ট

হয় না। চাক-চিক্যময় নেত্রান্ধকারী বিলাতী সভ্যতার আলোক এখনও তথায় স্বমূর্ত্তি ধারণ করে নাই। অচিরাৎ করিবে কি না এবং তজ্জনিত ও অন্যান্য কারণ-জন্য অভাবপিশাচ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে, সুতরাং জগৎপাতাই জানেন, আমরা না।

আদমস্থমারিতে প্রকাশ যে, মণিপুর রাজ্যে প্রায় ছয় হাজার সঙ্গীত ব্যবসায়ী আছে। অর্থাৎ প্রায় ২,২১,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৬,০০০। তবেই হইল প্রতি ৩৭ জনে এক জন করিয়া ব্যবসায়ী গায়ক, তদ্বাদে সখের গায়ক গায়িকা তো ঘরে ঘরে। সমগ্র বঙ্গদেশ দূরে থাকুক, এই মহানগরী কলিকাতা—যে কলিকাতা, সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের, সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য ব্যবসায়ের, সর্ব্ববিধ বিদ্যা-সাধ্য-শিল্প-বিজ্ঞানের এবং সর্ব্ব শ্রেণীর আমোদ আহ্লাদ রঙ্গরসের রাজধানী—চতুষ্পার্শ্বস্থ উপনগর-মালা সহিত তাহাতে সাত আট লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সাত হাজারের বেশী সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নাই। মণিপুরের তুলনায় কলিকাতায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার থাকিলেই শোভা পাইত। ইহাতেই বুঝিয়া দেখুন মণিপুরীরা কত সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে এবং সুখ দুঃখ কোথায় বেশী?

হিন্দুপ্রধান মণিপুর-উপত্যকায় সাধারণ অধিবাসীরা শিষ্ট, শান্ত, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু। লুসাই, নাগা, কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতীয়েরা উগ্রস্বভাব, তেজীয়ান এবং কিয়দংশে (সভ্য মতানুসারে) নিষ্ঠুর-প্রকৃতি বটে, কিন্তু তাহারা তিল মাত্র মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক বা বিশ্বাস-ভঙ্গকারী অধার্ম্মিক নহে। তাহারা তাহাদের করণীয় কার্য্য সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরল ভাবে স্পষ্টতঃই করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই সাহসী, পরিশ্রমী কষ্ট-সহিষ্ণু ও স্বাধীন-চেতা। পশ্চিম ভাগের

কুকিরা অনেকটা মৃদুস্বভাব ও রাজবিধির বশবর্ত্তী। কিন্তু পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী কুকি, লুসাই ও নাগা প্রভৃতি বন্য জাতীয়েরা ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ও অসম-সাহসী। কুকিরা ধীর প্রকৃতি ও রাজভক্ত হইলেও মনুষ্যের শিরচ্ছেদনকে ধর্ম্মানুমোদিত শ্রেষ্ঠ শুভকার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, লুসাই ও নাগা প্রভৃতির তো কথাই নাই। তাহাদের উপদেশ ও সান্ত্বনা ও কর্কশ ও রুক্ষ ভাষায়; কোন বিষয় কাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইলে, তাহাদের স্মারক—চপেটাঘাত। অল্প শাস্তিদানের প্রয়োজনে ঘৃণা, বিরাগ বা তাচ্ছিল্য এবং গুরু অপরাধে প্রাণদণ্ড ভিন্ন তাহারা অন্য শাস্তি প্রদান জানে না। চৌর্য্য, প্রতারণা, মিথ্যা ও ব্যভিচার প্রভৃতি পাহাড়ীয়েরা অতি গুরুতর অপরাধ মনে করে—নরহত্যা তাহাদের মধ্যে, ততটা হেয় নহে।

পার্ব্বত্য জাতিরা স্বাভাবিক জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধিতে পরিচালিত। কেহ কোন বিশেষ কুব্যবহার করিলে, তাহাকে বা তদভাবে তাহার কোন আত্মীয়কে শাস্তি দেওয়া তাহারা সমানই ভাবে। রাজনীতির জটিলতা কুটিলতা তাহারা বুঝে না। সুতরাং প্রজার দুর্ব্যবহারে তাহারা রাজাকেও দোষী বিবেচনা করে এবং একজনের অন্যায় কার্য্যের জন্য গ্রামশুদ্ধ সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে। প্রজাকে শাসনে রাখা রাজার এবং গ্রামবাসীকে দমনে রাখা গ্রাম্যমণ্ডলীর কর্ত্তব্য, তাহারা ইহাই বুঝে। এই নিমিত্তই প্রতি প্রজার জন্য রাজাকে এবং প্রতি অধিবাসীর জন্য গ্রামকে দায়ী করাই, তাহাদের সরল বুদ্ধির যুক্তি-জনিত পদ্ধতি। দুর্দ্ধর্ষ নাগা ও লুসাইয়েরা ইংরাজ অধিকারে যখন তখন লুটপাট ও নানা দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। ইংরাজরাজও মধ্যে মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া, তাহাদের ঘর বাড়ী পুড়াইয়া ছারখার

করেন—উভয় পক্ষেরই বিস্তর লোক হত ও আহত হয়। এই প্রকারে সীমান্ত যুদ্ধে, মণিপুররাজ প্রায় সর্ব্বদাই ইংরাজের সাহার্য্য করিয়া থাকেন। তজ্জন্য লুসাই ও নাগারা, মণিপুরীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসা পরায়ণ হয়। তবে তাহাদের মধ্যে কিয়দংশ মণিপুরের বাধ্য ও অনুরক্তও আছে। কিন্তু পশ্চিম সীমান্ত-বাসী কুকিরা, মণিপুররাজকে স্বয়ং ভগবানের অংশ, তাঁহার পরিবার বর্গকে দেব-দেবী এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে স্বর্গীয় শক্তির অবতার স্বরূপ ভাবিয়া থাকে, সুতরাং ভক্ত উপাসক সদৃশ অনুরক্ত আছে।

পাহাড়ীরা অল্প বয়সে বিবাহ করে না। স্ত্রীলোক ও পুরুষ পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইলে, তবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহাদের বিবাহ প্রণয়-সম্মিলন, অগ্রে পরস্পরের অনুরাগ বর্দ্ধন, তবে পাণিগ্রহণ। বিবাহের জন্য, পাত্র-পাত্রীর পিতা মাতাকে কিছুই প্রায় করিতে হয় না। সে সুখের শুভ ঘটনায় পণ, অলঙ্কারাদির কোন কথাই উঠে না। ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে আছে। কিন্তু ভ্রষ্টা স্ত্রী নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। পুরুষ প্রায় একাধিক দার পরিগ্রহ করে না। এবং এক স্ত্রীর বহু স্বামীর কথা তাহারা আদৌ জানেনা।

ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ প্রমোদ—শতরঞ্চ খেলা, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত, মণিপুরেও খুব প্রচলিত। তাসেরও ব্যবহার আছে। বাঙ্গালা বিশেষতঃ আসামদেশের অন্যান্য অনেক ক্রীড়ারও আদর মণিপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলির প্রকরণান্তর হইয়াছে। আবার ঘরে বাহিরে সময় কাটাইবার নূতন ক্রীড়া, কৌতুক মণিপুরে বিস্তর আছে।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে, লোগটাক হ্রদে ও বরক প্রভৃতি

নদীতে, নৌকার বাচখেলা হইয়া থাকে। তাহাতে মহাধূমধাম ও ঘোর ঘটা হয়। কৌতুক দেখিতে কাতার দিয়া নরনারী দাঁড়াইয়া যায়।

মণিপুরীরা যেমন স্বাধীন ও বলিষ্ঠ জাতি, তদনুরূপ ঘোড় দৌড় কাজাই বা খাঞ্জাই খেলাও তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ও সমাদৃত। ইহাতে একদিকে সাত জন, অপরদিকেও সেই সংখ্যক ঘোড়-সওয়ার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দিতায় নানারঙ্গে নানা ভঙ্গীতে খেলিয়া থাকে। বৎসরের সকল সময়েই এই বলবৰ্দ্ধনকারী ব্যায়াম-মূলক ক্রীড়া চলে। তন্মধ্যে বা'চ খেলার পরে আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রারম্ভে যে কাজাই খেলা হয় তাহারই ধূমধাম অধিক। প্রথম দিনে, দুই জন রাজ-পরিবারস্থ পুরুষ 'অগ্রণী হইয়া ক্রীড়ারম্ভ করেন। অসংখ্য নর-নারী সমবেত হইয়া উৎসাহ দান করাতে আহ্লাদের তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠে। রাজ্যশুদ্ধ তাবতেই এই ক্রীড়ার পরমোৎসাহী এবং ছোট বড় সকলেই ইহার তথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার ফল-স্বরূপ এক বৎসরের হার-জিত, পর বৎসরের হিসাবভুক্ত হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশের ওলিম্পিক মহামেলার ক্রীড়াদির ন্যায় এই রহস্য যুদ্ধে যে যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক জয়লাভে সমর্থ হয়, তাহারা রাজদ্বারে পুরস্কৃত ও সম্মানিত এবং সাধারণ্যে গৌর-বান্বিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এটিকে মণিপুরের জাতীয় মহোৎসবের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ঠিক এরূপ খেলা পৃথিবীতে আর কোথাও প্রচলিত ছিল না। কিন্তু সর্ব্বসারগ্রাহী বীর ইংরাজেরা, তাহা মণিপুরীদের নিকট হইতে, শিখিয়াছেন। এখন তাহা 'পলো' নামে ভারতে ও ইংলণ্ডে বিরাজ করিতেছে।

পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে নানারূপ অবসর-রঞ্জিনী ও বলবৰ্দ্ধিনী

ক্রীড়া আছে, কিন্তু শীকারই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমোদ ও উৎসাহজনক খেলা। ফলতঃ মৃগয়া-ব্যসনটি নিতান্তই প্রয়োজনীয় ও অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানও বটে।

ভাষা ও শিক্ষা—মণিপুর রাজ্যে নানা ভাষার প্রচলন আছে। লোই জাতির ভাষা অন্য কোন জাতির সহিত মিলে না। আবার সেঙ্গমাই গ্রামের লোইদের ভাষা, সেই গ্রামের লোক ভিন্ন অন্য কোন লোইও বুঝিতে পারে না। লোই ভাষার সহিত কতকটা ব্রহ্ম-ভাষার সাদৃশ্য আছে। নাগা ও কুকিদের ভাষাও সম্পুর্ণ বিভিন্ন। মণিপুরের পাহাড়ী জাতীর মধ্যে বিংশতির ও অধিক সংখ্যক ভাষা প্রচলিত আছে। কোন পাহাড়ী জাতিই লিখিত বিদ্যা শিক্ষা করে না। সুতরাং সে ভাষার কোনরূপ অক্ষরই নাই।

প্রাচীনকালে, মণিপুরে সংস্কৃত ভাষা এবং দেবনাগরাক্ষরের প্রচলন ছিল। আজিও তাহার যথেষ্ট সমাদর আছে। শিক্ষিত মণিপুরীরা হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাঁহারা পরম আগ্রহের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ও অন্যান্য প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ—বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া থাকেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ শিক্ষিত মাত্রেরই উপাদেয় সামগ্রী। বেদ-বেদান্ত-দর্শনজ্ঞ, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এখনও মণিপুর রাজ্য হইতে একেবারে বিলুপ্ত হন নাই। এখন সেখানে মণিপুরী ভাষা প্রচলিত। মণিপুরী অক্ষর নাগরী ও কাইথীর রূপান্তর বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশের গুরুমহাশয়ের পাঠ-শালার মত বিদ্যালয় সমূহই মণিপুর রাজ্যে সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার স্থল। আবার ইউরোপের অন্ধকারময় (Dark-age) মধ্যকালে মনাষ্ট্রী প্রভৃতি ধর্ম্মমঠের পুরোহিতেরা যেমন বিদ্যার্থীগণের একমাত্র শিক্ষা প্রদাতা ছিলেন এবং দেশে বিদ্যার স্রোত অল্পপরিমাণে রক্ষা

করিতেন, মণিপুরেও সেইরূপ মঠধারী, মোহান্ত, আখড়াধারী বাবাজী ও মস্‌জিদের-সংস্রবযুক্ত মৌলবীরাও জ্ঞান বিস্তারের অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকেন।

আজ কাল মণিপুরে বঙ্গাক্ষরের চলন হইয়াছে। মণিপুরী অক্ষর ক্রমশঃই মণিপুরী কাগজ পত্র ছাড়িয়া বিস্মৃতির পথে চলিয়া যাইতেছে রাজ-গুরুপদে নবদ্বীপের গোস্বামী মহাশয়েরা বরিত হইবার পর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর মণিপুরে প্রবেশ করিয়াছে। মণিপুরে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন—ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য; আমরা চেষ্টা করিলে এবং ইংরাজ রাজ (বিমুখ না হইয়া) সহায়তা করিলে, আসাম কাছাড়, মণিপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বত্রই বাঙ্গালা ভাষার একাধিপত্য বিস্তৃত হইতে পারে। এরূপ হইবে কি?

মণিপুরী ভাষা শ্রুতি সুখকর অথচ তেজস্বী। তাহাতে সংস্কৃতের সংমিশ্রণ অনেক আছে, আবার আসামী ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষারও ভাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহা হওয়া বিচিত্র নহে। পাঠকের তৃপ্তির জন্য আমরা তাহার নমুনা স্বরূপ, বীর টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার দোষের বিচার কালে বিশেষ আদালতে যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন, তাহার একখানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"মহামান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত জন্তের্ণসাহেব বাহাদুর, প্রবল-প্রতাপেষু। দরখাস্ত শ্রীটেকেন্দ্রজিত বীরসিংহ যুবরাজ, মণিপুর। শ্রীযুক্ত জন্তের্ণ সাহেবতা হাই জে ঐগি মোকদ্দমাসি মণিপুর আসিদা উকিল লৈভে মরম আহুন। অনাবুং মোকদ্দমাকি সুত্তাল তৌবাবা ওমদে নৈপাক আসিদা লারিক হৈবামি শ্রীজানকি বাবু ১ সুং শ্রীবামাচরণ বাবু আনি আসিপু ঐগি মোকদ্দমা অসিতা সুত্তাল জবাব তৌনাপা বাবু আনিপু

মুক্তিয়ার ওইহল নিং ডিং মাসিপু যাবিকৃদি হাইনা নিংজৈ ইতি। সন ১৮৯১, ইং ৩ জুন।" অল্পদিন হইল, মণিপুর রাজধানীতে, একটি ইংরাজী ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অল্প-বিস্তর শিক্ষাদানও হইয়া থাকে। মণিপুরীরা বাঙ্গালীকে এবং বাঙ্গালা ভাষাকে বড় ভাল বাসে। পলিটিকেল এজেণ্ট, ইংরাজী প্রচলনে বিশেষ চেষ্টায় থাকিলেও, মণিপুরীরা তাহাতে তত অনুরাগী হইয়া উঠে নাই।

গ্রাম্য ও বন্য পশ্বাদি—আসাম ও চট্টগ্রামের সমস্ত পালিত পশুই মণিপুরে আছে। আকার প্রকার-গত প্রভেদও বিশেষ কিছু নাই।

ঘোড়া—ব্রহ্মের ন্যায় এখানকার টাটু ঘোড়াও চির-প্রসিদ্ধ। মণিপুরী অশ্ব ২৷৷০ কি ২৸০ হাতের বেশী উচ্চ প্রায়ই হয় না, কিন্তু দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং বড়ই শক্তি-সামর্থ্য-সহিষ্ণুতা-শীল। তাহাদেরই পৃষ্ঠারোহণে কাজাই খেলা হয়। সুশিক্ষিত সবল ঘোড়ার মূল্যও বিস্তর। উৎপাদন ও পালন সম্বন্ধে প্রচুর অসাবধানতা ও অমনোযোগ ঘটিয়া অশ্বজাতির অবনতি হইয়া আসিতেছিল। কয় বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা বাহাদুরের তৎপক্ষে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়াতে সমুচিত প্রতিবিধানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। রাজাজ্ঞানুসারে মণিপুর হইতে আকৃতা ভিন্ন অন্য অশ্ব বিদেশে রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হরিণ—মণিপুরে নানা জাতীয় কুরঙ্গ দৃষ্ট হয়। বৃহদাকার সম্বর হরিণের এক প্রকার বিশেষ জাতিও তথায় প্রাপ্য। কস্তুরী-মৃগও দুর্ল্লভ নয়। তদ্ব্যতীত, ক্ষুদ্র হরিণ বিবিধ জাতীয় আছে। এক প্রকারের বর্ণ লাল; এক জাতি অতি দ্রুত দৃঢ় পদে অগম্য তুঙ্গ-শৃঙ্গে ও গভীর গহ্বরে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। এক প্রকার শব্দ

কারী শ্রেণী আছে, তাহারা কেবল মণিপুরেরই চিহ্নিত মৃগ—সেরূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

কুক্কুর—মণিপুরে কুকুর অসংখ্য ও নানাজাতীয়। এদেশের ন্যায় তত্রত্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা কুকুরকে অস্পৃশ্য বলিয়া জানেন। নাগাদের শ্রেণী-বিশেষ কুকুরের মাংস সুস্বাদু খাদ্য রূপে পরম সুখে ভোজন করিয়া থাকে।

বানর—মণিপুর পার্ব্বত্য ও বন্য প্রদেশ, সুতরাং নানাজাতীয় কপিকুলের পক্ষে রম্য বিহার-স্থল হইবে, বিচিত্র কি? এক জাতীয় ভোঁদড়াকৃতি বানর আছে, তাহারা উড়িতে পারে। ইহা পড়িয়া পাঠক মহাশয় অবিশ্বাসের হাঁসি হাসিবেন না। তাহারা ঠিক পক্ষীর ন্যায় উড়ে না—তাহাদের ভুজমূলে ও কুক্ষিস্থলে, এরূপ এক প্রকার মাংসময় চর্ম্ম আছে, যাহা তাহারা স্বেচ্ছামত বিস্তৃত করিতে পারে। সই বিস্তারিত চর্ম্ম তখন বায়ু পূরিত হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে তাহারা কতক দুর শূন্যে শূন্যে উড়িবার ন্যায় অতি দ্রুতবেগে যাইতে সমর্থ হয়। এক শ্রেণীর কপিবর, বৃক্ষ কোটরে বা উচ্চ পর্ব্বত-গহ্বরে রাত্রিকালে ও দুর্য্যোগ সময়ে নিরাপদে বাসা করিয়া থাকে। উত্তর বিভাগে লাঙ্গুর নামা রূপী-বানরের ন্যায় এক জাতীয় বানর আছে তাহারা বঙ্গ বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মুখপোড়া বা রূপীর মত নহে। উল্লুকও যথায় তথায় দেখা যায়। তাহারা জঙ্গল মধ্যে বহুসংখ্যক একত্র বাস করে। তাহাদের সমবেত ও যুগপৎ সম্মিলিত হুলুধ্বনিতে গিরি, বন ভয়ানকরূপে নিনাদিত হয়—নবাগত ভ্রামক শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠেন।

হস্তী—মণিপুর রাজ্যের পার্ব্বত্যপ্রদেশে হস্তী বিস্তর আছে। তাহারা বৃহৎ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ব্রহ্মসীমান্ত প্রদেশে,

কদাচিৎ বা শ্বেত হস্তীও অল্প সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয়, অনেকে একত্রে থাকা শ্বেত হস্তিগণের অভ্যাস নহে। সচরাচর কেবল স্ত্রী পুরুষ দুটিকে, কখন বা কেবলই তদেতর একটিকে অথবা নবজাত বৎসের সহিত কেবল হস্তিনীকেই, চরিতে দেখা যায়।

গণ্ডার—মণিপুর রাজ্যের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের পর্ব্বত সমূহে গণ্ডার দৃষ্ট হয়। দুই জাতীয় গণ্ডার সেখানে আছে—একখড়্গী ও দ্বিখড়্গী। প্রথমোক্তের খড়্গই সমধিক মূল্যবান এবং তাহাদেরই গাত্রচর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অধিক কঠিন, দুশ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য; তাহাতেই ভাল ঢাল প্রস্তুত হয়।

বন্য গো-মহিষাদি—দক্ষিণদিকের উপত্যকা সমূহে বন্য মহিষ বিচরণ করে। বন্য গাভী মণিপুরে পূর্ব্বে বিস্তর ছিল, এখন আর তত দেখা যায় না। বন্য গাভীকে মণিপুরী ভাষায় মেটনা বলে। বন্য গো সকল চরিবার জন্য উপত্যকায় আইসে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত বাসস্থান পর্ব্বতোপরি। তাহাও কেবল উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তের ভূধরমালার উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য গো দেখিতে প্রায় মহিষের মত, কিন্তু তাহাদের শৃঙ্গ ক্ষুদ্র ও তন্মূলদেশ স্থূলতর। গলদেশের নিম্নে লোল-লম্বিত মাংস দেখিলেই তাহাদিগকে মহিষ হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝা যায়। বন্য ছাগও মণিপুরে অল্প-বিস্তর আছে।

বন্য শূকরাদি—বন্য শূকর মণিপুরের প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকারের বন্য বরাহও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শজারু, খরগস, প্রভৃতি ও মণিপুরে অসংখ্য।

শ্বাপদ—ভককে অনেকে শ্বাপদ শ্রেণীভুক্তই করিয়া থাকেন।

কিন্তু সকল জাতীয় ভল্লুক মাংসাশী নহে। মণিপুরে উদ্ভিদ-ভোজী, ফল-মূলাহারী, মধুপায়ী, গিরি-গহ্বর বা বৃক্ষকোটর বাসী ভল্লুক বিস্তর আছে। মৎস্যজীবী উদ্বিড়াল এবং সর্ব্ব-মাংসভুক্ ও পক্ষী-শীকারে সুচতুর অন্য প্রকার বন্য বিড়ালও মণিপুরে যথেষ্ট। মণি-পুরের সুবিশাল সুগভীর জঙ্গল সকল সর্ব্বদাই ভয়াল শ্বাপদকুল-সঙ্কুল। তথায় চারু দর্শন তীব্র-পদ চিত্রব্যাঘ্র ও সাক্ষাৎ কালস্বরূপ প্রাণান্তকারী বৃহৎ ব্যাঘ্র সমূহ অনবরত শিকারান্বেষণে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। চিতার বিকট চীৎকারে ও ব্যাঘ্রের গভীর নিনাদে, নিশা-কালে, বনস্থলী ভয়ানকরূপে নিনাদিত, গিরি-কন্দর ও গিরি-সঙ্কট প্রতিধ্বনিত এবং নিরীহ বন-গ্রাম-বাসী প্রাণীমাত্রেরই হৃদয় বিক-ম্পিত হইয়া উঠে। উহারা সময়ে সময়ে, উপত্যকা ভূমে আসিয়া মহা উপদ্রব করিয়া থাকে। মণিপুরের কতকগুলি বিখ্যাত পাহাড় ও জঙ্গলে, একাকী নিরস্ত্র যাওয়া ও আত্মহত্যার সংকল্প করা প্রায় একই কথা।

সরীসৃপ—কৃকলাস, বহুরূপী, কাষ্ঠ-বিড়াল প্রভৃতি নানাজাতীয় সরীসৃপের কথা তো বলাই বাহুল্য। দক্ষিণদিকের নিবিড় জঙ্গলে ও লোগটাক হ্রদের নিকটবর্ত্তী, তৃণাচ্ছাদিত, জলাভূমে কিস্তর বৃহ-দাকার বোড়াসর্প দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতে, কন্দরে, চিতি সর্পও অনেক আছে। কিন্তু আমাদের দেশের মত গোখুরা বা কেউটিয়া জাতীয় সাক্ষাৎ সংহারমূর্ত্তি বিষধর মণিপুরে প্রায়ই নাই। উপত্যকায় অন্যবিধ নানাজাতীয় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। টংলী নামে এক প্রকার অতি দ্রুতগামী সর্প মনুষ্যাদির নিকটে আসিতেও ভয় করে না। ফণাবিহীন হইলেও তাহাদের গরল প্রাণবিনাশী; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাহারা প্রায়ই লোকালয়ে থাকে না,

বংশ বনে বা অন্য জঙ্গলে অবস্থিতি করে এবং গাছে উঠিয়া, তীব্রগতিতে শাখা হইতে শাখান্তরে চলিয়া বেড়াইতে ভাল বাসে। ক্রুদ্ধ হইলে, অতি উচ্চ স্থান হইতে, লক্ষিত জীবের উপর পতিত হইয়া, আমাদের বেত-আছড়া ও কানড় সাপের ন্যায় সজোরে দংশন করে। তাহাদের আকৃতিও আমাদের দেশের বেত-আছড়া ও লাউডগা এই দুয়ের মাঝামাঝি রকমের। টাংলির নাম শুনিলে, মণিপুরীরাবড়ই ভীত হয়।

পক্ষী—নানা আকারের নানা-প্রকারের, বিচিত্র বর্ণের মণিপুরী পক্ষী সকলের বর্ণনা করিবার স্থান এ পুস্তকে নাই। উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গ-সমূহে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ বাজপক্ষী বাস করে; তাহারা অনায়াসে মেষশাবক ও ক্ষুদ্র মেষকেও তুলিয়া লইয়া যায়। অন্যান্য শিকারি মাংসাশী পক্ষীর কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশের কাক, ছাতার, বাবুই প্রভৃতি পক্ষীও তথায় আছে, কেবল দেশভেদে, আকার ও বর্ণভেদ কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মসীমান্ত প্রদেশের জঙ্গলে, পালে পালে শ্বেত ময়ূর বেড়ায়; টিয়া, শুগী, ময়না প্রভৃতি মণিপুরে বিস্তর আছে। আমাদের দেশের দয়েলের স্থলে শ্রুতি-মনোমুগ্ধকারী মিষ্ট ভাষী শ্যামা, হরবোলা, ভীমরাজও বিস্তর; তাহারা যাবতীয় পশু পক্ষ্যাদির স্বরের এরূপ চমৎকার অনুকরণ করে যে, সম্পূর্ণ ভ্রম জন্মাইয়া দেয় ও তথ্য জানিয়া অবাক হইতে হয়। প্রত্যূষে বা সায়ংকালে শ্যামা যখন সপ্তস্বরে প্রাণ খুলিয়া গায়, তখন ভীমরাজও হয় তো তাহাকে ভেঙ্গাইতে গিয়া কি আশ্চর্য্য কাণ্ডই করিয়া তুলে; স্বয়ং শ্যামাকেও ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। প্রকৃতিদেবী! ধন্য তোমার খেলা! ময়না, ভীমরাজ, শ্যামা প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কলিকাতা অঞ্চলে বহুমূল্য, তাহারা মণিপুরের গ্রামে, জঙ্গলে, পালে পালে উড়িয়া বেড়াইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বভাবজ, শিল্পজ, কৃষি, বাণিজ্যাদি।

কৃষি—মণিপুরের কৃষি সম্বন্ধে, অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই। তাহা পূর্ব্ববঙ্গের—বিশেষতঃ কাছাড় ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের ন্যায় সেইরূপ দ্রব্য, সেইরূপ প্রণালী, সেইরূপ যন্ত্রাদি সবই। তদ্বাদে শান-প্রদেশের কোন কোন পদ্ধতিও তথায় প্রচলিত। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই, দেশ ভেদের দরুণ স্থানীয় ধরণ আছেই আছে।

সমগ্র উপত্যকার মৃত্তিকাই চাষের অত্যুপযোগী। মাটি গভীর করিয়া উল্টাইলেও প্রস্তর বা কঙ্কর পাওয়া যায় না। পর্ব্বত-সন্নিহিত মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু পর্ব্বতের উপরের মাটি লালচে এবং তত উর্ব্বরাও নহে। পর্ব্বতে জুমের চাষ বহু বিস্তৃত রূপে হইয়া থাকে। কিন্তু লোকের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল; সুতরাং ধান্যের চাষই রাজ্য মধ্যে প্রধান চাষ। কর্পাশ তুলা, তৈলোপযোগী বিবিধ শস্য, গোল মরিচ, লঙ্কামরিচ, আদা, নানা প্রকারের শাক ও তরকারী, জনার, শকরকন্দ ও চুপড়ি-আলু প্রভৃতিরও চাষ অল্প বিস্তর হয়। তদ্বাদে মুগ, মসুর, কলাই, মটরাদি বিবিধ দ্বিদলের কৃষিও প্রচলিত আছে। গোধুম অত্যল্প পরিমাণেই জন্মে—সঙ্গতিবান লোকের জন্যই ময়দা, আটা, সুজি সুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং সে চাষে বেশী লাভ।

ফলমূল—আম, আনারস, রম্ভা প্রভৃতি এবং নানাজাতীয় লেবু মণিপুরে উত্তম জন্মে। বিলাতী পিচ, কুল ও আপেল বৃক্ষাদিও মণিপুরে রোপিত ও রাজোদ্যান প্রভৃতিতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু এ সকল ফল তত উৎকৃষ্ট হয় না। কয়েক বৎসর হইতে মণিপুরীরা, বিদেশীয় নানা জাতীয় ফল মূলের চাষ ও আবাদ আরম্ভ করিয়াছে। কপি, শালগম, গাজর প্রভৃতি সেখানে উত্তম জন্মিতেছে—কিন্তু অন্যান্য সামগ্রী তেমন নহে।

বন্য ফলাদি—বনজাম, বনকুল, বৈঁচি প্রভৃতি নানা জাতীয় সুমিষ্ট বন্য ফল মণিপুরে নানা স্থানে জন্মে। জঙ্গলে, পাহাড়ে শত শত প্রকারের ছাতু পাওয়া যায়, তাহা ইতর ভদ্র সকলেই আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। পর্ব্বত বা অরণ্যজাত কয়েক প্রকার সুস্বাদু লেবু মণিপুর রাজ্যে মিলে; ইহা ভিন্ন পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড় বা জঙ্গলোৎপন্ন, করিলা বা বনক্ষীরার মত ফলও মণিপুরে পাওয়া যায়। করিলাকে আমরা ঘি-করলা বলিয়া জানি এবং বনক্ষীরা দেখিতে ঠিক পটলের মত কিন্তু আস্বাদন তদপেক্ষা অনেক ভাল এবং তাহা পটল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও উপাদেয় সামগ্রী। বলা বাহুল্য যে, করলা ও বনক্ষীরা রান্ধিয়া খাইতে হয়। এতদুভয় প্রকারের মূল হইতে পরম প্রীতিকর ও পুষ্টিকর পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। চেনারু নামক একপ্রকার লতা আছে, তাহাতে রজ্জুর কার্য্য হয় এবং তাহার মূলদেশে, শকরকন্দ আলুর মত গেঁড় জন্মে। পার্ব্বতীয় জাতীরা তাহা পরম সমাদরে খাইয়া থাকে।

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের পর্ব্বতোপরি কদাচিৎ গো-পাদপ দৃষ্ট হয়। তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে, এক প্রকার নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহা প্রায় দুগ্ধের মত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পান্থ-পাদপ তদপেক্ষা অধিক আছে। তাহার দেহ বিদীর্ণ করিলে, নির্ম্মল জল বাহির হইয়া পিপাসিতের তৃষ্ণা নিবারণ ও প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে।

মৎস্য মাংস—নানাপ্রকারর পশু পক্ষীর মাংস মণিপুরে পাওয়া

যায়। তন্মধ্যে অনেক প্রকারের মাংস পরম উপাদেয় ও রসনা-তৃপ্তিকর। এখানকার নদী ও জোল সকল মৎস্য পরিপূর্ণ। লোগ-টাক হ্রদেও নানা জাতীয় মৎস্য আছে। এখানকার মৎস্যের মধ্যে মহাশির (মহাশ'ল) অতি প্রসিদ্ধ। শুনা যায় যে, কোন কোন জঙ্গলীজাতি ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও হস্তীর মাংসও খাইয়া থাকে। রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষসের কথা পড়িবার পরে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। কুকুর-পিষ্টক, * নাগা প্রভৃতি অনেক জঙ্গলী জাতির বড়ই আদরের সামগ্রী।

বনজ ও শিল্প পণ্যদ্রব্য—মণিপুর রাজ্যে, হস্তীদন্ত, হরিণ-শৃঙ্গ, গণ্ডারের-খড়্গ, ও মহিষ-শৃঙ্গ, রবার, ধুনা, নানাপ্রকার চর্ম্ম, বিবিধ পক্ষীর মূল্যবান বিচিত্র পালক, মম, মধু, ব্যাঘ্রের নখ, প্রভৃতি বনজ এবং তসর, গরদাদি বিস্তর শিল্পজ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। নাগা পর্ব্বতে মূল্যবান প্রস্তর মিলে। রাজ্য মধ্যে হস্তীদন্ত ও গণ্ডারের খড়্গে নানাপ্রকার বিচিত্র কারুকার্য্য হইয়া থাকে। মণিপুরের কয়েক প্রকার তসর ও গরদের বস্ত্র অতি সুশ্রী, চিকন ও মজবুত। চীন ও ব্রহ্মবাসীদের ন্যায়, মণিপুরীরাও বংশের অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতবিষয়ে বিশেষরূপ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করে। পিতলের নানাপ্রকার বাসন প্রস্তুত করিতে, কোন কোন জাতীয় নাগারা সিদ্ধ-হস্ত। দা, টাঙ্গী, বর্ষা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রের জন্যও মণিপুর প্রসিদ্ধ। কিন্তু বিলাতী দ্রব্য, মণিপুরী শিল্পের মূলে ক্রমশঃ আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে সমস্ত কাছাড়ের পথ দিয়া

---

* কুকুরকে আকণ্ঠ তণ্ডুল খাওয়াইয়া, অনতিপরেই তাহাকে বধ করে, সেইটিকে পোড়াইলেই মাংস ও উদরস্থ তণ্ডুল একত্র সিদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রীতিকর প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। তাহাকেই "কুকুর পিষ্টক" বলে।

কয়েক বৎসর হইতে, মণিপুর প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্বনাশেরও সূত্রপাত হইয়াছে।

ব্যবসা—বৃহৎ (নৌকাচালনোপযোগী) নদী বা রেল-পথের সাহায্যে অন্য কোন দেশের সহিত মণিপুরের সংযোগ নাই। গো-যানাদি রীতিমত চলিতে পারে, এমত রাস্তাও নাই। এ অবস্থায়, মণিপুরের বৈদেশীক বাণিজ্য যে অধিক হইবে না, তাহা স্বাভাবিক। অধিবাসীরা, কাছাড় ও পার্ব্বতীয় নাগা প্রভৃতি জাতির সহিত প্রায়ই বিনিময় প্রণালীতে ব্যবসা চালাইয়া থাকে। ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের সহিত, মণিপুরের যে দ্রব্যের ব্যবসা সদা সর্ব্বদা চলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

মণিপুর হইতে কাছাড়ে আসে।

টাটু ঘোড়া, গরদ ও তসর এবং তন্নির্ম্মিত বস্ত্রাদি, নানাপ্রকার যষ্ঠি, রবার, মম, মধু, চা-বীজ, হস্তীদন্ত, নানাপ্রকার চর্ম্ম, মহিষ ও হরিণ শৃঙ্গ, বিবিধ পক্ষীর পালক, গণ্ডারের খড়্গ ইত্যাদি।

কাছাড় হইতে মণিপুরে যায়।

সুপারি ও নানাপ্রকার গন্ধ-মসলা, বিবিধ ছিট, শাদা ও রং করা থান কাপড়, বনাত, পিত্তলের বাসন, হুঁকা, তামাক, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, পশমী কাপড়, বহু প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌখীন জিনিষ, গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি।

মণিপুর হইতে, টাটু ঘোড়া, লোহা, মদ্য, লবণ ও বস্ত্রাদি নাগ-প্রদেশে ও অন্যান্য জঙ্গলী জাতির দেশে যায়। এবং নাগা পর্ব্বত ও অন্যান্য জঙ্গলী অঞ্চল হইতে মণিপুরে আসে—পিত্তলের বাসন, মম, মধু, তৈল-শস্য, তুলা, বিবিধ বস্ত্র এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি।

পূর্ব্বে, উত্তর-ব্রহ্মের সহিতও মণিপুরের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ চলিত। কিন্তু ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সীমান্ত দেশের জঙ্গলী জাতিদের হাঙ্গামায়, ও যুদ্ধ-বিগ্রহে গিরি-বর্ত্মাদি অবরুদ্ধ ও ব্যবসা একবারে বন্ধ হইয়া যায়। উত্তর ব্রহ্ম ইংরাজাধিকৃত হওয়ায় এখন আবার বাণিজ্যাদি চলিতেছে ও ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ঐরূপ হইলেও, অন্তর্বাণিজ্য যেমন থাকা উচিত, সেইরূপই আছে। মণিপুর রাজ্যের অন্তর্বাণিজ্য অতি সুন্দর রূপে চলিয়া থাকে। রাজ্য মধ্যে বিস্তর হাট আছে। হাট (অল্প বা অধিক দিবসান্তর) নির্দ্দিষ্ট দিনে, প্রধান রাস্তা সকলের ধারে, বৃক্ষাদির তলে বা আচ্ছাদন-হীন স্থানে, বসিয়া থাকে। হাটের (বিশেষতঃ বিক্রয়ের) কার্য্য, স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রধানতঃ সম্পাদিত হয়। প্রত্যেক পরিবারের আবশ্যকমত চাউল নিজের চাষে প্রায় জন্মিয়া থাকে। এজন্য হাটে চাউল বিক্রয় অল্পই হইয়া থাকে। হাটে শাক, মৎস্য, ফল, তরকারী, মিষ্টান্নাদি সচরাচর বিক্রয় হয়। কোন কোন হাটে, সময় বিশেষে, পশু, পক্ষী, শৃঙ্গ, চর্ম্ম প্রভৃতিও আনীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

বিনিময়ের নিদর্শন—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মণিপুরের কেনা-বেচা, অনেক পরিমাণে, পরস্পর দ্রব্য বিনিময়ে হইয়া থাকে। তথায় ব্রহ্মদেশের ও কলিকাতার টাঁকশালের টাকা (সমান দরে) এবং এখানকার আধুলি, সিকি, দুয়ানিও ব্যবহার আছে। মণিপুরেও একটি টাঁকশাল আছে। তাহাতে সেল নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র মুদ্রা প্রস্তুত হয়। হাটে বাজারে সেলেরই চলন অধিক। প্রায় তিন ভাগ তামার সহিত, এক ভাগ টীন মিশ্রিত করিয়া সেল মুদ্রা প্রস্তুত হয় একটির ওজন প্রায় দেড় আনা এবং এক পয়সায়

ছয়টি সেল, এই হারে সিকি, দুয়ানি, টাকার বিনিময় চলিয়া থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বাহুল্যাভাব এবং দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা বশতঃ মণিপুর রাজ্যে টাকার চলন অধিক নাই। মণিপুরীরা ধান্যাদি ধনে ধনী—টাকার কাঙ্গাল; অথবা তাহার অভাব বোধ না থাকাতে, তাহারা টাকার কাঙ্গাল নয়।

লবণ—লবণ ব্যতীত মানুষের আহার চলেনা, জীবন বাঁচে না। লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে না পাইলে, পশ্বাদি ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। প্রকৃতির রম্য-কানন মণিপুরে লবণ অনায়াসেই পাওয়া যায়। মণিপুরী প্রজা দিগকে লবণের জন্য আমাদের মত কষ্টকর কর দিতে হয় না। সেখানে কূপ খনন করিয়া লবণ তোলা হইয়া থাকে। এরূপ কূপ উপত্যকায় বিস্তর আছে, সেই গুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এগুলি রাজধানী হইতে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

খনিজ পদার্থ ও প্রস্তর—মণিপুর উপত্যকার উত্তরাংশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, পাথুরে কয়লা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই কয়লার গুণ কি? তাহার স্তরের বিস্তার ও গভীরতা কত? ইত্যাদি বিষয় এ পর্য্যন্ত ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। নানা জাতীয় কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য এবং কল কারখানার অস্তিত্বাভাব বশতঃ, মণিপুরে কয়লার প্রয়োজনও হয় না। তবে, এখন রেল চাল্লান হইলে ও কল বসাইলে সেই কয়লা বিশেষ কার্য্যে লাগিবে, সন্দেহ নাই।

থোবালের দক্ষিণ দিকে ও লাঙ্গাটেল গিরি শ্রেণীর অনতিদূরস্থ স্থান দিয়া যে সকল ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাদের গর্ভে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায় এবং সেই সকল স্থান হইতেই আবশ্যকীয় লৌহ মণিপুরীরা প্রধানতঃ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কামেঙ্গ ও উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতের নিম্নস্থ অন্যান্য স্থানেও লৌহ দেখা গিয়াছে। স্বর্ণরেণু ও

কোন কোন নদীর বালির সহিত কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্যপ্রভৃতির খনি আবিষ্কারের জন্য, এ পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা কিছুই করা হয় নাই। যাহা আছে, তাহাতেই তৃপ্ত এবং যেরূপে জীবন কাটাইতেছে তাহাতেই সন্তুষ্ট, সুতরাং চিন্ত-চাঞ্চল্য-হীন মণিপুরীরা, এ সকল বিষয়ে ততটা মাথা ঘামায় না।

পর্ব্বতমালা, নিবিড় বনরাজি সমাচ্ছন্ন থাকায়, এবং গিরি-বর্ত্ম সমূহ দুর্গম বিধায়, মণিপুরের প্রস্তরাদিও ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। কেবল জলস্রোতে যে সকল স্থানবিদীর্ণ হইয়াছে, সেইগুলি এবং প্রধান প্রধান কয়েকটী শৃঙ্গ ও ভূধারাংশ সমূহ কথঞ্চিৎরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে মাত্র। তাহাতেই পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-শ্রেণীতে চূণের পাথর দেখা গিয়াছে। মণিপুর ও কাছাড়ের মধ্যস্থিত গিরি-শ্রেণীতে এক প্রকার কটাবর্ণের বেলে পাথর ও লালবর্ণের লৌহ-কর্দ্দম দৃষ্ট হইয়া থাকে। উচ্চতর অংশ সকলে কর্দ্দম সম কোমল শ্লেট প্রস্তর অল্প পরিসর অসংখ্য স্তরে সজ্জিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। নদী ও জোল প্রভৃতির তীরজাত বিবিধ বৃক্ষাদি যে বহুকাল পূর্ব্বে পাষাণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষীভূত বিষয়।

মণিপুর ও কুবো উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহ নানা জাতীয় বেলে পাথর ও শ্লেট পাথরেই সংগঠিত। তন্মধ্যে কয়েক প্রকার বিলক্ষণ ব্যবহারোপযোগী। নিজ কুবো উপত্যকায় লোহা ও পাথর এবং অধিক পরিমাণে উত্তম সাজিমাটি পাওয়া যায়। উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে মোরে নামক স্থানের নিকট হইতে, গর্ত্ত করিয়া সাজিমাটি উত্তোলিত হইয়া থাকে। মণিপুরের উত্তর দিকের যে পর্ব্বতে গ্রেমী জাতির বাস, তাহার উপরিভাগ ধূসর বর্ণের শ্লেট ও অধোপ্রদেশ কেবল মূল্যবান মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। মণিপুর রাজ্যে

যে বহুমূল্য মণিজাতীয় রত্ন বিস্তর আছে, তাহারও আভাস নানারূপে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কথা পড়িয়া পাঠক বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরাজী ধরণের বন্দোবস্ত করিলে, মণিপুর রাজ্যে অনতিবিলম্বে মহাদ্যোগী ইংরাজ পুরুষেরা ধনাগমের বিস্তর পন্থা বাহির করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শাসন-প্রণালী, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি।

সুনীল পত্রপল্লব-শোভিত তরুরাজি ও শাখা-প্রশাখা-প্রসারী, স্বজাতি-সহানুভূতি-পরায়ণ, আসঙ্গলিপ্সু ঘন বংশবন, মনিপুরী গ্রাম সকলের নিদর্শন। আবার, বৎসরের কয়েক মাস, সমুজ্জ্বল শ্যামল শস্যক্ষেত্র সমূহও তাহার বহিরঙ্গ বটে। লিমাটল ভূধরশ্রেণীর পাদমূলে বিষেণপুর পল্লী, সেই রাজ্যের এইরূপ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেখানে মহারাজের একটি ঘাঁটি বা পুলিস থানা আছে। বিষেণপুর হইতে একটি সরল পথ, রৌপ্যমণ্ডিতবৎ অগণিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর দিয়া, ধূসরবর্ণের রেখার মত প্রায় ৬ ক্রোশ চলিয়াছে। দূর হইতে দেখা যায় যে, সেই পথটি একটি নিবিড় জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হাট-বারের দিন হইলে, শত শত স্ত্রীলোক এবং অল্পসংখ্যক পুরুষ হাস্যমুখে, দ্রুতপদে, সেই পথ দিয়া (বাহ্যদৃষ্টিতে) সেই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথা হইতে বাহির হইয়া আইসে। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সেটি জঙ্গল নয়—বাস্তব সেই জঙ্গলবৎ-

স্থলের মধ্যেই, মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল নগর অবস্থিত। এখানে গগনভেদী মন্দির-চূড়া নাই—বৃহদাকার চিম্‌নি সমূহও অন্তর্জ্বালার নিদর্শনরূপ দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তপ্ত ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে না। কেবল অনন্ত নীলাকাশের চন্দ্রাতপের তলায়, ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজি স্থির-গম্ভীর শোভা-সৌন্দর্য্যে সজ্জিত রহিয়াছে। জনতার কোলাহল বা শোকের হাহাকার, দূর হইতে কিছুই শ্রুত হয় না। বাহ্যিক কোন চিহ্নেই বুঝিতে পারা যায় না যে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি সমৃদ্ধি-শালিনী নগরী আছে; যে নগরে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ লোক বাস করিয়া থাকে। অথচ, সেই বৃক্ষরাজির অন্তরালেই মণিপুরেশ্বরের রাজপ্রাসাদ লুক্কায়িত রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের নিকটেই, মহারাজার আত্মীয় ও সমাদৃতগণের বসতবাটী। প্রত্যেক বাটীরই চারিদিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গন।

ইম্ফালের অপর নাম মণিপুর। ইম্ফাল প্রকৃতপক্ষে, রাজবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামসমূহের সমষ্টি। সরল, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দ্বারা ইম্ফালের বিভিন্ন অংশ (বা গ্রামগুলি) সংযুক্ত। প্রায় সকল রাস্তারই উভয় পার্শ্বে পাদপের সারি এবং রাস্তাগুলি পরস্পরকে প্রায়ই সমকোণে কর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। সে সব রাস্তায় বাড়ী কাঁপাইয়া ঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় না। ট্রামগাড়িও লোকের হাত পা ভাঙ্গিয়া বা দেহ দ্বিখণ্ড করিয়া দিয়া যায় না। গো-শকট-চালকেরও অশ্লীল কটুকাটব্য বাক্যে ভদ্রলোকের কাণ ঝালা পালা হয় না। সে নগরে সবল, সুস্থকায় ও সহাস্যবদন নরনারীর দ্বারা রাজপথ পরিপূরিত। বালক বলিকারা মনের সুখে নানা রঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতেছে বা সঙ্গী-সঙ্গিনীগণের সহিত কৌতুক করিয়া উচ্চ-হাস্য ধ্বনিতে বায়ু বিকম্পিত করিতেছে—পুলিস-প্রহরী তাহাদিগকে কোন কথাই বলিতেছে না। গৃহস্থেরাও আমোদে আহ্লাদে, আহারে ব্যবহারে, শ্রমে বিশ্রামে, ধর্ম্মে কর্ম্মে

দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের মনে বিজাতীয় আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্দাহ-ময়ী দুর্ভাবনা বা বিন্ধ্যস্পর্শী উচ্চাভিলাষ বা ঘৃণা-ব্যঞ্জক অহঙ্কার নাই। তাহারা বাজে আড়ম্বর, অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রম, অসার কপট শিষ্টাচার জানে না। দুর্ভাবনা যেন তাহাদের কাছে আসিতেই পারে না। তাহারা প্রকৃতির প্রাচুর্য্যে, সরল স্বভাবে, মনের সুখে ও হৃদয়ের শান্তিতে জীবন যাপন করে। ইম্ফালাধিবাসীদের অবস্থা এইরূপ এবং ইম্ফাল এইরূপ অপূর্ব্ব (অসভ্য) নগর।

এই নগরেই মণিপুরাধিপতি মহারাজ স্বজনগণসহ সুখে বসতি করিতেন। রাজ্যেশ্বর এখানে, আর্য্য গৌরবে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে, প্রকৃত ধর্ম্মাবতার স্বরূপে—ন্যায়, দয়া, স্বাধীনতা, সম্মান, সৌজন্য, জ্ঞান ও সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উৎস ও আশ্রয়-স্থল হইয়া, বিরাজ করিতেন। অপ্রতিহত রাজশক্তি মহারাজের অঙ্কশায়িনী এবং তিনিই সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তিনি নিজে সর্ব্বদা ভারপ্রাপ্ত অমাত্যবর্গের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাপালন—শিষ্টের পোষণ ও দুষ্টের শাসন করিতেছিলেন। অবসর-কালে, ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের পরকাল চিন্তা ও প্রজাগণের মঙ্গল কামনা করিতেন। মণিপুরের এই-রূপ মহারাজা ছিলেন—স্বর্গীয় চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি ও আপাতঃ-সিংহা-সন-চ্যুত সাধুস্বভাব শূরচন্দ্র সিংহ। শেষোক্তের পদে অভিষিক্ত হইয়া মহারাজা কুলচন্দ্রও (যিনি অল্পকাল রাজা ছিলেন) রাজকীয় পদ-গৌরব অটুট রাখিয়াছিলেন।

রাজস্ব—মণিপুর-রাজ্যেশ্বরের বার্ষিক আয় কত, তাহা সঠীক জানিবার জন্য, ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি কয়েক বৎসর হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। রাজ-দরবারের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরাও তাহা সঠীক বলিতে পারেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহারাজা

শূরচন্দ্রও স্বয়ং বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। না বলিতে পারিবার বিশেষ কারণও আছে।

নাগা, কুকি প্রভৃতি অনেকানেক জাতি, মণিপুর রাজার বাধ্যতা স্বীকার করিলেও, কর বা নজর স্বরূপ কি দিবে, সকলের সম্বন্ধে তাহার স্থিরতা নাই। সম্মান প্রদর্শন ও অধীনতা স্বীকারের প্রমাণ স্বরূপ তাহারা রাজকর ও নজর দিবে, এমন সর্ত্ত আছে। কিন্তু কোন্ সময় কি পরিমাণে কি দেয়, তাহার স্থিরতা না থাকাতে রাজ্যের আয় ব্যয় কোনমতেই নির্ণীত হইতে পারে না। উহারা প্রায় টাকা দেয় না, গিরি-বনোৎপন্ন, শিকার-লব্ধ বা শিল্পজ সামগ্রী দ্বারাই রাজ-ঋণ পরিশোধ করে। সে সকল অর্থের তুল্য কার্য্যকর বটে, কিন্তু তত্তাবতের মূল্য নিরূপণ দুঃসাধ্য। আবার প্রতিবর্ষে একরূপই দেয় না—গত বৎসর যাহারা কেবল একটি ৫।৬ টাকা মূল্যের পার্ব্বতীয় গাভী নজর দিয়াছিল, এ বৎসর , তাহারা হয়তো, গো, মেষ, মম, মধু প্রভৃতি অন্যবিধ পদার্থ দিল। হয় তো তত্তাবৎ বিক্রয় দ্বারা মহারাজা সহস্রাধিক মুদ্রা পাইলেন। আবার যে জাতি পূর্ব্ব বৎসরে পঞ্চ সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি দিয়াছিল, পর বর্ষে তাহারা হয় তো অবাধ্য বা বিদ্রোহী হইয়া কিছুই দিল না। অপিচ, অনেক স্থলে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য লইয়া রাজস্ব আদায় হয়। অধিকাংশ পাহাড়ীরা এবং অল্পাংশ নিম্নদেশবাসী শ্রমজীবী প্রজারা বৎসরের বা মাসের কয়েক দিন গতরে খাটিয়াও রাজঋণ শোধ করে। কতক লোক বা বেতন স্বরূপ নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বভোগী হয়। তদ্বাদে মহারাজার প্রয়োজনানুসারে সরল সবল মণিপুরীরা ও শ্রমশীল পার্ব্বত্য জাতিরা অনিয়মিত কার্য্য করিয়া দিতেও বিমুখ হয় না। এই সমস্তকে অবশ্যই রাজস্ব মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। এমত অবস্থায়, বার্ষিক আয়-ব্যয়-তালিকা ঠিক

হইবে কিরূপে? তদ্ভিন্ন, বন, খাল, বিল, প্রভৃতির জমা স্বরূপ দ্রব্য-জাত, জঙ্গলের বৃহৎ কাষ্ঠাদি ও ধৃত হস্তী * বিক্রয়ের আয়ও আছে। এই সমস্ত একত্র করিয়া টাকার হিসাবে আনিলে, মণিপুর মহারাজের আয় ২৫।৩০ লক্ষ টাকারও অধিক হইবে। কিন্তু তিনি প্রতিবৎসর নগদ পাইয়া থাকেন, আন্দাজ ৭০ হাজার টাকা মাত্র। ইহার মধ্যে ইংরাজ-রাজ-প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তি ৬৩৭০৲ টাকা। (২নং দলীল দেখ।) মণিপুরে রসিদ-টিকিট, দলীলের ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির চলন নাই।

দরবার—মহারাজের মন্ত্রী সভা এই সকল পারিষদ দ্বারা সংগঠিত। যুবরাজ, সাধারণ মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজস্ব-তত্ত্বাবধায়ক, বিচারমন্ত্রী, অশ্ব-তত্ত্বাবধায়ক, হস্তী-তত্ত্বাবধায়ক, যান (পালকী, তাঞ্জাম প্রভৃতি) তত্ত্বাবধায়ক। † রাজার পরেই যুবরাজের ক্ষমতা; তিনিই ভাবী

---

* মণিপুরের বনে হস্তী বিস্তর এবং প্রায় প্রতি বৎসরই বহু সংখ্যায় তাহা ধৃত হইয়া থাকে। রাজসরকারের প্রয়োজন মত রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বিক্রীত হয়। হস্তী ধরিবার নানা কৌশল আছে। তন্মধ্যে খেদাই প্রশস্ত। শীত ও গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত ও জঙ্গল মধ্যস্থ জল শুকাইয়া যায়, সুতরাং হস্তীরা দলে দলে, কোন নদী বা জলাশয়ের জল পান করিতে আসিতে বাধ্য হয়। হস্তীদের অজানিত ভাবে, সেই স্থান বৃহৎ কাষ্ঠের বেড়ার দ্বারা ঘিরিয়া ২।১ টি প্রবেশের পথ রাখা হয়। দুরারোহ পর্ব্বত ও বৃহৎ বনস্পতি সকল থাকায়, যেখানে অধিক বেড়া দিতে হইবে না, এমন স্থানই খেদার জন্য মনোনীত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে হস্তী-যূথ তাড়া পাইয়া প্রবিষ্ট হইলে, প্রহরীদের সাঙ্কেতিক শব্দে হঠাৎ দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলে। হস্তীরা মহা-বিপদে পড়িয়া বেড়া ভাঙ্গিবার বা পলাইবার অশেষ চেষ্টা পাইয়াও যখন কৃতকার্য্য হয় না এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্রমে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন মনুষ্যের কৌশলজালে পড়িয়া নিস্তেজাবস্থায় ক্রমে বাধ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়; কয়মাসের মধ্যেই অতি দুর্দ্দান্ত বন্য হস্তীও মাহুতের আজ্ঞাবহ ও অনুগত হইয়া থাকে।

† অশ্ব—সিরগল, হস্তী—সামু; যান—দোলায়াই; তত্ত্বাবধায়ক হান্‌জাবা।

রাজা। এই পদে ও অন্যান্য মন্ত্রীত্বে রাজ-পরিবারের উপযুক্ত লোকেরা বরিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্ প্রজারাও মন্ত্রীপদাভিষিক্ত হইতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব-ভার বিভিন্ন মন্ত্রীর উপর। গুরুতর কার্য্য মাত্রই মহারাজের নেতৃত্বাধীনে, সকল মন্ত্রীর সমবেত সভায় মীমাংসিত হইয়া থাকে।

বিচার—মণিপুরের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়ত প্রথা প্রচলিত। গ্রামের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি তাহার সভাপতি। ছোট আদালতও অনেক আছে। গো-মেষাদি লইয়া বা অন্য কারণে সামান্য বিবাদ ঘটিলে ছোট আদালতই বা পঞ্চায়তেই তাহার মীমাংসা হয়। পার্ব্বত্য ও জঙ্গলী জাতিদের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রত্যেক জাতি ও শ্রেণীর একজন কর্ত্তা (বা সর্দ্দার) আছে। ক্ষুদ্র বিবাদাদি তাহারাই মিটাইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বিষমতর মনান্তর স্থলে, ইহারাও পঞ্চায়ত ডাকে। কেবল গুরুতর বিবাদ হইলেই মণিপুরী প্রজাদিগকে, সাক্ষাৎ রাজ আদালতে যাইতে হয়। মণিপুর রাজ্যে তিনটি প্রধান আদালত আছে। ১ম, পাজা বা স্ত্রী-আদালত—এখানে গৃহ-বিবাদ পর-দার, ভ্রষ্টাচার, স্ত্রী-প্রহার প্রভৃতি যে সকল মোকদ্দমায় স্ত্রীলোকে সংশ্লিষ্ট আছে, সে সমস্তেরই বিচার হইয়া থাকে। মণিপুরী স্ত্রী-আদালতটি একটি অপূর্ব্ব পদার্থ। ইউরোপীয় জাতিদের সেই আদর্শের অনুকরণ করা উচিত। ২য় সামরিক আদালত—রাজ্যের সৈন্যদলের ৮ জন প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারা এই বিচারালয় গঠিত। যে সকল মোকদ্দমায় সিপাহী শান্ত্রীরা পক্ষভুক্ত, এখানে সেই সমস্তেরই বিচার হইয়া থাকে। ৩য়, চিরাপ—ইহাই মণিপুরের প্রধান আদালত, আমাদের দেশের হাইকোর্টের মত। উল্লিখিত পঞ্চায়তের ও পাজা বিচারালয় হইতে এইখানেই আপীল হইয়া থাকে। যাবতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার, ইহাই

শেষ আদালত। বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়। চিরাপে মহারাজার নিয়োজিত ১৩ জন প্রবীণ বিচারপতি আছেন। বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য (আমাদের হাইকোর্টের মত) ইহা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াও কার্য্য করে। আর, সামরিক আদালত ইংরাজের কোর্টমাস্যাল ধরণের। তবে মণিপুরী সামরিক আদালত স্থায়ী—কোর্টমাস্যাল প্রয়োজন মত প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রভেদ এই। সকল মোকদ্দমায় চূড়ান্ত আপীল মহারাজার নিজের কাছে। নিতান্ত দীন দুঃখী প্রজাও তাঁহার দর্শন পাইতে ও অবাধে কষ্টের কথা জানাইয়া প্রতিকার চেষ্টা করিতে পারে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মণিপুরের পঞ্চায়ত প্রণালী ও বিচার-প্রথা আমাদের দেশের অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসনীয়। সমগ্র ভারতেই পূর্ব্বে এইরূপ ছিল।

রাজদণ্ড—অধিকাংশ অপরাধের(বিশেষতঃ চুরি ও আঘাতাদির) বেত্রাঘাত শাস্তি প্রদত্ত হয়। তদধিক অপরাধীদের কারাবাস। রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গনের মধ্যে মণিপুরের জেল অবস্থিত। তাহাতে একশত লোকের থাকিবার স্থান আছে—কিন্তু তাহা খালিই পড়িয়া থাকে। রাজ্য মধ্যে এরূপ অপরাধীর সংখ্যা যে কত কম, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। মণিপুর জেলের বন্দীদিগের আহারাদি বিষয়ে তাদৃশ কষ্ট নাই। রাস্তা ঘাটের কার্য্যে তাহাদিগকে অবাধে লাগান হয় এবং তাহারা নাকি ইচ্ছামত আত্মীয়-স্বজনের সহিতও দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে ও বাড়ী যাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ছুটি পাইয়া থাকে।

বেত্রাঘাত ও কারাগার ভিন্ন এখানে শাস্তিস্বরূপ জরিমানারও নিয়ম আছে। অপরাধীকে সুপথে আনিবার জন্য, একটি অভিনব

নিয়ম এই যে, কোতোয়াল বা তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা, তাহাকে ধরিয়া প্রকাশ্য রাজপথে বা হাটে লইয়া যায় ও তাহার দোষের কথা সকলের সমক্ষে প্রকাশ করে। এপ্রকার ভয়ানকরূপে লজ্জিত হইয়া অনেকে কুমতি ত্যাগ করে। অবশ্য, এরূপ শাস্তিও কেবল আদালতের হুকুমানুসারেই প্রদত্ত হয়।

নরঘাতী, রাজদ্রোহী প্রভৃতি ভয়ানক অপরাধীরই কেবল প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। এরূপ অপরাধের বিচার অতি সাবধানে সন্তর্পণের সহিত সমাধা হয়। নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ডের কথা কখনই প্রায় শুনা যায় না। মণিপুর রাজ্যে ফাঁসির চলন নাই। সেখানে দা বা খড়্গের সজোর আঘাতে বধ্য ব্যক্তির গলা একবারে দ্বিখণ্ড করা হয়।

দুঃখ-নিবারণ-ব্যবস্থা—সাধারণের কষ্ট-নিবারণ ও অভাব-পূরণের জন্য, এরাজ্যে নানাপ্রকার সুব্যবস্থা আছে। অকিঞ্চিৎকর বিলাসিতা না থাকিলেও এখানে প্রকৃত দারিদ্র-জনিত দুঃখ বড়ই কম। এরাজ্যে কেহই কখনও অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হয় না। কাহারও নিতান্ত দুঃখের দশা ঘটিলে, পঞ্চায়ত হইতে সে আবশ্যক মত আহার, বস্ত্রাদি সমস্তই পাইয়া থাকে। অক্ষম ও অভিভাবক-বিহীন ব্যক্তি মাত্রেরই তত্ত্বাবধারণ, গ্রাম্য সমিতি করে। পঞ্চায়ত পীড়িতের ঔষধ ও নিঃস্ব-দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার সৎকারার্থে কাষ্ঠাদি দেয়। এ সমস্ত সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহার্থ, রাজদরবার হইতে ভূসম্পত্তির আয়, স্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত আছে। অধিকন্তু মহারাজা নিজে সর্ব্বদা এ সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ ও আবশ্যক মত সাহায্য করিয়া থাকেন।

সাধারণের সুবিধার জন্য নিজ রাজধানীতে ১৮৮২ সালে একটি ডাকঘর ও একটি ডাক্তারখানাও খোলা হইয়াছে। ডাকঘরের কার্য্য এরূপ চলিতেছে যে, তাহাতে মনি-অর্ডার, তারে সংবাদ ও পত্রাদির

যাতায়াতে, গড়ে মাসিক এক শত টাকার উপর আয় হইয়া থাকে। মণিপুরের ডাকঘরে যে টাকা জমে, তাহা হইতেই সেখানকার ইংরাজ-কর্ম্মচারীর বেতনাদি দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বের মত আর মণিপুরে টাকা পাঠাইতে হয় না।—বরাত চিঠিতেই এখন চলে। সাধারণের উপকারের সহিত ইহাতে গভর্ণমেণ্টেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এলোপ্যাথিক মতে ডাক্তারখানাটি তৎপূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর সেই ডাক্তারখানায় প্রায় দশ হাজার মণিপুরী ও এক হাজার পাহাড়ী লোক চিকিৎসিত হয়। তথাচ, সাধারণতঃ রোগীদের চিকিৎসা দেশীয় মতে দেশীয় চিকিৎসকদের দ্বারাই হইয়া থাকে। আমাদের মত মণিপুরীরা এখনও বিলাতী ঔষধে একবারে মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে শিখে নাই।

জলবায়ূ প্রভৃতি—দারুণ গ্রীষ্মকালেও, রাত্রে ও প্রাতঃকালে, মণিপুরে শীত বোধ হয়। শীতকালে, উপত্যকাভূমে সচরাচর কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। কিন্তু নদী, সরিতাদি জমিয়া কখনও বরফে পরিণত হয় না। বর্ষা বেশ হয়—কখনও বা অতি বৃষ্টি হইয়া ধান্যের ব্যাঘাত জন্মায়। সম্বৎসর ধরিয়াই প্রায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহে। এরাজ্যে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ২১।২২ বৎসর পূর্ব্বে একবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া, লোকের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাতে অনেকের প্রাণও গিয়াছিল।

রাস্তা—প্রথম ব্রহ্মসমরান্তে, ১৮৩২ হইতে ১৮৪২ সালের মধ্যে, ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট (অবশ্যই মণিপুর মহারাজার সম্মতি লইয়া) কাছাড় জেলা হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করেন। সেইটিকেই রাজ্যের মধ্যে প্রধান পথ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইংরাজ-রাজ সেই পথটিকে নিজব্যয়ে ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত মেরামত অবস্থায়

রাখেন। তৎপরে উভয়ের বন্দোবস্ত ক্রমে, সেটির মেরামতের ভার মণিপুরের মহারাজা নিজে গ্রহণ করেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহা দিয়া ভারবাহী বলদশ্রেণী যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট-রাস্তার উত্তর দিক দিয়া, "আকুই" পথ নামে আর একটি বাণিজ্য পথ, মণিপুর হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত আছে। তাহা দিয়া পার্ব্বত্য জাতিরা গতায়াত করিয়া থাকে। নিজ উপত্যকার মধ্যে, বিস্তর পথ আছে। সেগুলি রীতিমত বাঁধান না হইলেও, দেশের বাণিজ্য তদ্দ্বারা চলাচলের পক্ষে কিছু মাত্রও অসুবিধা ঘটে না। রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র নদী ও খাল, জোল বিস্তর। সে সকলের উপর পুল, সেতু তৈয়ারি করা, বড় কষ্টকর ও ব্যয় সাধ্য। ভাল রাস্তা তৈয়ারীর পক্ষে ইহাই প্রধান অন্তরায়। মণিপুরীরা কাষ্ঠাদি সংযোগে, "কাজচালানে" ধরণের যে সকল সেতু তৎপরতার সহিত প্রস্তুত করে, প্রতি বর্ষান্তেই সেগুলির পুনরায় মেরামত না করিলে, অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। নাগাপর্ব্বত-জেলার প্রধান নগর কোহিমার ১৮ মাইল দূর দিয়া একটি উত্তম পথ ১৮৮৩।সালে তৈয়ারি হইয়াছে। এপথ দিয়া লোক অশ্বারোহণে যাতায়াত করিতে পারে। মণিপুর হইতে উত্তর ব্রহ্মের তাম্ব এবং অন্যান্য স্থান পর্য্যন্ত কয়টি বাণিজ্য পথ আছে। কিন্তু প্রায়ই গিরিসঙ্কটের মধ্য এবং কোথাও বা পর্ব্বতের উপর দিয়া যাওয়াতে. সেগুলি অত্যন্ত বন্ধুর এবং তদ্দ্বারা যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য।

সৈন্য সামন্ত—গোলন্দাজ বা কামানী সৈন্য—প্রায় ৫০০; অশ্বারোহী—৪০০; পদাতিক—প্রায় ৫৫০০; অর্দ্ধশিক্ষিত কুকি সৈন্য—প্রায় ৭০০। মহারাজা ইচ্ছা করিলে, অনুরক্ত কুকি ও নাগা লইয়া, অবিলম্বে বৃহৎ সৈন্যদল সংগঠিত করিতে পারেন। সৈন্যেরা প্রায়ই বেতন পায় না—মহারাজের অধীনে জমী জমা ভোগ করিয়া
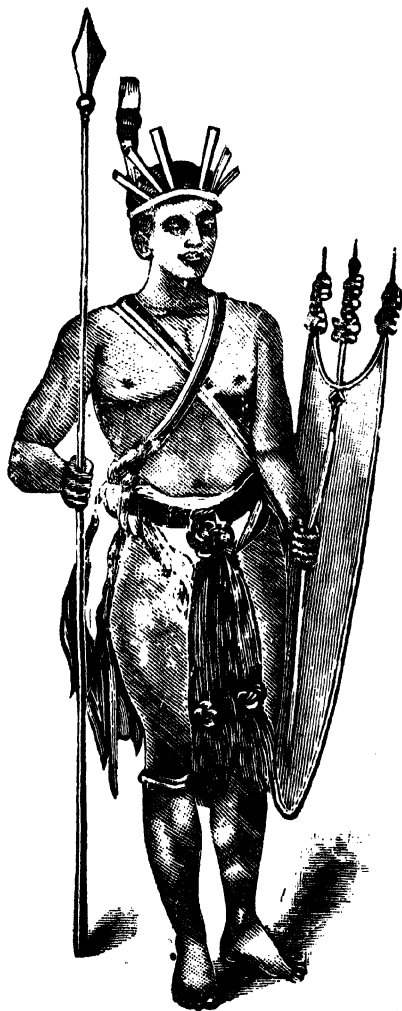
মণিপুর মহারাজের কুকি সৈন্য।

৪৬ পৃষ্ঠা।

তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে। রাজসরকার হইতে অবশ্যই অস্ত্র শস্ত্র ও শ্রেণীবিশেষের সৈন্যদিগকে নিয়মিত পরিচ্ছদাদি দেওয়া হয় এবং যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকার সময়, আহারাদির সুসঙ্গত বন্দোবস্তও আছে।

মণিপুরী সৈন্য নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। গোলন্দাজ ও বন্দুকধারী সৈন্যেরা কামান, গোলা, বন্দুক, গুলি ইত্যাদি ব্যবহার করে। তাহারা বারুদের রহস্য বেশ জানে। অন্যান্য শ্রেণী ঢাল, তরবারি, বল্লম, বর্শা, সঙ্গিন, দা, টাঙ্গি প্রভৃতি এবং পাহাড়ী সৈন্যেরা তীর, ধনুক প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরাজের কাছে, মণিপুররাজ মধ্যে মধ্যে ২।৪ টা কামান, ও বিস্তর বন্দুক উপহার পাইয়াছেন। সৈন্যেরা সে সমস্তই ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব মণিপুরের যুদ্ধসামগ্রীর মধ্যে উত্তম টোটাদার বন্দুকের অপ্রতুল নাই। কিন্তু বেশীর ভাগই সেকেলে ধরণের বন্দুকাদি।

সৈন্যেরা কিয়ৎপরিমাণে রক্ষক ও প্রহরীর কার্য্যও করে। তদ্ভিন্ন এই সকল ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত আছে; তদনুসারে ১৭ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক মণিপুরী পুরুষ, প্রত্যেক ৪০ দিনে ১০ দিন অর্থাৎ মাসে ৭৷৷০ দিন বা বৎসরে ৩ মাস, মহারাজের কার্য্য করিয়া দেয়। এইরূপ কার্য্য-প্রথাকে "লাল্লুপ" বলিয়া থাকে। জাতি অনুসারে সকলকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। কার্য্য বিভাগ প্রধানতঃ চারিটি —লাইফুম, কাফুম, আহুল্লুপ ও নিহারূপ; আবার এই সকল বিভাগ নানা উপশ্রেণীতে বিভক্ত।

সৈন্যগণের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়কের নাম সেনাপতি—কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের উপাধি ইংরাজের অনুকরণে প্রদত্ত হই-

য়াছে, যথা কাপ্তেন, মেজর, কর্ণেল, জেনারেল ইত্যাদি।

মণিপুরী সৈন্যগণ, বীর, সাহসী ও যুদ্ধপটু। কিন্তু তাহারা আধুনিক ইউরোপীয় প্রথায় রীতিমত শিক্ষিত হয় নাই। সুশিক্ষিত ও দক্ষ কর্ম্মচারীগণের দ্বারা সুপরিচালিত হইলে, তাহারা বিশেষ কার্য্যকর ও অতিপরাক্রমশালী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু স্বাধীনাবস্থায় তাহা ঘটিবার দিন এখন চলিয়া গিয়াছে।

মণিপুরী সৈন্যেরা অনেক সময়, ইংরাজের বিশেষ উপকার করিয়াছে। এমন কি, কত মহা বিপদ হইতেও আমাদের গভর্ণমেণ্টকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছে। ইহার কতক আভাস ইতিহাস অংশে পাইবেন।

মহারাজের আধিপত্য—মহারাজা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা—একছত্রী অধীশ্বর। রাজ্যের বন, জঙ্গল, পাহাড়, ভূমি, হ্রদ, নদী প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার সম্পত্তি—একথা তিনিতো জানেনই, তাঁহার প্রজামাত্রেই ইহা অন্তরের সহিত স্বীকার করে। তাঁহার নিয়োজিত ও বিশ্বস্ত মণ্ডল প্রতিগ্রামেই আছে। জমী, জমাতে মণ্ডলদের নিজের কোন অধিকারই নাই—তাহারা রাজ সরকারের কর্ম্মচারী মাত্র। তথাচ আমাদের দেশের জমীদারদের মত, তাহাদের অনেকটা নিজগ্রামে মান সম্ভ্রম এবং রাজদরবারেও প্রতিপত্তি আছে। অধিকন্তু ইহারাই প্রায় গ্রাম্য-সমিতি বা পঞ্চায়তের সভাপতি এবং অনেক বিষয়ে সমস্ত গ্রামের এক প্রকার প্রতিভূ-স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক কৃষক ও প্রজার নিকট মণ্ডলেরা, শস্যাদির ধার্য্য অংশ ন্যায্যমত আদায় করে ও রাজ সরকারে (সকলের একত্র হিসাব সহ) বুঝাইয়া দেয়। এবম্বিধ কার্য্যের জন্য মণ্ডলদের সুসঙ্গত প্রাপ্যেরও নিয়ম আছে।

মহারাজা সকল কার্য্যেরই উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রাণদণ্ডাদি কেবল তাঁহারই হুকুমে অথবা মঞ্জুরি মতে হইয়া থাকে। সকল বিষয়ের শেষ বিচার এবং চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে।

মণিপুরাধিপতি, ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নিয়মে ও রাজ্যের পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথানুসারে রাজকার্য্য করিয়া থাকেন। কোন প্রচলিত বিধির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংশোধনের প্রয়োজন হইলে, মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, মতামত জানিয়া সকল দিকে সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া, তিনিই সে পক্ষে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতাধিকারী।

ব্রিটিশ রেসিডেন্সি—রাজধানীতে, প্রাসাদের নিকটেই রেসিডেন্সি। ইংরাজ পলিটিকেল এজেন্ট মহাশয় তথায় অবস্থিত। তাঁহার অধিনে প্রায় একশত সৈন্য, একজন ইংরাজ সেনানায়ক, একজন ডাক্তার, একজন বাঙ্গালী কেরাণি ও ঘোড়ার সহিস প্রভৃতিতে নূন্যাধিক দেড়শত লোক ও কয়েকটা ঘোড়া, কতকগুলি বন্দুক, টোটা, বারুদ প্রভৃতি আছে।* অশ্বশালা, বারুদখানা, ডাকঘর প্রভৃতিও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আছে।

মণিপুরাধিপতি, গুইকুঁয়র প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যেশ্বর অপেক্ষাও যথার্থ স্বাধীন ভূপাল ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় রেসিডেন্ট সাহেবকে তত, ভয় করিয়া তাঁহার চলিতে হইত না। কিন্তু হায়! সেই "নির্ভয়" মহামহিমান্বিত পুরুষ সহসা "মহাভয়ের" অধীন হইয়া এখন তিনি কোথায়? ইহার উত্তর পাঠকও জানেন, আমরাও বলিব। হায়!

---

* পলিটিকেল এজেন্টের অধীনে পূর্ব্বে অতি অল্প সৈন্যাদি থাকিত। মহারাজ শূরচন্দ্রের আমলের শেষ পর্য্যন্ত, ক্রমে ক্রমে তাহা বাড়িয়া এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। ইহা ১৮৩৫ সালে সর্ব্ব প্রথম স্থাপিত হয়।

অদৃষ্ট ও কালনেমির চক্র কাহার কখন বক্র হইয়া আরোহীকে উল্টা-ইয়া ফেলিয়া দেয়, কে বলিতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাচীন প্রসঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে, অর্জ্জুনপুত্র মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনের কথা উল্লেখ আছে এবং মহাভারতেরআদি ও অশ্বমেধ পর্ব্বে, মণিপুর ও তদধিপতি বভ্রুবাহনের সবিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি কথা উঠিয়াছে যে, আমরা যে মণিপুরের ইতিহাস লিখিতেছি, সে মণিপুর মহাভারতের বর্ণিত দেশ নহে। মহাভারতের বর্ণিত মণিপুর নাকি উড়িষ্যাঞ্চলে বা অন্য স্থানে আছে। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, জন-শ্রুতি ও প্রবাদ-বাক্যকে সহসা অগ্রাহ্য করা, সুবিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিতের কর্ত্তব্য নয়। মণিপুর প্রদেশে আবহমান যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই মণিপুরই যে মহাভারতের সেই মণিপুর, তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। মণিপুরের মহারাজা, রাজবংশীয়গণ ও প্রধানবর্গ সকলেই আপনাদিগকে মহাবীর বভ্রুবাহনের ও তদাত্মীয়কুলের ধুলজাত বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। সে দিন মহারাজ শূরচন্দ্র আমাদের বড় লাট বাহাদুরের নিকট যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে বভ্রুবাহনেব বংশধর, তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। বিশাল ভারতবর্ষের অন্যত্র আরো মণিপুর থাকিতে পারে, অথবা

পূর্ব্বে ছিল, ইহাও অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহা বলিয়া স্থানীয় প্রমাণ সমূহকে উড়াইয়া দিয়া আবিষ্কারক, নামের লোভে হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া আর একটি মণিপুরে অর্জ্জুনকে লইয়া যাওয়া, অন্ধ অনুসন্ধিৎসুর কার্য্য বৈ আর কিছুই বুঝায় না।

আসাম ও মণিপুর অঞ্চলে কত পর্ব্বত ও তীর্থাদি অদ্যাপি যে সব নামে অভিহিত ও যেরূপ স্থলে অবস্থিত, তাহা ভারত ও পুরাণের বর্ণনা সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত হয়। যাঁহারা সন্দেহ তুলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সে সব পুরাতন পুথির পাতা উল্টাইয়া দেখা এবং "সারে জমিনে" গিয়া অনুসন্ধান লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্ম বিচারের স্থল ইহা নহে, সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

মহাভারতের বর্ণনানুসারে, বীরচূড়ামণি অর্জ্জুন এক সময়ে দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী তীর্থ-পর্য্যটন-ব্রতে ব্রতী হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ পূর্ব্বক নানা তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করেন। সেই কাল মধ্যে পুনরায় দুইটি দার পরিগ্রহ করেন; ১ম, ঐরাবতবংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপী; ২য়, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদা। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-কুল-ধুরন্ধর তৃতীয়পাণ্ডব মহাত্মা অবশ্যই নীচজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন নাই। অতএব ইহাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অর্জ্জুনের সময়ে নাগ প্রদেশে ও মণিপুরে সুসভ্য ও ভদ্র জাতিরা বাস করিতেন। অন্ততঃ তাহাদের রাজারা নিশ্চয়ই উচ্চশ্রেণীস্থ ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, তাহাতো নিঃসন্দেহে প্রমাণী কৃত হইতেছে।

অর্জ্জুনের ঔরসে উলুপীর গর্ভে ইরাবত এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন জন্ম গ্রহণ করেন। বভ্রুবাহন অপুত্রক মাতামহ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হইয়া মণিপুর রাজসিংহাসনারোহণ করেন; ইরাবত

নাগ-প্রদেশাধিপতিরূপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বভ্রুবাহন ও ইরাবত পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, উভয়েই দুইটি পার্শ্বাপার্শ্বী রাজ্যের রাজা হইলেন; তাঁহাদের সময় হইতেই, উভয় রাজ্যের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইয়া চলিতেছে, এমনি বোধ হয়। এখন পর্য্যন্তও মণিপুরী ও নাগাদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষ, হিংসা চলিতেছে কি না; নাগ প্রদেশ হইতে যে বৃহৎ স্রোতস্বতী উদ্ভূতা হইয়া ব্রহ্মের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, উক্ত রাজা ইরাবতের নামানুসারে তাহার নাম ইরাবতী হইয়াছে কি না; শাস্ত্রোক্ত "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" আধুনিক "আসাম" দেশ কি না; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে হত রাজা ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের রাজধানী ঠিক কোন্ স্থানে ছিল; ইত্যাকার বিষয়ের আলোচনা আমরা করিব না। কেন না সে স্থান ও সময় ইহা নয়। আবার যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়, অশ্বরক্ষক স্বয়ং অর্জ্জুনই হইয়াছিলেন। হয়বর মণিপুরে প্রবিষ্ট হইলে, মণিপুরাধিপতি অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহন যেরূপ অসীম ক্ষাত্র-তেজঃ প্রকাশ করেন, তাহা বীর্য্যবন্ত জাতি মাত্রেরই শিক্ষার বিষয়। মণিপুরেশ্বর যেরূপ অতুলনীয় শৌর্য্য-বিক্রমে ভুবন-বিজয়ী পাণ্ডব-বাহিনীকে পরাস্ত ও তন্নাথ স্বয়ং সব্যসাচীকেও রণশায়ী করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি যেরূপে মাতৃভৎর্সনায় লজ্জিত ও বিমাতৃ সাহায্যে মৃত-সঞ্জীবনী মণি দ্বারা পিতৃ-চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ ও পিতৃহত্যা পাপে নির্ম্মুক্ত হন, সে সব আমরা বিস্তারে কিছুই বলিব না। যেহেতু কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক সর্ব্ব-পাঠ্য ভুবন বিখ্যাত মহাভারত গ্রন্থেই তাহা অবগত হইবেন।

ফলতঃ ইটি নিশ্চয় যে মণিপুর অতি প্রাচীন দেশ এবং সেখানকার অধিবাসীরা (বিশেষতঃ উপত্যকার লোকেরা) অতি প্রাচীন কালের সভ্যজাতি। মণিপুরে "লোই" নামে একটি ইতর জাতি আছে।

মণিপুরী ভাষায় "লোই" শব্দের অর্থ "বিজীত"। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে, তাহারা আদিম নিবাসী এবং অপর কোন জাতি আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। এই আগন্তুক বলবান জাতিই অদ্যাপি মণিপুরে প্রভুত্ব করিতেছে। ইহারা নিশ্চয়ই আর্য্যজাতি। সেই আর্য্যজাতিরই রাজকন্যাকে বীরবর অর্জ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব মণিপুরীরা যে অতি প্রাচীন সভ্য জাতি, তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিতেছে না।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই আর্য্যজাতি কোথা হইতে, কেন, কবে, কিরূপে আসিয়াছিলেন? এরূপ প্রশ্ন করা অতি সহজ, কিন্তু উত্তর দেওয়া বড় কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব। এসম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা করিতে হইলে, সহস্র পৃষ্ঠা লিখিলেও শেষ হয় না এবং তাহার পরেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইংরাজ লেখকেরা মহাভারতের যুদ্ধকাল নির্ণয় কালে বাইবেলের লিখিত সৃষ্টি ও মহাপ্লাবন কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে সহসা শ্রদ্ধা স্থাপন কর্ত্তব্য নয়। পাঠক এই মাত্র জানিয়া রাখিবেন যে, অর্জ্জুনের সমকাল, অতি প্রাচীন কাল। এত প্রাচীন যে, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ ভিন্ন অন্য কোন গণ্যমান্য সভ্যজাতি অতি অল্পই ছিল। এখন যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ সভ্যপদে আপনাদিগকে অধিস্থাপন করিতেছেন, সেই আধুনিক ইউরোপীয়গণের পূর্ব্বপুরুষেরা তখন মনুষ্য ছিলেন, কি মানবদেহে আর কিছু ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, ইংরাজ প্রভৃতির বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কুরুক্ষেত্র সমরের সন তারিখ ঠিক করিতে যাই। যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মতে ঊর্দ্ধতন পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের

বেশী পৃথিবীর সৃষ্টিকাল নয়, তাঁহাদের দ্বারা ভারতের আর্য্যসভ্যতার কাল-সীমা (তাঁহারা যতটা পারেন) এদিকে টানিয়া আনাই সম্ভব—না আনিলে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্তি-বাদ যতটা তিষ্ঠে কৈ? অতএব সে সম্বেতে কেহই যেন এ অঙ্ক না কষেন, ইহাই প্রার্থনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মধ্য-কাল।

সেই বভ্রুবাহনের সময়, আর আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ—কতদিন! মধ্যে কত শতাব্দ—কত সহস্রাব্দ চলিয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে ধরাতলে কত জনপদ সৃজিত, বৰ্দ্ধিত, বিলুপ্ত বা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কে সংখ্যা করিতে পারে? হায়! তন্মধ্যে কত জাতি অভ্যুত্থিত হইয়া, বিক্রমে জগৎ কাঁপাইয়া, জ্ঞান গরিমায় সংসার প্রতি-ভাসিত করিয়া, আবার পতিত হইয়াছে। তাহারা রাখিয়া গিয়াছে কেবল কতকগুলি চিহ্ন—কতকগুলি সুকীৰ্ত্তি, কতকগুলি কুকীৰ্ত্তি—কতকগুলি কার্য্যাকার্য্যের স্মারক লিপি। "এ সংসারে কিছুই রয় না, রয় মাত্র রব!" কবির এ উক্তি ঠিক। প্রাচীন রাজ্যের অধিকাংশই অতি উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে, অতি নিম্নে পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রাচ্য-বিভাগে মিশর, তাতার, পারস্য, ভারতবর্ষ তাঁহার দৃষ্টান্তস্থল—চীনও প্রায় বটে।

মণিপুরাধিবাসী আর্য্যগণের মহোন্নতি কালের কথা প্রকৃত ইতিহাসাভাবে বলিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের অধঃপতনারম্ভের

বহুকাল পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান বঙ্গদেশে আসেন। তাঁহারা পদার্পণ করিয়াই তাৎকালিক গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত ও তদীয় সিংহাসন অধিকৃত করিলেন। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর এবং প্রদেশের পর প্রদেশ তাঁহাদের কবলে পড়িতে লাগিল। ক্রমে আসাম প্রদেশের যাবতীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরাজিত এবং উৎসন্ন হইলেন। অথবা কেহ কেহ তাঁহাদের অনুগ্রহাধীন করদ রাজা রূপে গণ্য হইতে পারিলেও আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত বিজয় পতাকা একদিকে গৌহাটি ও অপর দিকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়া যাবতীয় পার্ব্বত্যজাতি এবং ব্রহ্মাধিবাসিগণকেও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল। কোরাণ গ্রহণ অথবা পদলেহন বৈ নিস্তার ছিল না। তখন মুসলমানের ভীষণ জয়-নিনাদ বঙ্গের সর্ব্ব বিভাগে, প্রান্তসীমা ও প্রান্ত-বন-পর্ব্বত সর্ব্বত্র ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—সর্ব্বত্রই থরহরি কম্পমান। এই অবস্থা অল্প দিন নয়, সার্দ্ধ পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া চলিল। এমন সর্ব্বগ্রাস-কারী দাবানল মধ্যেও যাহারা স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সামান্য সৌভাগ্যবান ও যেমন তেমন তেজীয়ান ও বীর্য্যবান নহে। সে রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল কেবল তিন, চারিটি রাজ্য—উত্তরে নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং পূর্ব্বে মহিমান্বিত মণিপুর।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, পর্ত্তুগীজেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিলেন। ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণও তাঁহাদের পদানুসরণ করিলেন। ইংরাজ আসিলেন—সপ্তদশ শতাব্দীর, ঠিক প্রারম্ভে। প্রত্যেক

জাতিই ভারতের নানাস্থানে এবং তৎসঙ্গে বঙ্গদেশে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘোর স্বার্থময় বাণিজ্যের আধিপত্য লইয়া পরস্পরের রিষে জ্বলিয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। শেষে ফরাসীর সহিত ইংরাজের নানা স্থানে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। মুসলমান বাদশাহ, নবাব ও শাসনকর্ত্তাগণ অবস্থা ও রুচিভেদে এপক্ষে বা ওপক্ষে সহায় হইতে লাগিলেন। অথবা, তাঁহাদের মধ্যে ঘরাও বিবাদে কেহ ইংরাজকে কেহ ফরাসীকে সহায় করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। তন্মধ্যে ইংরাজ অধিকতর চতুর ও অধ্যবসায়ী, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষই প্রবল হইল; ফরাসী তিষ্ঠিতে পারিল না। একশত ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিযোগিতা চলিবার পর ইংরাজের কপালই প্রসন্ন হইল—ভারতময় ইংরাজের জয়পতাকাই উড়িল।

খ্রীষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ বণিকগণ এ দেশে আপনাদের আধিপত্য স্থাপনের নানা সুযোগ পাইলেন। অথবা বিধাতা ঘটাইয়া দিলেন। ফলতঃ পৃথিবীতে অলস এবং জন্মভূমির নিমিত্ত ত্যাগ-স্বীকারে বিমুখ, এমন মানব-জাতি-নিচয়ের উপর প্রভুত্ব স্থাপনার্থ যে সমুদয় গুণগ্রাম আবশ্যক, ক্ষুদ্র ব্রিটন-দ্বীপ-বাসী শুভ্রকায় জনগণ তদ্রূপ মহোচ্চ গুণমালায় সম্পূর্ণ বিভূষিত। তাঁহারা সুস্থ, বলিষ্ঠ, সাহসী, পরাক্রমী, মহোদ্যোগী, মহোৎসাহী, অধ্যবসায়ী, ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞ, বিজ্ঞান-রহস্যজ্ঞ, কার্য্য তৎপর ও অর্জ্জন-স্পৃহান্বিত। বিশেষতঃ পোত-চালনবিদ্যা ও বাণিজ্য-ব্যাপারে ইদানীন্তন কালে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং প্রায় সমগ্র ভূমণ্ডলের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বে পরম অভিজ্ঞ। তদ্ব্যতীত, ধর্ম্ম-নৈতিক ব্যবহার সম্বন্ধে, যে যে বিষয়ে সৎ-

প্রবৃত্তি ও সদাচরণ দেখাইতে পারিলে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করে, তাঁহারা সে কয়টি গুণ প্রদর্শনে সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহা বলাতে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গীণ ধার্ম্মিক বলা হইতেছে না, কেবল সত্যবাদিত্ব, ন্যায়পরতা, অপক্ষপাতিতা ও বাক্-দৃঢ়তা প্রভৃতি যে কয়টি মহদ্গুণ সর্ব্ব-লোক-রঞ্জন পক্ষে মহৎ সহায়, সেই সব গুণ যে (অন্ততঃ তখনকার) ইংরাজ-চরিত্রে অধিক পরিমাণে পরিদৃশ্যমান হইত, তাহারি উল্লেখ করিতেছি।

তৎকালে এ দেশের ঘোর হীন দশা—ধর্ম্মভাব নিতান্তই নিস্তেজ। ও পক্ষে ইংরাজের যে কথা, সেই কাজ এবং তাঁহাদের সমস্ত আচরণই সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং এক সময়ে একের প্রতি একরূপ, অন্য সময়ে অন্যের প্রতি অন্যরূপ, তাহা নয়। বাস্তবিকই অধিকাংশ ইংরাজের সত্যানুরাগ দেখিয়া এ দেশের লোক মুগ্ধ হইত ও ইংরাজকে সর্ব্বতোভাবেই বিশ্বাস করিত। ইংরাজও সেই মোহ ও বিশ্বাস যাহাতে না যায়, বরং বাড়ে, এমন সতর্ক হইয়া চলিতেন।

ইহা গেল তাঁহাদের নিজ পক্ষীয় গুণ—তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একবিধ অস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের তাৎকালিক অবস্থা, সেই শ্রেষ্ঠত্ব ঘটাইয়া দেওন পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য তখন মূলোৎপাটিত হইয়া নামে মাত্র কাণ্ড ভাবে স্থানটা জুড়িয়া ছিল মাত্র। দেশের রাজকীয় ব্যাপার সকলই বিপর্য্যস্ত, সকলই আলোড়িত, সমস্তই বিশৃঙ্খল—প্রায় অরাজক বলিলেই হয়। চতুর্দ্দিকে "জোর যার, রাজ্য তার" এই ভাবই চলিতেছিল। প্রদেশ সমূহ মধ্যে সুবাদার প্রভৃতি দিল্লীর অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক পরস্পর বিবাদোন্মত্ত। শাসনকর্ত্তারা ও সেনাপতিরা প্রভুদ্রোহী; প্রজারা রাজদ্রোহী; রাজারা প্রজাপীড়ক; ইত্যাকার পর পর

বাঙ্গালায় নবীন সুবাদার সিরাজুদ্দৌলা ঘোর রিপুপরতন্ত্র, অযথা বিলাসী এবং যথেচ্ছাচারী। ক্রমে তাঁহার অত্যাচার অসহনীয় হওয়াতে সচিবগণ, প্রধানগণ ও কোন কোন জমীদার তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বিদূরিত করণার্থ ষড় যন্ত্র করিলেন। ইংরাজের পূর্ব্বোক্ত গুণনিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের সাহায্যেই বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যুক্ত হইলেন। ইংরাজের পরাক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্য বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজকে গোপনে আহ্বান করিলেন। তাঁহারাও ক্ষুধার্ত্ত বাজপক্ষীর ন্যায় শিকারান্বেষণে ছিলেন। বিশেষতঃ সিরাজুদ্দৌলার সহিত তাঁহাদের যার পর নাই ঘোর শত্রুতা ছিল।

এই ষড়যন্ত্রের ফল, খৃঃ ১৭৫৭ অব্দে চিরস্মরণীয় পলাশীর যুদ্ধে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা সিরাজের হস্তচ্যুত হইল। প্রধান ষড়যন্ত্রী মীরজাফর নবাব হইলেন। কিন্তু কিছুদিনে তিনিও দেখিলেন ও সকলেই দেখিল যে, তিনি কেবল সাক্ষীগোপাল, দেশের প্রকৃত অধীশ্বর ইংরাজ। স্বেচ্ছামত সেই সাক্ষীগোপালকে সরাইয়া; ইংরাজ অন্য সাক্ষীগোপাল খাড়া করিলেন। চতুর ইংরাজ, সেনাপতি মীরজাফরকে সহায় করিয়া সিরাজকে যেমন সরাইয়া ছিলেন, এবার তেম্নি মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমকে উপলক্ষ করিয়া শ্বশুরকে অপসারিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্ত হইতেও রাজক্ষমতা আর এক জনকে নবাব নাম দিয়া আপনাদের হস্তে লইলেন— তাঁহাকে পেন্‌সন্ ভোক্তা সজীব পুত্তলিকা সাজাইয়া রাখিলেন।

আমাদের এ সমস্ত লিখিবার তাৎপর্য্য কেবল, কোন্ অবস্থায় এবং কি সূত্রে তাঁহাদের সহিত মণিপুরের প্রথম সংস্রব ঘটে, তদালোচনা। তদুদ্দেশ্যেই ইংরাজের তদানীন্তন অবস্থা প্রদর্শিত হইল। ইহার আবশ্যকীয়তা পাঠক অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন।

ইংরাজ কর্ত্তৃক নামতঃ ও কার্য্যতঃ রাজশক্তি গ্রহণের পূর্ব্বেই সামরিক সাহায্য প্রাপ্তি বাসনায় মণিপুরেশ্বর তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন? ইংরাজ তখন রাজা নন, তথাপি অন্য রাজা তাঁহাদিগের অনুকূল্য প্রার্থী। এইটি বুঝাইবার জন্যই ইংরাজের অভ্যুদয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইল।

সুদ্ধ মণিপুর বলিয়া নয়, মান্দ্রাজ, বম্বে, কর্ণাটাদি সর্ব্বস্থানীয় রাজা ও নবাবেরা তখন ইংরাজের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তৎকালে ইংরাজের বিজয় গৌরবে দেশ পরিপূর্ণ। প্রতাপে বঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বিশেষতঃ সভ্যতম পরাক্রান্ত ফরাসীজাতিকে ভারতের সর্ব্বাংশে হীনপ্রভ করাতে ইংরাজের মহিমা-বিভা উজ্জ্বলতর রূপে দীপ্ত পাইতে লাগিল। ইংরাজ কোম্পানি বানিজ্যে অদ্বিতীয়, ঐশ্বর্য্যে অদ্বিতীয়, সাংগ্রামিক ও রাজনৈতিক কৌশলেও অপ্রতিহত, কাজেই অদ্বিতীয় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। ইংরাজবাণিজ্যে দেশের ব্যবসায়-বিস্তার ঘটিয়া ব্যবসায়ী-শ্রেণী মাত্রেই অশেষ বিশেষরূপে উপকৃত ও উন্নত হইতে লাগিল। বহু বহু চাকরীপেশার ব্যক্তিরাও অতি সামান্য অবস্থা হইতে বড় লোক হইয়া উঠিল। দেশ মধ্যে ঐ দুই সম্প্রদায়ই ক্রমে অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া নানারূপে জমীদারাপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাবান হইতে পারিল—অতি ব্যয়শীল ভূস্বামীবর্গ তাঁহাদের নিকট প্রচুররূপে ঋণী থাকাতে দেশের স্বাভাবিক নেতা হইয়াও নত রহিতে বাধ্য হইতেন। ঐ দুই শ্রেণী, কোম্পানির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ইংরাজেরই বশীভূত, সুতরাং সহস্রমুখে তাহারা ইংরাজ-মহিমা গাহিয়া দেশশুদ্ধ প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায়কেই সাহেব-পক্ষপাতে মাতাইয়া তুলিল।

ইংরাজের আধিপত্য ও খ্যাতি, কেবল সমুদ্র-উপকূল ও গাঙ্গ

প্রদেশ সমূহেই পর্য্যাপ্ত হয় নাই ; দুরস্থ সীমা-প্রান্ত—উত্তরে,—নেপাল, ভোট, সিকিমাদি এবং পূর্ব্বে,—আসাম, মণিপুরাদি অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং কুচবিহার ও গৌহাটি প্রভৃতি স্থানের রাজারাও ইংরাজের অনুগ্রহ-প্রার্থী—সাহার্য্য-ভিখারী হইতেন। ঠিক এই সময়ে (খৃঃ ১৭৬২ অব্দে) ঐ সব হেতুতে মণিপুর-রাজের ইংরাজানুকূল্যের প্রয়োজন হইল—কোম্পানির সহিত মণিপুরের প্রথম সংশ্রব ঘটিল। সেই সাহায্য প্রদানার্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বার জন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত ছয় পল্টন সিপাহী প্রথমে মণিপুর যাত্রা করেন। যাত্রার প্রকৃত কারণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য।

ইতিপূর্ব্বে মণিপুরীরা ইংরাজের কোন ছন্দাংশে আইসে নাই, ইংরাজও সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ১৭৬২ অব্দই পরস্পরের পরিচয়ের কাল।

মুসলমান পাঁচ ছয় শত বৎসর ভারতে কত কাণ্ডই করিয়াছে ; পর্ত্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসীও কত কাল কত লীলাই খেলিয়াছে ; ইংরাজও কলিকাতায় কুঠি স্থাপনাবধি বঙ্গ মধ্যে কত রঙ্গই করিয়াছেন ; কিন্তু মণিপুরের স্বাধীনতা হরণে কেহই বদ্ধপরিকর হয়েন নাই। বোধ হয় ১৭৬২ সালের পূর্ব্বে এদিকে কেহ ফিরিয়াও চান নাই।

মণিপুরীরা চিরদিনই স্বদেশের চতুর্দ্দিকস্থ নানা জাতির সহিত নানা ব্যবসায় চালাইত। বঙ্গে যখন মুসলমান প্রভুত্বের তিরোভাব ও ইংরাজাধিপত্যের সূত্রপাত, তৎকালে তাহারা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকার্য্যে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিল। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কাছাড় শিলচর, ঢাকা প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চলে পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসায়-বিস্তৃতি হইল। কোন কোন স্থলে দলে দলে এত মণিপুরীর সমাগম যুগপৎ

ঘটিল ও এত দীর্ঘকাল তাহারা স্থায়ী ব্যবসায়ীরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল যে, সেই সেই জনপদে তাহাদের রীতিমত উপনিবেশ বসিয়া গেল। সে সময় পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে বহু স্থানে মণিপুরীরা বিখ্যাত ব্যবসাদাররূপে গণ্য হইয়াছিল। অদ্যাপিও অনেক স্থানে মণিপুরী পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু তাহারা সেই সেই স্থলের অধিবাসীগণের সহিত ব্যবসায় সম্বন্ধ ভিন্ন রাজকীয় বিষয়ের কোন সংস্রবেই থাকিত না। তবে তাহাদের স্বদেশে তাহারা সেরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে কেবলই শান্তিময় সুখের জীবন কাটাইতে পারিত না। অথবা চতুস্পার্শ্বস্থ নাগা, কুকি, লুসাই, চাষাদ, শান ও ব্রহ্মবাসীরা মণিপুরীদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিত না। উহারা সর্ব্বদাই মণিপুরের কোন না কোন অংশে লুট-পাটাদি নানা উপদ্রব করিত। কখন বা প্রকাশ্য ভাবে সসৈন্যে আসিয়া রীতিমত আক্রমণকারী হইত। কাজেই মণিপুরের রাজা, প্রজা, সৈনিক, সকলকেই অনবরত যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত থাকিতে ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। কখন বা বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশে বিপক্ষের দেশাক্রমণ করা আবশ্যক হইয়া উঠিত। স্বভাবতঃ যুদ্ধ বিগ্রহে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, তদনুসারে এই সকল সংগ্রামের জয় পরাজয়ে মণিপুর কখন সম্বর্দ্ধিত, কখন বা খর্ব্ব হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বাধীনতা ও বিজয় গৌরব যাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ও ইষ্টদেব তুল্য আরাধ্য বস্তু, তাহাদের নিস্তেজ অবস্থা ও নিষ্প্রভতা ক্ষণিক বৈ কখনই প্রায় স্থায়ী হয় না। সুতরাং মণিপুর অনতিব্যাপক কাল মধ্যেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।

মণিপুরের নানা স্থানে এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় এবং তাহার পূর্ব্বতন প্রভাবের বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীর মত যদিও এই মহীয়সী ক্ষুদ্র রাজ্যের ধারাবহিক রীতিমত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না, তথাপি রাজসংসারের কাগজ পত্র ও অনেক হস্তলিখিত বিবরণ পুস্তকাদি হইতে বিগত পাঁচ সাত শত বৎসরের অনেক ঘটনাদি সংগৃহীত হইয়া এক খানি বৃহৎ পুস্তক লিখিত হইতে পারে। তদপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য বৃত্তান্ত-লিপি আর কি? কিন্তু সেই অতীতের আলোচনা বৈরক্তি ভিন্ন পাঠকের তৃপ্তি জন্মাইতে পারিবে না এবং তত্তাবৎকে ভাষান্তরিত করা সুদুষ্কর; বিশেষতঃ যেরূপ ত্বরাতে এই পুস্তক লেখা হইল, তাহাতে সে কার্য্য সম্ভবপরও নহে। অতএব আমরা একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ করিব; তাহাও প্রয়োজন মত কিছু কিছু মাত্র বলিয়া, আধুনিক ঘটনাবলীতেই অধিক মনোযোগী হইব।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী।

শান প্রদেশে পঙ্গ তখন একটি স্বাধীন রাজ্য এবং মোগয়ঙ্গ নামে নগর তাহার রাজধানী ছিল। পঙ্গের রাজা কম্বার সহিত মণিপুর-রাজের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কম্বা তাঁহাকে বহুবিধ উপহার প্রদান করিতেন। কথিত আছে, মণিপুরের রাজকীয় চিহ্নাবলীর মধ্যে অনেকগুলি, কম্বা হইতে প্রাপ্ত বা তাঁহার অনুকরণে প্রস্তুত।

কিন্তু পক্ষান্তরে, মণিপুর এ সময়ে কুকি, লুসাই প্রভৃতির সহিত (পূর্ব্বকার মত) বিবাদে প্রবৃত্ত। যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিতে-

ছিল। বিশেষতঃ নাগারা বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছিল। এবং অপর দিকে ব্রহ্মরাজ মণিপুর রাজ্যটিকে স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার প্রয়াসে সতত আক্রমণ ও নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাজেই মণিপুর অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুযোগ পাইয়া নাগারা প্রগল্ভ হইয়া দিন দিন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। মণিপুরাধিপতি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ বেগ সম্বরণে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নাগাসর্দ্দার পামহেবা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র রাজ্য অধিকার এবং মণিপুরের সিংহাসনেও আরোহণ পূর্ব্বক রাজ্যাধিশ্বর হইয়া উঠিলেন। পামহেবা অসভ্য নাগজাতীয় হইলেও, সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি রাজা হইবার পরেই হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং "গরিব নেওয়াজ" উপাধি ধারণ করিলেন। "গরিব নেওয়াজ" বাক্যটি পারস্য-ভাষাজাত, তাহার অর্থ "দরিদ্রের আশ্রয়"। যদিও মণিপুর ও নাগাদের প্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হয় নাই তথাপি মুসলমানী প্রভাব ও পারস্য ভাষার বিস্তার যে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

মণিপুরীদের সহিত ব্রহ্মবাসীদের পূর্ব্ব হইতেই বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। এখন গরিব নেওয়াজ রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে, তাহা থামিল না; বরং দ্বিগুণ তেজে বাড়িয়া উঠিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বিস্তর যুদ্ধ হইল; তাহাতে একবার বা মণিপুরীরা, বারান্তরে বা ব্রহ্ম-বাসীরা বিজয়ী হইতে লাগিল। ক্রমে গরিব নেওয়াজ প্রভূত বল সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মবাসীদিগকে তাহাদের নিজ দেশে গিয়াই আক্রমণ করিলেন এবং জয়লাভের ফল স্বরূপ সে রাজ্যের কিয়দংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু অচিরাৎ ব্রহ্মবাসীরা প্রবল হইয়া, মণিপুরী-দিগকে তাড়াইয়া দিল। গরিব নেওয়াজ পুনরায় যুদ্ধ সজ্জায় গিয়া,

ব্রহ্মবাসীদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং পুনরায় ব্রহ্মের কিয়দংশ অধিকার পূর্ব্বক মণিপুর রাজ্য বিস্তৃত করিলেন। ব্রহ্মবাসীরাও সে লোক নহে যে, মণিপুরের বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাহারা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া, মণিপুরের শৃঙ্খল হইতে স্বদেশকে মুক্ত করিল। পরাক্রমী গরীব নেওয়াজ এইরূপে বারম্বার ব্রহ্ম আক্রমণ ও তাহার কোন না কোন অংশ স্বাধিকারভুক্ত করিলেও তিলমাত্র ভূমি স্থায়ীরূপে রাখিতে পারেন নাই—কেবলই মারামারি কাটাকাটি সার হইয়াছিল।

১৭৬২ সাল। এখন মহারাজা জয়সিংহ মণিপুরের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ়। রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ব্রহ্মবাসীরা সেই পুরাতন মনান্তর ভুলে নাই। তাহাদের সহিত মণিপুরের বিবাদ পূর্ব্বের মত—কখন বেশী, কখন অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে চলিতেছে। আপাততঃ তাহারা মহা আড়ম্বরে মণিপুর আক্রমণের উদ্যোগ ঠিকঠাক করিয়া, তাহার সূচনা মাত্র তুলিয়াছে। মহারাজা জয়সিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ব্রহ্মবাসীরা, মণিপুরীদিগকে বারম্বার উত্যক্ত ও জ্বালাতন করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাদের বর্ত্তমান সমরায়োজন যেরূপ হউক, ব্যর্থ করিতেই হইবে। অধিকন্তু সংকল্প এই যে, চিরশত্রু ব্রহ্মবাসীদিগকে এমন কঠোর রূপে বিপর্য্যস্ত ও বিদলিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা আর সহজে শিরোত্তলন করিতে না পারে। অর্থাৎ এবার এমন গুরুতর শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে আর কখনও মণিপুর আক্রমণ, কার্য্যতঃ দূরে থাকুক, মনেও যেন কল্পনা করিতে সাহসী না হয়। যদিও জয়সিংহ ব্রহ্মবাসীদের হস্ত হইতে (তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণের ন্যায়) মণিপুরকে কোনমতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য সামন্ত ও ধনবল এত অধিক ছিল না যে, প্রবলতর সাহায্য ব্যতীত তিনি একাকী পরাক্রান্ত ব্রহ্মভূপতি

স্পর্দ্ধার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হন। সুতরাং তিনি কাহার আনুকূল্যে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন, উৎকণ্ঠিত ও উদ্গ্রীব ভাবে তাহাই চতুর্দ্দিগে দেখিতে লাগিলেন।

সে পক্ষে সুবিধাও হঠাৎ ঘটিয়া উঠিল। ইংরাজের তাৎকালিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার কতক বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। মণিপুরী ব্যবসায়ীরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া স্বদেশে ব্যক্ত করিত। এই উপায়ে ও অন্যান্য নানা সূত্রে মহারাজ জয়সিংহ তাহা জ্ঞাত হইয়া আসিতেছিলেন। আপাততঃ তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলেন যে, ব্রহ্মরাজের সহিত সেই প্রবল ইংরাজ কোম্পানির ভয়ানক শত্রুতা হইয়াছে। এই সংবাদে তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। ফলতঃ কথাটি সত্য—ব্রহ্মবাসীরা যথার্থই কোম্পানির কোপে পড়িয়াছিল। খৃঃ ১৭৫০ অব্দ বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম-রাজ্যাধীন নেগ্রেইস নামা দ্বীপে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতেছিলেন। যে বৎসর পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হন, ঠিক সেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজকে নানামতে পরিতুষ্ট করিয়া ঐ দ্বীপে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়া ইংরাজ মহা আহ্লাদিত হইলেন। বঙ্গদেশ হইতে ইটের কারীকর, সূত্রধর, রাজমজুরাদি লইয়া গিয়া তথায় রীতিমত কুঠিবাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইলেন।

কিন্তু সেই রাজানুগ্রহ ও আনন্দ অল্পস্থায়ী হইল—হরিষে বিষাদ ঘটিল। স্থানীয় ব্রহ্মবাসীরা সহসা অভ্যুত্থিত হইয়া স্বয়ং অধ্যক্ষ ও তৎসহকারী চল্লিশ জন ইংরাজ এবং যে সকল বাঙ্গালী কোম্পানির কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের কতকগুলিকেও হত্যা করিয়া কুঠির সমস্ত সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইল। অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় কারণ ছিল—অবশ্যই ইংরাজকর্ত্তৃক এমন অপরাধ কিছু হইয়া থাকিবে, যাহাতে অধিবাসীরা বিজাতীয় ক্রোধে উন্মত্ত হইতে পারে।

কিন্তু ইহা কেবল আমাদের অনুমানের কথা, সঠিক তত্ত্ব যাঁহাদের নিকট জ্ঞাত হইব, সেই ইংরাজ-লেখকেরা তৎসম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

সে যাহাই হউক, এই ব্যাপার লইয়া ইংরাজ মণ্ডলে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। ব্রহ্মদেশীয়দিগকে কি প্রকারে সমুচিত প্রতিফল দিবেন এবং প্রতিশোধ লইবেন, তাহারি চিন্তায় তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু বাষ্প-জলযান তখন জন্মে নাই এবং ইংরাজের সৈন্যবল তখন এত প্রবল নয় যে, অবিলম্বে ঘটনাস্থলে সৈন্য পাঠাইয়া (এখনকার মত) দণ্ড বিধান করেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মাধিপতির তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—থিবরাজের দশা দেখিয়া পাঠক যেন তাৎকালিক ব্রহ্মের ভাব অনুভব না করেন। সুতরাং তদ্রূপ মহৈশ্বর্য্যবীর্য্যশালী রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধে সহসা সামুদ্রিক যুদ্ধ যাত্রা, কোম্পানির তৎকালের অবস্থায় বড় সহজ কথা ছিল না। তাহার আয়োজন কত বৃহৎ এবং ব্যয়ই বা কত প্রচুর, তাহা অবশ্যই বণিকসংঘের বিশেষ ভাবনার বিষয়। বিলাতে তাঁহাদের নিয়োগকর্ত্তা অধ্যক্ষ-সভার আদেশ ভিন্ন, তাঁহারা কি অত বিপুল ব্যয়সাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য মহানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? বিলাতের কোর্ট অভ্ ডিরেক্টর সভার নিকট রিপোর্ট যাইতে এবং তাঁহাদের মতামত ও অনুজ্ঞাদি আসিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। এখনকার মত তখন তিন সপ্তাহ নয়, তিন মাসের অধিক কালেও সমুদ্রপোত গিয়া পৌঁছিত।

যাহাই হউক, এইরূপ লেখালিখি চালনাতে আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইংরাজ নানা লক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ হত্যাকাণ্ড রাজার অনভিমতে ঘটে নাই। ঐ

সার্দ্ধদ্বয় বর্ষমধ্যে সে রাজাও পরলোক গত হইলেন। সে সংবাদে এক প্রকার সন্তোষ হইয়া ডিরেক্টর সভা অত্রত্য ইংরাজাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে নেগ্রেইস দ্বীপ হইতে অবশিষ্ট লোক জন ও অবশিষ্ট দ্রব্যাদ্দি উঠাইয়া আনিবার যুক্তি ভালই হইয়াছে। ব্রহ্মযুবরাজ, যিনি এখন রাজাসনে আসীন, শুনিয়াছি, তিনি অপেক্ষাকৃত সৎস্বভাবের লোক, অতএব—ইত্যাদি।" সেই পত্র মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের দোষেই যে ব্রহ্মরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সেরূপ ভয়ানক কাণ্ড করিয়াছিলেন, তদাভাসও স্পষ্ট ছিল।

সে যাহা হউক, ঐ ভীষণ হত্যাব্যাপার লইয়া ইংরাজের ব্রহ্মে যে ঘোর বৈরিতা জন্মিয়াছে এবং ইংরাজ জাতক্রোধ হইয়া প্রতিশোধ জন্য যে লোলুপ, সে সংবাদ মণিপুরাধিপতি জয়সিংহের সম্পূর্ণ সুগোচর হইল। ব্রহ্মরাজের মৃত্যুতে জয়সিংহ উৎসাহিত হইয়া, নবোদ্যম নিমিত্ত, উভয়ের পরম শত্রু ব্রহ্মরাজবিরুদ্ধে ইংরাজ কোম্পানি তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত কি না, জানিয়া পাঠাইলেন। অত্যত্র বোর্ড ভাবিলেন, অত দূরবর্ত্তী স্থানে, এসময় ইউরোপীয় সৈন্য পাঠান, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। কিন্তু এমন চমৎকার সুবিধা ছাড়াও কোনমতে উচিত নহে। মণিপুর রাজ্যের রাজার সহিত আমাদের বন্ধুতা হইলে, ব্রহ্মবাসীরা আমাদের সহিত নেগ্রইস দ্বীপে যে বারম্বার কুব্যবহার করিয়াছ, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য, আমরা ব্রহ্মে যাইবার পথও যথেষ্ট সুবিধা পাইব।" তদনুসারে চট্টগ্রাম হইতে মণিপুরে ৬ দল সিপাহী পাঠান হইল। নানা পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উপরের বর্ণনা পাঠে পাঠক মহাশয়ও ভাবিতে পারেন যে, মহারাজ জয় সিংহের সাহায্যের জন্যই, কোম্পানি এই সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই ভুল। চতুর

ইংরাজ তাহা আদৌ মনেও কল্পনা করেন নাই। সিপাহী-সেনানায়কের প্রতি স্পষ্ট আদেশই ছিল যে, "ব্রহ্মবাসীদের ভাব, ভঙ্গী, অভিপ্রায়াদি কিরূপ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও সৈন্যবলাদি কি প্রকার তাহা জানিবে; কিন্তু তাহাদের সহিত সহসা বৈরিতাচরণ করিবে না।"

সুতরাং কোম্পানির সিপাহীসৈন্য মণিপুরে গেল বটে, কিন্তু তন্নৃপতির কোনই সাহায্য না করিয়া, কেবল ভড়ং দেখাইয়া ও দেশের অবস্থাদি দেখিয়া শুনিয়া এবং ব্রহ্মরাজ্যের তথ্যাদি যথাসম্ভব জানিয়াই তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইল। ইংরাজ সেনানায়ক মণিপুর-সম্বন্ধে কি বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই টুকু পর্য্যন্তই সে রাজ্যের সহিত প্রথম সম্বন্ধ ও আলাপ পরিচয় ঘটিয়াছিল। তবে এই হইতে ভবিষ্যৎ সংস্রবের সূত্রপাত হইল এবং তদবধি কোম্পানির কর্ম্মচারীবর্গ মধ্যে মধ্যে ব্যবসায় উপলক্ষে মণিপুরে যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু মণিপুরের সহিত ইংরাজের প্রকৃত রাজকীয় সংস্রব, পরবর্ত্তী ৬০ বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

গম্ভীর সিংহ হইতে, চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত।

আমাদের মহারাণীর রাজত্বারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই গম্ভীর সিংহ মণিপুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের মহারাণীকে তখন ইংরাজ কোম্পানি প্রকৃতই ভারতেশ্বরী করিয়া তুলিয়াছেন।

তখন কোম্পানির প্রতিনিধি কর্ম্মচারীরাই "এদেশে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট" এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনি যাবতীয় ইংরাজাধিকারের "গভর্ণর জেনারল" নামে অভিহিত হইয়াছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তখন আর "সুবা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার হর্ত্তাকর্ত্তা নাই এবং পূর্ব্ববঙ্গ, বা আসাম প্রভৃতি কোন স্থানেই তখন আর এমন কোন স্বাধীন জাতি বা নরপতি নাই, যাহারা ইংরাজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে।

মহারাজ জয়সিংহের সময় হইতে, মণিপুরে ইংরাজদের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। সে বাণিজ্য সংস্রব, অল্প বিস্তর যাহাই হউক, কিন্তু অবাধে চলিতেছে, কখনই এককালে রহিত হয় নাই। মহারাজা গম্ভীর সিংহ সিংহাসনে বসিয়া অবধি ইংরাজকে বড় ভাল বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি ইংরাজের যথাসাধ্য উপকার সাধনেও বিরত হইতেন না। ইংরাজ গবর্ণমেন্টও তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। সুতরাং পরস্পরের মিত্রতা, বিশ্বাস ও সদ্ভাবও যথেষ্ট হইয়াছিল। এমন সময়, (খৃঃ ১৮২৪ অব্দে) নানা কারণে, ব্রহ্মবাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। ফলতঃ ব্রহ্মবাসীদের প্রতি বিদ্বেষবহ্নি বহুদিন হইতে ইংরাজ-হৃদয়ে প্রধূমিত হইতেছিল, এখন সামান্য উপলক্ষে একবারে জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মবাসীরা ইংরাজাধিকৃত কাছাড় ও আসাম আক্রমণ করিল। মণিপুরের প্রতি তাহাদের চির শত্রুতা, বিশেষতঃ এখন মণিপুরের সহিত ইংরাজের মিত্রতা হওয়াতে সেই শত্রুতা আরও বর্দ্ধিত হইল। অতএব, ইংরাজ-রাজ্যাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম-চমূ মণিপুর রাজ্যাভিমুখেও অগ্রসর হইল।

মণিপুররাজ গম্ভীরসিংহ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ের দিকে কতকগুলি সিপাহী সৈন্য ও কয়েকটা কামানাদি পাঠাইলেন এবং মণিপুরী সৈন্যদের পরিচালন করিবার জন্য গম্ভীর সিংহের অধীনে কতকগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারী দিলেন। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের কর্তৃত্বাধীনে, নূতন কয়েকটি মণিপুরী সৈন্যদলও সংগঠিত হইল।

এই সমস্তের সমবেত সাহায্যে ব্রহ্মসেনা মণিপুর উপত্যকা হইতে বিতাড়িত হইল। অধিকন্তু মণিপুর রাজ্যের পুরাতন সীমার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ শানজাতীয় লোকের আবাসভূমি, কুবো উপত্যকা (নিংথি নদী পর্য্যন্ত), গম্ভীর সিংহের অধিকারভুক্ত হইল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্ম-সমর শেষ হইল। ব্রহ্মাধিপের সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল, তাহা য়্যাণ্ডাবু-সন্ধি নামে অভিহিত। ইংরাজের সহিত মণিপুরের মিত্রতার জন্য ব্রহ্মাধিপ যে গম্ভীর সিংহের প্রতি অধিকতর জাতক্রোধ ও বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য তাঁহারা উক্ত সন্ধির দুই দফায় সর্ত্ত করিয়া লইলেন যে, ব্রহ্মরাজ, মণিপুরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং তদ্বিরুদ্ধে কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে পারিবেন না। ইংরাজ, স্বীয় অনুগত বন্ধু গম্ভীর সিংহের কৃত উপকারের বিনিময়ে কেবল এইরূপ কৃতজ্ঞতা মাত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা কাছাড় হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তাও করিয়া দিলেন। ইহাতে মণিপুরের সামান্য উপকার হয় নাই। এতদিন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ও মণিপুরাধিপতির মধ্যে কোন লিখিত সন্ধি ছিল না। অধুনা, ১৮৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে উপর্য্যুপরি দুইটি সন্ধি হইল। (দলীল দেখুন) প্রথম সন্ধি, বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে, দ্বিতীয়টি কুবো উপত্যকার ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে। তাহার বিবরণ এই ;—

মণিপুরী সৈন্য ।

১০ পৃষ্ঠা ।

ব্রহ্মরাজ কুবো উপত্যকায় বঞ্চিত হওনাবধি বারম্বার প্রতিবাদ ও প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশেষে ইংরাজ তাহা প্রত্যর্পণ করাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। কিন্তু তাহা তখন গম্ভীর সিংহের মণিপুর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। গম্ভীর সিংহ সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, তৎক্ষতি পূরণ স্বরূপ তাঁহাকে বার্ষিক প্রায় ৬৫০০৲ টাকা নগদ দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন। এইরূপে এক জনকে দেশ ফিরাইয়া দিয়া ও অপরকে বার্ষিক বৃত্তি দিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উভয়কেই সন্তুষ্ট করিলেন।

রাজা নরসিংহ, মহারাজা গম্ভীর সিংহের ভ্রাতা সম্পর্কীয় ছিলেন। ইনি রণপণ্ডিত, সাহসী, বীর এবং গম্ভীর সিংহের অতিশয় বিশ্বস্ত ও প্রিয় ছিলেন। মহারাজা তাঁহাকে সেনাপতিত্বপদে বরণ ও তাঁহার প্রতিই রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করেন। গম্ভীর সিংহের বুদ্ধি কৌশলে ও নরসিংহের সমরনৈপুণ্যে, মণিপুর রাজ্যের প্রতি-কূলে কেহই তখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

গম্ভীর সিংহ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি এতাবৎ কাল পুত্রলাভে বঞ্চিত ছিলেন। তৎপ্রতিবিধান উদ্দেশ্যে তিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। পরিশেষে, তাঁহার জীবনের শেষ দশায়, প্রথমা রাণী গর্ভবতী হইলেন। যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তান জন্মিল, তদুপলক্ষে মণিপুর রাজ্য-মধ্যে বহুদিন ধরিয়া দান, ধ্যান, দেবার্চ্চনা, নৃত্য, গীত, আমোদ, প্রমোদাদি বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও আনন্দোৎসব চলিল। মহারাজা পুত্রের নাম রাখিলেন, চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ।

পট্টমহিষির গর্ভ-প্রকাশের পরই, গম্ভীরসিংহ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন যে, যদি তাঁহার পুত্রসন্তান হয়, তবে তিনিই রাজ্যেশ্বর হইবেন।

তিনি প্রথমা রাণীকেও এই কথা বলিয়া উল্লাসিত করিয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তির এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে, গম্ভীর সিংহ সাংঘাতিক রোগ-গ্রস্ত হইলেন। মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে প্রিয় সেনাপতি নরসিংহকে ডাকা-ইয়া ও বর্ষৈক বয়স্ক কুমার চন্দ্রকীর্ত্তিকে আনাইয়া, নরসিংহের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন "আমার চন্দ্রকীর্ত্তি যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততকাল তুমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ তো করিবেই, তদু-পরি কুমারের লালন, পালন, সৎশিক্ষাদি, তাবদ্ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ততদিন পর্য্যন্ত স্বীয় সেনাপতিত্ব ব্যতীত সমগ্র রাজ্যের উপর আমি তোমাকে যে কর্তৃত্ব ভার দিয়া যাইতেছি, তাহা ধর্ম্মতঃ ও যত্নতঃ পালন করিবে। পরে যথাকালে কুমার বয়ঃ-প্রাপ্ত ও সুযোগ্য হইলে তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে তাহার অনুবল সহায় হইয়া থাকিবে। ইত্যাদি।" মহারাজা বিশেষ নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নরসিংহকে এই সকল বাক্যে প্রতিশ্রুত করা-ইয়া লইলেন। তদনুসারে, খৃঃ ১৮৩৪ অব্দের শেষভাগে গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর পরে, বালক রাজার অছি স্বরূপ, নরসিংহ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। একবৎসর যাইতে না যাইতেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, মণিপুরে একজন নিজ প্রতিনিধি (পালিটিকেল এজেণ্ট) রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। সে পক্ষে, কেহই বিরুদ্ধবাদী হইল না, রেসিডেন্সী স্থাপিত হইল। সেই হইতে আ'জ্ পর্য্যন্ত একজন ইংরাজ-রাজপুরুষ মণিপুরে পলিটিকেল এজেণ্টরূপে বিরাজ মান। আসাম বিভাগের সুখ্যাতি-প্রাপ্ত কোন সুযোগ্য ডেপুটি কমিশনরকে, কখন বা কোন সৈনিক কর্ম্মচারী ইংরাজকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। এই রেসিডেন্সী হইতেই, ভারতের অন্যান্য বহু মিত্ররাজ্যের ন্যায়, মণিপুরেও অপ্রার্থনীয় ফল ফলিয়াছে।

নরসিংহ অধার্ম্মিক লোক ছিলেন না। তিনি ভূতপূর্ব্ব মহারাজের আজ্ঞা ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা স্মরণ পূর্ব্বক যথোচিত-রূপে ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন করিতেন। গম্ভীর সিংহের রাজত্ব কালে মণিপুরে প্রায়ই শান্তিসুখে প্রজারা সুখী ছিল এবং নানা মতে তাহাদের অবস্থাও সবিশেষ উন্নত হইয়াছিল। নরসিংহের কর্ত্তৃত্বেও সে সমস্ত অটুট রহিল। সুতরাং প্রজামণ্ডলী সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়া আহ্লাদ সহকারে নরসিংহের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার ও চন্দ্রকীর্ত্তির মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

কিন্তু খলদলপূর্ণা পৃথিবীতে এমন সৌভাগ্য কাহারও হয় না যে, তাঁহার সহস্র সদ্‌গুণ সত্ত্বেও কেহই তাঁহার শত্রু হইবে না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জ নরসিংহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলেও তাঁহার নিজ গৃহমধ্যেই শত্রু জুটিল। তাঁহার পাপিষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্র সিংহ, স্বীয় হিংসারিপুর প্রাবল্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে প্রীতি, ভক্তি বা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে নরসিংহই রাজা হইয়াছেন, লোকে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছে, তাঁহার সুযশ, সদ্‌গুণ, চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, ইহা দেবেন্দ্রের অসহ্য হইল। সে নরসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে তৎপদাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা করিল। শুদ্ধ তাহাই নয়, যাহাতে সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎকণ্টক-রূপী চন্দ্রকীর্ত্তিও বিনষ্ট হন, অহর্নিশি কেবল তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

নবীন সিংহ নামক একজন মণিপুরী, দেবেন্দ্রের প্রিয় সহচর ও অনুগত ব্যক্তি ছিল। মহারাজা গম্ভীর সিংহের মৃত্যু এবং নরসিংহের রাজপ্রতিনিধিত্ব পদে অভিষিক্ত হইবার পর হইতেই ঐ দুজনের মধ্যে ঐরূপ ভয়ানক কুপরামর্শ চলিতেছিল। কিন্তু সাধারণ লোক, নরসিংহের সুশাসনে যেরূপ সন্তুষ্ট ও তাঁহার এবং নাবালক রাজা

চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে সেই দুরভিসন্ধি এতদিন কার্য্যে পরিণত করিবার কোন সুযোগ ও সুবিধা পাইতে পারে নাই। পরিশেষে কতিপয় কুলোকের সাহায্যে রাণীর অন্তঃকরণে এমন একটি সন্দেহ দৃঢ়রূপে জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইল যে, নরসিংহ অচিরে চন্দ্রকীর্ত্তিকে দেশান্তরিত বা প্রাণে বিনষ্ট করিয়া নিজে সিংহাসনারোহণের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ গোপনে গোপনে করিতেছেন। এই ধারণার বশে, রাণী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, নরসিংহের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের অনুমোদন ও সাহায্যকারিণীও হইলেন।

দুশ্চরিত্র দেবেন্দ্রের পাপাত্মা অনুচর এমন কপট কৌশল করিল যে, যদি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, তবে দেবেন্দ্র বা সে নিজে যে ইহাতে লিপ্ত আছে, তাহা কেহই বিশেষতঃ নরসিংহ কিছুই জানিতে পারিবেন না; আর সফল হইলে চন্দ্রকীর্ত্তিকে কিছু দিনের জন্য নাম মাত্র সিংহাসনে বসাইয়া রাণীকে অছি এবং দেবেন্দ্রকে প্রধান মন্ত্রী করিবে। কিন্তু প্রকৃত গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, নরসিংহকে বিনষ্ট করিতে পারিলে রাণীকে অপসারিত করিতে ও চন্দ্রকীর্ত্তিকে শমন ভবন পাঠাইতে কতক্ষণ? তখন অনায়াসেই অথবা আর জনকতক নির্ব্বোধ রাজভক্তকে বধ করিলেই, দেবেন্দ্রের পক্ষে সিংহাসনের পথ সম্পূর্ণই মুক্ত হইতে পারিবে।

শত্রু বিনাশার্থই এবং পুত্রের রাজত্ব প্রাপ্তি নির্ব্বিঘ্ন করণার্থই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ও ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রকৃত মিত্র নরসিংহের অত্যহিতসম্বন্ধীয় ষড়যন্ত্রে নির্ব্বোধ রাণী লিপ্তা হইয়াছিলেন। তিনি কপট দেবেন্দ্রের ছল কৌশল কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন নাই। নরসিংহের নির্ম্মল ও সরল কার্য্য কলাপকে যেরূপ পাপময় জঘন্য রূপে তাঁহার নিকট চিত্রিত করিয়া আসিতেছিল, প্রবল অপত্যস্নেহে, পুত্রের

প্রাণাশঙ্কায় অথবা পুত্রের ভাবী দুঃখের ভাবনায়, তিনি এককালে বিচার-শক্তি-বর্জিতা হইয়া পরম শত্রুকেই পরম মিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। নচেৎ স্বর্গগত স্বামীর চির-বিশ্বাস-পাত্র অমন ধার্ম্মিক অমাত্যের সংহার কার্য্যে কখনই তিনি যোগ দিতেন না।

কিন্তু পাপ কথা ছাপা রহিল না—অবিলম্বেই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নরসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল। চন্দ্রকীর্ত্তিকে লইয়া রাণী মহা বিপদেই পড়িলেন। চন্দ্রকীর্ত্তির প্রাণের আশঙ্কা তাঁহাকে কাতর করিল। চন্দ্রকীর্ত্তির বয়ঃক্রম তখন প্রায় ১৩ বৎসর। তিনি মাতাকে পলায়নের পরামর্শ দিলেন। কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে, তাঁহারা উভয়ে, প্রাণভয়ে গভীর নিশীথে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ-রাজ্য কাছাড়ে প্রস্থান করিলেন। এবং তথায় কোন মতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

ইহার পরেই নরসিংহ স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া, তদনুরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। ধূর্ত্ত নবীনের চমৎকার কৌশলে, নরসিংহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক স্বীয় সহোদর দেবেন্দ্র এবং প্রধান সহকারী মন্ত্রী নবীন। অতএব দেবেন্দ্র প্রিয় সহচর নবীনের সঙ্গে নিরাপদে মণিপুরে বাস করিতে লাগিল।

এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল, সুতরাং নরসিংহ জীবিত রহিলেন এবং সুধুই জীবিত নন, রাজা হইলেন; ইহাতে দেবেন্দ্রের দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু প্রধান কণ্টক চন্দ্রকীর্ত্তি দেশান্তরিত হওয়াতে তাঁহার মনে আহ্লাদও হইল। হায়! রাজ্যলিপ্সা, ঐশ্বর্য্য-লালসা কি ভয়ানক ঘৃণ্য প্রবৃত্তি! এখন কিসে নরসিংহকে গুপ্ত হত্যা দ্বারা লোকান্তর প্রেরণ সংঘটিত হয়, কেবল সেই চিন্তা ও সেই পরামর্শে দেবেন্দ্র ও নবীনের মস্তিষ্ক অহরহঃ নিযুক্ত হইল। নানারূপ চিন্তা করিয়া

নবীন এক দিন প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে স্বহস্তে নরসিংহের মুণ্ড ছেদন করিয়া স্বীয় প্রাণাধিক দেবেন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিবেই করিবে।

রাজা নরসিংহ পরম বৈষ্ণব। তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্মালোচনা ও দেবমন্দিরে গিয়া ঈশ্বর-আরাধনা করিতেন। তিনি অতি অমায়িক স্বভাব ও নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিশেষতঃ রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছিল—প্রজারাও তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট ও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। দেবেন্দ্র ও নবীন যে তাঁহার প্রতি মনোমধ্যে সাংঘাতিক বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করিতেছিল, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অধিকন্তু তিনি কোনরূপ অনাবশ্যক আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না; সুতরাং দেবমন্দিরে গতায়াত কালে রক্ষক বা সহচরাদি প্রায়ই সঙ্গে লইতেন না।

একদিন তিনি দেবমন্দিরে একাকী বসিয়া, গাঢ় ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, ইত্যবসরে নবীন একখানি সুশাণিত তরবারি হস্তে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি যেমন নত হইয়া প্রলম্ব ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে যাইবেন, নবীন অমনি তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার গলদেশ লক্ষ্য করিয়া সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কণ্ঠদেশে আঘাত লাগিবার পূর্ব্বেই, নরসিংহ যেন অসিতাড়িত বায়ু শব্দেই চকিত হইয়া নিমেষের মধ্যেই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কটাক্ষে বিপদাবস্থা অনুভব করিয়া আঘাত নিবারণার্থ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। জীবন রক্ষা হইল, কিন্তু সেই ভীষণ আঘাতেই তাহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়া সেই পবিত্র মন্দির মধ্যে বিগ্রহদেব সমক্ষে ভূতলে পতিত হইল। নবীন পলাইল। নরসিংহ রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্র সুযোগ পাইয়া বিপ্লব-ডঙ্কা বাজাইয়া, বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিল।

অল্প দিনের মধ্যেই (১৮৫০ খৃষ্টাব্দে) নরসিংহ পরলোকগত হইলেন এবং পাষণ্ড দেবেন্দ্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করিল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিবার লোক মণিপুর রাজ্যের মধ্যে আর কেহই ছিল না। প্রজারা অগত্যা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু ভাল লোক মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। অধিকন্তু রাজপাটে বসিয়াই দেবেন্দ্র যেরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, তাহাতে সাধারণে তাহার প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইল—কেবল অনন্য উপায় হইয়াই, মনের ক্লেশ নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

এদিকে চন্দ্রকীর্ত্তি স্বীয় জননীর সহিত কাছাড়ে বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় ১৯ বৎসর হইয়াছে। বিগত ৬ বৎসর কাল, তাঁহার মাতা ও তিনি, বারম্বার ইংরাজরাজপুরুষদিগকে তাঁহার স্বপক্ষে দয়া-পরবশ করিয়া তুলিতে বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ইংরাজ-মিত্র গম্ভীর সিংহের একমাত্র পুত্র—মণিপুর সিংহাসনের ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ইত্যাদি উল্লেখে এবং নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া সহস্র অনুনয় বিনয় করিয়া, নিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ গভর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত বিবিধ পদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট বারম্বার দরখাস্ত দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। তিনি এতদিন নিরুপায় ভাবিয়া, কেবল ইংরাজের মুখ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এখন নরসিংহের মৃত্যুতে যথোচিতরূপে উৎসাহিত এবং নব-সঞ্চারিত আশায় উত্তেজিত হইয়া সদ্‌বুদ্ধির ন্যায় ইংরাজ-দ্বারে বিফল ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনে কাল হরণ আর অকর্ত্তব্য, ইহা বুঝিলেন।

নিতান্ত ধন-জন-সহায়-সম্পত্তিহীন—ইহাই তাঁহার তখনকার অবস্থা। সে অবস্থায়, সুবোধ সাহসী রাজপুঙ্গবের যাহা করণীয়, তাহাই

তিনি করিলেন। অর্থাৎ স্বীয় পিতৃদেব যাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন, সেই প্রজাগণের তাঁহার প্রতি মনের ভাব কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্ত তিনি অকুতোভয়ে সহসা মণিপুর রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 'সাহসে ভজতে লক্ষ্মী' এই প্রবাদবাক্য সার্থক হইল। মণিপুরী প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া, তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল—প্রকৃত রাজাকে পাইয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না—বহুলোকে তাঁহাকে নানাবিধ উপঢৌকন দিতে লাগিল এবং অবিলম্বেই কয়েকটি সশস্ত্র সৈন্যদল সংগৃহীত হইল। চন্দ্রকীর্ত্তি আর কালক্ষেপ না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজধানী ইম্ফালি আক্রমণ করিলেন। দেবেন্দ্র সিংহের অন্নদাস-সৈন্যের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। এক পক্ষে পরস্বাপ-হারী অত্যাচারী রাজার হইয়া শৈথিল্যময় যোদ্ধা, অপর পক্ষে সদ্-গুণান্বিত সদাচারী প্রকৃত রাজপুত্রের জন্য আগ্রহান্বিত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকগণ; সুতরাং শেষোক্তের জয় অবশ্যম্ভাবী। হইলও তাই—দুরাত্মা দেবেন্দ্র সম্পূর্ণ ই পরাজিত হইল। তিন মাসের মধ্যেই স্বীয় রাজত্ব-লীলা সাঙ্গ করিয়া চন্দ্রকীর্ত্তির পরিত্যক্ত ইংরাজাধিকৃত সেই কাছাড়ে পলাইয়া আসিল।

এইরূপে চন্দ্রকীর্ত্তি স্বীয় বাহুবলে ও বুদ্ধি প্রভাবে মণিপুর সিংহাসন অধিকারে সক্ষম হইয়া, অপ্রতিহত প্রতাপে দুষ্টের দমন ও পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি সেহু সিংহকে সেনাপতি ও ভুবন সিংহকে স্বীয় মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া, মনোযোগের সহিত যাবতীয় রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে, মণিপুরের মধ্যে অনেকগুলি নূতন পথ প্রস্তুত ও পুরাতন রাস্তা মাত্রই রীতিমত সংস্কৃত হইয়াছিল। মুসলমান প্রজাদের সহিত সময়ে সময়ে হিন্দুদের মতান্তর

উপস্থিত হইত এবং তাহাদের সংখ্যার অল্পতা হেতু মুসলমানেরা স্থল বিশেষেও সময় বিশেষে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিত। তাহা নিবারণার্থ তিনি একটি কাজি পদের সৃষ্টি করেন। তদবধি অদ্যাপি মণিপুর রাজ্যের মুসলমান সমাজ সেই কাজিরই অধীন থাকিয়া, জাতীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতানৈক্যাদি, তাঁহারই দ্বারা আপনাদের ধর্ম্মানুসারে মীমাংসা করাইয়া লয়। চন্দ্রকীর্ত্তিরই রাজত্বকালে, মণিপুরে, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, তারের আফিস প্রভৃতি স্থাপিত এবং মণিপুর ও ব্রহ্মাঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী সীমা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

তিনি রাজ্যলাভের পূর্ব্বে নিজে ইংরাজদের কাছে কোন উপকারই পান নাই, তথাপি তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টা সততই করিতেন। ইংরাজের সাহায্যার্থ মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির এই কয়টি কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগভর্ণমেণ্ট মণিপুর-সীমান্তবাসী আঙ্গামী নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের কারণ এস্থলে বিশেষরূপে আমূল বর্ণনা আবশ্যক। পাঠক, নাগা প্রভৃতি বন্যদের প্রকৃতির বর্ণনা হইতেই হেতু উপলব্ধি করিবেন। মণিপুরের তাৎকালিক পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল জনষ্টোনের উপর এই যুদ্ধের ভার অর্পিত হয়। জনষ্টোন সাহেব সৈন্য সামন্ত লইয়া, নাগাদিগের দেশের মধ্যে মহা আস্ফালনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথায় শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে নানাদিকে আক্রমণ করিলেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইংরাজ সেনা জয়লাভ করিয়া, নাগাদের অনেকগুলি গ্রাম জ্বালাইয়া দিল। তখন তাহারা অনেক দল একত্র হইয়া, বিষম তেজে ইংরাজশিবির আক্রমণ করিল। ইংরাজের অনলোদ্গারী কামানের গোলায় এবং সাঙ্গীন-তরবারির আঘাতে, অনেক নাগা ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তথাচ অবশিষ্টেরা ভীত না হইয়া এবং কিছুতেই দৃক্‌পাত না করিয়া

অমিত-তেজে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল, রাস্তা ঘাট বন্ধ করিল এবং রসদ লুটিয়া লইল। যুদ্ধে বিস্তর ইংরাজ-সৈন্য হতাহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কর্ণেল জনষ্টোন মহা বিপদেই পড়িলেন। চারিদিকে মহা ভীতি সঞ্চারিত হইল এবং তৎপ্রদেশস্থ যাবতীয় ইংরাজ-কর্ম্মচারী সপরিবারে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া কহিমা ছাউনিতে গিয়া আশ্রয় লইলেন। নাগারাও নূতন দলবদ্ধ হইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাহাও আক্রমণ করিল।. কামান গোলা প্রভৃতি বহুবিধ যুদ্ধ সামগ্রী সেই ছাউনিতে মজুত ছিল এবং তত্তাবৎ যথোচিতরূপে প্রযুক্ত হইল, তথাপি নাগাদের ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হইল না; রক্তবীজের ঝাড়ের মত নাগারা নানাদিক্ হইতে আসিয়া যে ভাবে ছাউনির চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া রহিল তাহাতে কেহই কোন দিকে অগ্রসর বা সে গণ্ডী হইতে বাহির হইতে পারিল না। গভর্ণমেণ্ট বিষম চিন্তিত হইলেন—নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্থানেই তখন আর এত সিপাহী সৈন্য নাই যে, অবিলম্বে প্রচুর সংখ্যায় প্রেরিত হইয়া প্রবল নাগাদলের দমন সম্ভব হইতে পারে। দূরবর্ত্তী স্থানে অবশ্যই সেনা আছে, কিন্তু ততদূর হইতে তাহাদিগকে আনাইতে যে সময় লাগিবে, তন্মধ্যে সর্ব্বনাশ অর্থাৎ কহিমাস্থ সমস্ত পল্টনদল নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ অবরুদ্ধ সাহেব, বিবি ও সৈনিক প্রভৃতি সকলেই আপনাদের মৃত্যু নিশ্চয় স্থির করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় কম্পিতাবস্থায় রহিয়াছিল এবং নাগারা ছাউনি দখল করিয়া, তাহাদের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের কি দুর্গতি যে করিবে, সেই চিন্তাই মৃত্যু চিন্তা হইতেও ভয়ানক হইয়াছিল।

এই ভীষণ অবস্থায় অনন্যগতি হইয়া পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট

মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তি তৎক্ষণাৎ এক প্রকাশ্য দরবার করিয়া পুত্রামাত্য সকলকে বলিলেন, "ইংরাজ ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করুন তাঁহাদের এই বিপদকালে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কহিমাতে তাহাদের যেরূপ অবস্থা শুনিয়াছি, তাহাতে অতি দ্রুত গতি যাইয়া সাহায্য না করিলে সকলই বিফল হইবে। অধিক লোক লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব। অতএব তোমাদের মধ্যে, অল্প সৈনিক সমভিব্যহারে অতি সত্বর অগ্রসর হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে কে সাহসী হও, বল?" এই অতি দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ করা যেমন তেমন বীরের কার্য্য নয়। মহারাজার সদ্‌যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে অন্য কাহ্যকেই প্রফুল্লবদন বা তৎপর দৃষ্ট হইল না, কেবল মহারাজার তৃতীয় পুত্র বীরপ্রবর টিকেন্দ্রজিত সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "রাজাদেশ হইলে এ অধীন সে কার্য্য সাধনে প্রস্তুত!" মহারাজ অতি-মাত্র পুলকে পূর্ণ হইয়া এবং কেবল টিকেন্দ্রজিতের দ্বারাই এরূপ মহান্ কার্য্য সুসাধ্য বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সম্মানের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ তদনুসারে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অবিলম্বে বাহির হইলেন, পশ্চাতে আরো সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র মাত্র হইল। মহারাজার আদেশে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শূরচন্দ্র সিংহ খাদ্যাদি সংগ্রহ ও পৃষ্ঠরক্ষাদির ভার গ্রহণ করিলেন।

মণিপুরী সৈন্য সম্মুখীন হইবামাত্রই, বহু সহস্র সংখ্যক নাগারা রণরঙ্গে মত্ত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু টিকেন্দ্র-জিতের পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তাহারা অনতিবিলম্বেই নূতন বল সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় অগ্রসর হইল,

কিন্তু সেবারেও হারিয়া পলায়ন করিল। এইরূপ বারম্বার ক্রমাগত দেড়মাস্ কাল যুদ্ধ করিয়া, শেষে তাহারা টিকেন্দ্রজিতের বুদ্ধি, বীরত্ব ও কৌশল-পরিচালিত মণিপুরী সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণরূপে হীনবল হইয়া পলাইয়া গেল। টিকেন্দ্রজিৎ পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাহাদের বিস্তর গ্রাম ভস্মীভূত ও তাহাদিগকে একবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা পরিশেষে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিল।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির সাহায্যে, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বে, সে যাত্রা ইংরাজের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা পাইল। টিকেন্দ্রজিৎ নিয়ত দেড় মাস কাল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ, ক্লান্তি, কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, যেরূপ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা না করিয়া থাকা যায় না।

ভারত-গভর্ণমেণ্ট এবং ইংরাজ মাত্রেই তাহাতে মহা আনন্দিত হইয়া আপনাদিগকে বিশেষ উপকৃত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট আন্তরিক বাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কিছু কাল পরে মণিপুরে এক প্রকাশ্য দরবার করিয়া মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তিকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ দান সহিত (কে, সি, এস্, আই,) নাইট উপাধিতে ভূষিত করিয়া "মহারাজা স্যার" সম্বোধনে গৌরবান্বিত করিলেন। সেই দরবারে প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি, সদস্য, সৈন্য প্রভৃতিকেও প্রতিষ্ঠাবাদে সম্মানিত করাতে রাজ্যময় আনন্দধ্বনি নিনাদিত হইল। শুদ্ধ তাহাই নহে, গভর্ণমেণ্ট সন্তোষের চিহ্ন স্বরূপ এবং যুদ্ধ ব্যয়ের প্রতিদান-স্বরূপ, মহারাজাকে দুই সহস্র উৎকৃষ্ট বন্দুক উপহার ও সেই যুদ্ধে লিপ্ত প্রত্যেক মণিপুরী সৈনিককে এক একটি

"মেডাল" অর্থাৎ গৌরব-বিকাশক পদক এবং দশটি করিয়া টাকা পারিতোষিক দিলেন।

সর্ব্বোপরি, যাঁহার ভুজবল ও রণ-কৌশলে এই সুমহৎ ফল লাভ হইয়াছিল, সেই বীর-প্রবর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহকে যথোচিত প্রতিষ্ঠা-বাদের সহিত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি বহুমূল্য সুন্দর সুবর্ণ পদক প্রদত্ত হইল।

হা ভবিতব্য! তোর অসাধ্য কিছুই নাই! যে টিকেন্দ্রজিৎ যাঁহাদের জন্য এতটা করিয়াছিলেন—যাঁহাদের কার্য্যে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াদিয়াছিলেন, সেই বীরকে তাঁহাদেরই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইলি!

ব্রহ্মরাজ থিবর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে, মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল জনষ্টোন সাহেবের অধীনে পুনর্ব্বার মণিপুরী সৈন্য দেন। তাহাতে উত্তর ব্রহ্মে, অনেক-গুলি ইউরোপীয় ও ব্রিটিশ প্রজার প্রাণ রক্ষা পায়। এরূপ সামরিক সাহায্য না পাইলে, ব্রহ্মবাসীদের হস্তে তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। চন্দ্রকীর্ত্তি ৩৫ বৎসর নির্ব্বিবাদে ও বিপুল যশের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপে কোন শত্রুই অধিক দিন মস্তকোত্তোলন করিয়া থাকিতে পারে নাই। রাজ-পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বিদ্রোহী হন, কিন্তু তাহার বুদ্ধি কৌশলে ও সমর-প্রতাপে সকলেই হত, বন্দীকৃত অথবা ব্রিটিশ রাজ্যে বিতাড়িত হইয়াছিল। ব্রহ্মসীমান্ত প্রদেশের দুর্দ্দান্ত কুকি ও চাষাদ প্রভৃতি জাতিরাও, চন্দ্রকীর্ত্তির সৌর্য্য, বীর্য্যে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁহার সুশাসন ও সুবিচারে ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র, সকলেই সন্তুষ্ট ছিল।

আজ প্রায় ৬ বৎসর মাত্র মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে সেই বীরশ্রেষ্ঠের সাধের মণিপুরের অবস্থা কি হইল—তাঁহার প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রগণের দশাই বা কি ঘটিল! চন্দ্রকীর্ত্তিসিংহ আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দশটীপুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। যে স্ত্রীর গর্ভে যে যে পুত্র হইয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। কে কে সহোদর ভ্রাতা, পাঠক তৎপ্রতিও লক্ষ রাখিবেন।

প্রথমা রাণীর গর্ভে			...	শূরচন্দ্র, কেশরজিৎ, ভৈরবজিৎ বা পাক্কাসেনা এবং পদ্মলোচন বা গোপালসেনা।
দ্বিতীয়া	ঐ	ঐ	...	কুলচন্দ্র এবং গান্ধার সিংহ।
তৃতীয়া	ঐ	ঐ	...	টিকেন্দ্রজিৎ বা কৈরং সিংহ।
চতুর্থা	ঐ	ঐ	...	ঝালকীর্ত্তি সিংহ।
পঞ্চমা	ঐ	ঐ	...	ভুবন সিংহ বা অঙ্গেয়সেনা।
ষষ্ঠা	ঐ	ঐ	...	জিল্লাগম্বা বা জিল্লাসিংহ।

সপ্তমা ও অষ্টমা রাণী নিঃসন্তান।

চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পূর্ব্বেই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। অন্যান্য পুত্রগণকে যথোপযুক্ত পদে স্থাপিত করেন। যথা;—কুলচন্দ্র, যুবরাজ। ঝালকীর্ত্তি, সেনাপতি। টিকেন্দ্রজিৎ, সেনানায়ক (Commander)। কেশরজিৎ, প্রধান সৈন্য-পরিচালক (Commanding General)। ভৈরবজিৎ বা পাক্কা-সেনা, সহকারী চালক (Lieutenant General)। পদ্মলোচন বা গোপালসেনা, সচিব বিশেষ (Civil Minister)।

মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি, প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়, শেষ জীবনে, বিষয়

মহারাজ শূরচন্দ্র ।

৮৪ পৃষ্ঠা ।

কর্ম্মের ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবলই ধর্ম্ম কর্ম্মে পরকালের চিন্তায় মগ্ন রহিলেন এবং যথাকালে পুণ্যবান ভূপতির ন্যায় যশঃ, কীর্ত্তি, পশ্চাতে রাখিয়া, প্রজাকুল ও আত্মীয়বর্গের শোকাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। রাজকার্য্য পরিচালনা পক্ষে তিনি যেরূপ সুব্যবস্থা সমূহ করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও আশঙ্কা করেন নাই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে ৫।৬ বৎসরের মধ্যেই, তাঁহার সুশাসিত প্রিয়তম মণিপুর রাজ্যে এমন বিপ্লব ঘটিবে।

নবম অধ্যায়।

মহারাজ শূরচন্দ্রের রাজত্ব কাল।

কীর্ত্তিমান মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির লীলাবসান হইল। মণিপুর রাজ্য গভীর বিষাদে মগ্ন; পুত্র, মিত্র, পাত্র, ভৃত্য, মহাশোকে আকুল; অন্তঃপুরে ঘোর ক্রন্দন-রোল; ওদিগে কর্ম্মচারীবর্গ শোকার্ত্ত হৃদয়ে কৌলিক রীত্যনুসারে মৃত মহাপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে নিযুক্ত; এমন সময় অকস্মাৎ একটি অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত।

দূরে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। সেই সঙ্গে বহুজনের বিকট কলরব মিশ্রিত হইয়া, তাহা যেন রাজপুরীর দিকেই দ্রুত আসিতেছে, এমত বোধ হইল। পরক্ষণেই স্পষ্ট বুঝা গেল, কোন বাহিনী যেন রণসজ্জায় রাজধানীর অতি নিকটেই সমরোৎসাহে অগ্রসর হইতেছে। এই মহা শোকের মুহূর্ত্তে রণবাদ্য, সাংগ্রামিক হুঙ্কার, অস্ত্রের ঝনুঝনা, একি আশ্চর্য্য! সে বিকট শব্দে গিরি-

রাজ নিনাদিত, মণিপুর বিকম্পিত এবং নর নারী সকলেই আকু-লিত হইয়া উঠিল। এমন নিদারুণ শোকের দিনে এই আকস্মিক বিপৎপাতে, সকলেই যেন একবারে বিস্মিত ও বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতপ্রায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু (তাৎকালিক কম্যাণ্ডার) বীর টিকেন্দ্রজিৎ, কিছু মাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া সকলকে আশ্বাসিত করিলেন এবং তৎপর হইয়া ভ্রাতৃগণ ও প্রধানামাত্য কয়জনের সহিত ক্ষণিক পরামর্শের পর কমাণ্ডিং জেনারেল কেশরজিৎ সিংহের সহিত অবিলম্বে সৈন্য সজ্জিত করিয়া আগন্তুক শত্রুর গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। এদিকে অল্প আশা ও অধিক আশঙ্কায় দোলায়মান ভাবে অভিনব মহারাজা শূরচন্দ্র সভ্রাতামাত্য শোকাকুল হৃদয়ে স্বর্গীয় পিতৃদেবের সৎকারে ব্যাপৃত রহিলেন।

বীর টিকেন্দ্রজিৎ ও কেশরজিৎ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া জানিতে পারিলেন যে, মহারাজা গম্ভীর সিংহের পূর্ব্ব সেনাপতি এবং পরে কিয়ৎকালের নিমিত্ত মণিপুর-রাজাসনে অধিষ্ঠিত বিখ্যাত নরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় চাওবা ও কনিষ্ঠ পুত্র মেকজিন সিংহই এই বিদ্রোহী সৈন্যের পরিচালক। তাঁহারা বহু বৎসর হইতেই পিতৃপদে পুন-স্থাপিত হওনার্থ লোলুপ। মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির জীবদ্দশায় তদভি-প্রায় সুসিদ্ধির সুযোগ সুবিধা পান নাই; এখন তাঁহার মৃত্যুতে আশান্বিত হইয়া ঠিক যে সময়ে রাজপরিবার শোকে বিহ্বল ও অবশাঙ্গ, সেই লগ্নেই আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন।

বড় চাওবা বলবান ব্যক্তি ও বিশেষ পরাক্রম-প্রভাবশালী; কিন্তু কেশরজিৎ এবং টিকেন্দ্রজিৎও মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির অনুপযুক্ত পুত্র নহেন।
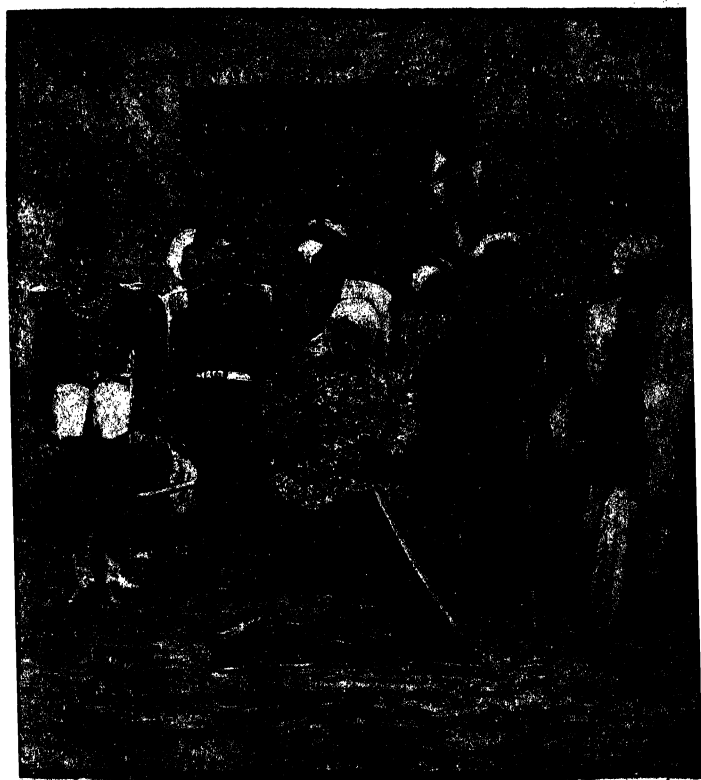
মণিপুর রাজ-পরিবার।

রাজা শূরচন্দ্র, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ, রাজভ্রাতাগণ ও থঙ্গাল জেনারেল।

৮৬ পৃষ্ঠা।

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের অনলকণাবর্ষী প্রখর সূর্য্যোত্তাপেও ভয়ানক রণরঙ্গ ক্রমাগত চারি দিন চলিল। ভাগ্যলক্ষ্মী টিকেন্দ্রজিতের প্রতি প্রসন্ন হইলেন—বড় চাওবা, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যকে রণক্ষেত্রে, অনন্ত শয্যায় শায়িত রাখিয়া, বারুদ বন্দুকাদি সমর-সামগ্রীর অধিকাংশই টিকেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া, ভ্রাতৃসহ পলায়ন পূর্ব্বক কোনমতে জীবন রক্ষা করিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের মৃতাবশিষ্ট সৈন্যগণ একবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোন্ দিকে পলাইল, তাহার ঠিক ছিল না। দুই ভ্রাতা তাহাদের কতকগুলি সঙ্গে লইয়া, কি তাহাদের হইতে পৃথক্ হইয়া, পলায়ন করিলেন এবং পলাইয়া গিয়া কোথায় যে লুক্কায়িত রহিলেন, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

মহারাজ শূরচন্দ্র, চন্দ্রকীর্ত্তির জীবদ্দশাতেই রাজপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এখন শত্রুভয় নিবারিত হওয়াতে সর্ব্বাগ্রেই একটি দরবার করিলেন। সেই দরবারে, সহোদর ও বৈমাত্রেয় যাবতীয় ভ্রাতাগণ আসিলেন এবং মন্ত্রী, প্রধান কর্ম্মচারী ও রাজ্যের গণ্য মান্য যাবতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদোচ্চারণ ও জগদীশ্বরের স্তুতিগান করিয়া, নবরাজ্যেশ্বরের মঙ্গল কামনা করিলেন। মহাত্মা চন্দ্রকীর্ত্তির পাদুকা ও রাজ-তরবারি দরবারে আনীত হইল। সকলের সমক্ষে ভ্রাতাগণ সেই দুইটি পিতৃ-পরিত্যক্ত পবিত্র নিদর্শন স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কস্মিনকালে রাজভ্রাতার বিরোধী হইবেন না, পরস্পরে বিবাদ করিবেন না এবং প্রত্যেকে নিজের ভারার্পিত রাজকার্য্য ধর্ম্মতঃ নির্ব্বাহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। শূরচন্দ্র রাজপদাধিকারী থাকিলেও সেই দরবারে আর একবার চিররীত্যনুসারে সর্ব্বজন কর্তৃক রাজ্যের মহারাজা বলিয়া স্বীকৃত, সম্মানিত ও

পূজিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুযায়ী স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার প্রতি সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সকলেই অনুরক্ত থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন। স্বর্গীয় মহারাজ, নাবালক জিল্লা সিংহ ব্যতীত, জীবিত সকল পুত্রকেই এক একটি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজ শূরচন্দ্র তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে স্থায়ী রাখিবেন বলিয়া সেই দরবারে প্রকাশ করিলেন। কুমার জিল্লা সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত ও কার্য্যক্ষম হইলেই, তাহাকেও কোন উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, এ কথাও হইল। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া, দরবার ভঙ্গ হইল এবং সকলে হাস্যমুখে, প্রফুল্লান্তঃকরণে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। তাৎকালিক সেনাপতি ঝালকীর্ত্তি পূর্ব্ব হইতে অসুস্থ ছিলেন; এখন কয়েক দিবসের মধ্যেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে মহারাজ শূরচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। উপযুক্ত পদে উপযুক্ত ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহার নিয়োগে সৈন্য সামন্তগণ পরমোৎসাহিত এবং প্রজাসাধারণও সাতিশয় আশান্বিত ও আহ্লাদিত হইল।

শূরচন্দ্র এইরূপে পরম সুখে চারি মাস রাজত্ব করিতেছেন, রাজ্য শান্তি ও সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, প্রজারা স্বচ্ছন্দে আছে, এমন সময় আশ্বিন মাসে এক দিন, বড় চাওবা ও তদীয় ভ্রাতা মেকজিন সিংহ সহসা কোথা হইতে আসিয়া রাজধানী পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। মণিপুর রাজ্যমধ্যে তাঁহাদের স্বর্গগত পিতা নরসিংহের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাহারা দেবেন্দ্র সিংহের চক্রে পড়িয়া নগণ্য শ্রেণীর মধ্যে পরিণত হইলেও, তাহাদের ধন সম্পত্তি কিছুর থাকাতে এবং গৌরবান্বিত নরসিংহের পুত্র বলিয়া তখনও রাজ্যমধ্যে

বীর টীকেন্দ্রজিৎ সিংহ (রুগ্নাবস্থার ছায়াচিত্র হইতে)।

৮৮ পৃষ্ঠা।

অনেক লোক তাহাদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল। এই হেতু চারি-মাস পূর্ব্বে সম্পুর্ণ পরাজিত হইলেও তাহারা পুনরায় এত শীঘ্র সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববারে পরাজিত ও পলায়িত হওয়ায় তাহারা বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন; তাহাদের ক্রোধ ও রাজ্যলিপ্সা দ্বিগুণ বাড়িয়াছিল। তাই এবার অধিকতর ও উৎকৃষ্ট আয়োজনে মহা আস্ফালনে আসিয়াছেন—বড় চাওবা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, এবার তিনি নিশ্চয়ই রাজ্যেশ্বর হইবেন। সঙ্গে ঢাল, তরবারি, বর্ষা, টাঙ্গি, বন্দুক-ধারী প্রভৃতি সুসজ্জিত প্রায় দুই সহস্র সৈন্য এবং কয়েকটি কামানও আছে। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সম্মুখীন হইবামাত্রই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। টিকেন্দ্রজিৎ মহাতেজে তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অধিকতর পরাক্রমে তাহারা পদে পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ববারের মত এবারেও চারি দিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বিজয় লক্ষ্মী একবার টিকেন্দ্রজিৎকে অনুগ্রহ, পরক্ষণেই হয়তো তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া বড় চাওবার প্রতি সদয়া হইলেন—এবার তাঁহাকে বড় চাওবারই প্রতি অধিক দয়াশীলা বলিয়া বোধ হইল। চাওবার কামানগুলি অতিশয় দক্ষতার সহিত চালিত হইতেছিল। তাহাদের প্রক্ষিপ্ত লোহিত গোলা সকল কালান্তক কাল সদৃশ টিকেন্দ্রজিতের বলক্ষয় করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি ভয়ানক ক্ষতি-গ্রস্ত এবং মহা বিপন্ন ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। শূরচন্দ্রের প্রস্তাবে এবং পলিটিকেল এজেন্টের সুপারিসে মণিপুরের সাহায্যার্থ ইংরাজের সৈন্য আসিবার কথা পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। এখন তিনি সেই আশায় বুক বাঁধিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না—টিকেন্দ্র-জিতের সৈন্যগণ, বিপক্ষের বিক্রমে আর তিষ্ঠিতে পারে না। গেল!—

হায় সব গেল!—এবার বুঝি টিকেন্দ্রজিৎ আপনার গৌরব ও পৈতৃক রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না—এবার বুঝি মণিপুর রাজ্য বড় চাওবারই হইল।

তথাপি বীরবর ছাড়িতেছেন না—এত সৈন্য ক্ষয়েও এক পদ ভূমি পশ্চাৎ হাটিতেছেন না। নিরুৎসাহ নিরাশ সৈন্যগণকে ইংরাজ-সৈন্য-সাহায্য আগত-প্রায়, বলিয়া প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পরাজয় হয় হয়, এমন সময়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, ইংরাজ-সৈন্য আসিতেছে। একটি গগন-বিদারী ঘোর জয়রব শ্রুত হইল, বিপক্ষ-হৃদয় তাহাতে চমকিয়া উঠিল, অবিলম্বে ইংরাজের সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল—একশত সিপাহী আসিয়া টিকেন্দ্রজিতের দলে যোগ দান করিল। কিন্তু দূর হইতে পতাকা দেখিয়া যে বিপুলা আশা জন্মিয়াছিল, সিপাহীর সংখ্যা দেখিয়া সে আশা-দুশ্চিন্তাও নিরাশায় পরিণত হইল। যে ভীষণ সমর তরঙ্গে তিনি পড়িয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য শত-সংখ্যক-সিপাহীরূপ ভেলায় কি হইবে?

সেই ভয়ানক নাগা-যুদ্ধের কথা তাহার হৃদয়ে উদিত হইল। তাহাতে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ইংরাজকে উদ্ধার এবং স্বীয় সুনাম বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি, দুশ্চিন্তারূপ ঘন ঘটাচ্ছন্ন অন্তরকে বিদ্যুৎ গতিতে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় উদ্ভাসিত করিল। সেই নাগাবেষ্টিত কোহিমা বিপদে ইংরাজের ধন, মান, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যিনি ইংরাজকে অকুণ্ঠিত চিত্তে, দুই সহস্র সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, আজ তাহারই দারুণ দুঃসময়ে ইংরাজ ১০০ একশত মাত্র সৈনিক সাহায্য পাঠাইয়াছেন। একবার এইরূপ ভাবিয়া তিনি ভাবান্তরিত ও কম্পিত হইলেন। পরক্ষণেই সেই স্বর্গীয় পিতৃদেব চন্দ্রকীর্ত্তির শ্রীমুখ স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীচরণ উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম করি-

লেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার বদন মণ্ডলে ও নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল পরের সাহায্য—তুচ্ছ আশা! পুরে যথোপযুক্ত সাহায্য করিল না বলিয়া টিকেন্দ্রজিৎ বিজীত হইবেন—চন্দ্রকীর্ত্তির যশঃকীর্ত্তি ডুবিবে—তাঁহার কুলে কলঙ্ক রটিবে! না, তাহা কোন মতেই হইবে না—স্কন্ধে মস্তক থাকিতে—দেহে প্রাণ সত্বে টিকেন্দ্রজিৎ তাহা হইতে দিতে পারে না! ইত্যাকারের ভাবোচ্ছাসে তিনি উন্মত্তের ন্যায় হইলেন—হতাশা হইতে মনুষ্য-হৃদয়ে যে এক প্রকার অমানুষিক বল সঞ্চার হইয়া থাকে, তাঁহার অন্তরে যেন সেই দৈব-বল আবির্ভূত হইল।

একবার সৈন্যদলের মধ্যে পশিয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পুর্ব্বক, অগ্নিময় উৎসাহ বাক্যে প্রত্যেকের হৃদয়ে সাহসের তাড়িত শক্তি সঞ্চালিত করিয়া, নূতন আকাঙ্ক্ষায়, নূতন দর্পে, নূতন তেজে, সদলে রণোন্মত্ত ভাবে বড় চৌবাকে আক্রমণ করিলেন। সে প্রচণ্ড তেজঃ বিপক্ষ দল সহ্য করিতে পারিল না। বিশেষতঃ ইংরাজ-সাহায্যের নাম-গন্ধ সর্ব্বশ্রেণী মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়াতে, বিপক্ষেরা জয় বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। এখন টিকেন্দ্রজিতের ভীষণ বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। ক্ষণপূর্ব্বে যাহারা বিজয়ী ছিল- এখন তাহারা ভয় পাইল। বড় চাওবার সুদক্ষ গোলন্দাজেরাও ভয়বিহ্বল-চিত্তে কামান, বন্দুক পরিচালন প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। রণকুশলী টিকেন্দ্রজিৎ সুযোগ বুঝিয়া ভীষণ ও দুর্দ্দম্য বেগে, অল্পক্ষণের মধ্যে রণক্ষেত্রকে শ্মশানে পরিণত করিলেন। চাওবার আহতগণ পড়িয়া রহিল; অবশিষ্ট সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল; তাহাদেরও অধিকাংশ পশ্চাদ্ধাবনকারী টিকেন্দ্র-সৈন্য হস্তে পড়িল। বড় চাওবা ও যেকজিন সিংহ দুই ভ্রাতাই টিকেন্দ্রজিতের

নিকট বন্দী হইলেন। এইরূপে রাজ্য লাভের প্রজ্জ্বলিত দুরাশা সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইল।

দুই সহোদরই মিত্ররাজ ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইলেন। তাঁহারা রাজকীয় বন্দী হইয়া, হাজারিবাগে, পুলিষের নজরবন্দীতে রহিলেন। আর তাঁহাদের এ জীবনে মণিপুর অঞ্চলে যাইবার ভরসাও রহিল না। বড় চাওবার মাসিক ৬০ ও তাহার কনিষ্ঠের ২০ বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজের ষষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবজিৎ সিংহ লেফটেনাণ্ট জেনারেল বা পাকা সেনার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পাঠকও পূর্ব্ব বিবরণ দৃষ্টে অবগত আছেন যে কেশরজিৎ, ভৈরবজিৎ এবং পদ্মলোচন, এই তিন জন, মহারাজ শূরচন্দ্রের সহোদর এবং অপর সকলেই তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

ঝালকীর্ত্তি সিংহের মৃত্যুর পর হইতে টিকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাজেই ভৈরবজিৎকে তাঁহার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎকে তিনি বাল্যকাল হইতেই দেখিতে পারেন না। এজন্য তাঁহার পদোন্নতিতে ভৈরবজিৎ মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। আবার যখন বড়চাওবাকে সদলে পরাস্ত করিয়া, টিকেন্দ্রজিৎ বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিলেন, তখন ভৈরবজিৎ আপনাকে যেন অধিকতর অপমানিত ও লোকের নিকট নগণ্যরূপে গণ্য দেখিয়া দুঃখে, দ্বেষে, ঈর্ষায় সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। অন্য দিকে, কুলচন্দ্র যে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত, ইহাও ভৈরবের প্রীতিকর নহে। যুবরাজ ও সেনাপতি, ইহাই রাজ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ, বৈমাত্রেয়দ্বয় তাহাতে অধিষ্ঠিত, ইহা ঐ যুবকের পক্ষে অসহ্য হইল। লেখাপড়া বৈষয়িক চতুরতায় তিনি সকল ভ্রাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কূট তার্কিক বুদ্ধিও যথেষ্ট। সেই কূটবুদ্ধি ও চতুরালী

চালনা দ্বারা আপনার অপর তিন (মহারাজ সুদ্ধ) ভ্রাতাকে লইয়া কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে, দল বাঁধিবার চেষ্টায় রহিলেন।

কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্র, উভয়ে বৈমাত্রেয় হইলেও, দুই সহোদরা ভগ্নীর গর্ভজ সন্তান। এই জন্য তাঁহাদের পরস্পরে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। অধিকন্তু, টিকেন্দ্রজিতের উদারতা ও উচ্চ হৃদয়ের গুণে, (ভৈরবজিৎ ভিন্ন) সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। এখন ভৈরবজিতের মন্ত্রণায়, কেশরজিৎ ও পদ্মলোচন কিয়ৎ পরিমাণে ভৈরবের মতানুবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। আবার ভৈরবী চক্রে এই টুকু ঘটিল যে, অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা সহানুভূতি ও অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত হইল।

কেবল ন্যায়পরায়ণ উদারচেতা শূরচন্দ্র এ সকল পারিবারিক মনান্তরের ও চক্রান্তের ছন্দাংশেও ছিলেন না এবং সহোদর বা বৈমাত্রেয় বলিয়া কাহারও প্রতি ভিন্ন ভাব তাঁহার ছিল না। তিনি ধর্ম্মাচরণে রত থাকিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। পাক্কা সেনা (ভৈরবজিৎ) তাঁহাকে নিজের অভিপ্রায়ের কথা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিতে সাহসীও হইতেন না। কুলচন্দ্রের নিকটেও টিকেন্দ্রজিতের প্রতিপত্তির খর্ব্বতা ঘটিল না। সুতরাং পাক্কাসেনা স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধির অন্যবিধ উপায়োদ্ভাবনে প্রবৃত্ত রহিলেন।

এ সময়ে ইংরাজ-রাজের সহিত শূরচন্দ্রের যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মাধিপতি থিবকে বন্দী করিয়া রত্নগিরিতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ্যের প্রধানগণ ও প্রজাগণের মধ্যে অনেকে তখনও ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ তাহারা দলে দলে অভ্যুত্থিত হইয়া ইংরাজ সৈন্যগণকে আক্রমণ ও তাহাদের গতিরোধ করিতেছিল। রাজকীয়

ও সামরিক বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক নেতা ও পরিচালকে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে—তাহারা মাথা হারাইয়াছে, তথাপি তাহারা সহজে স্বাধীনতা রত্ন ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না—তাহারা যথাসাধ্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ বিস্তর লড়াই ঝগড়া বাধাইতে প্রাণপণে ত্রুটি করিতেছে না। সেই স্বদেশভক্ত ব্রহ্মবাসিগণ "ডাকাতি" ও "বিদ্রোহী" নামে ইংরাজ সমাজে কলঙ্ককালিমায় ভূষিত হইতেছে, তথাপি তাহারা ছাড়িতেছে না। মণিপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে উত্তর-ব্রহ্মান্তর্গত টামু নামক স্থানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি সেনা-নিবাস স্থাপন করিলেন। মহারাজ শূরচন্দ্রের সম্মতি ও সাহায্য ক্রমে মণিপুরের মধ্য দিয়া সেখানে ও অন্যান্য স্থানে ইংরাজ-সৈন্য সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতে লাগিল। অধিকন্তু মণিপুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমান্তবাসী বিবিধ দুর্দ্ধর্ষ বন্যজাতি, যাহারা মহারাজ থিবর নাম-মাত্র অধীন ছিল, তাহারা কেবল মণিপুর রাজ্যের বৈরিতার ভয়েই ইংরাজের অধিক অনিষ্ট করিতে পারে নাই। মহারাজ শূরচন্দ্র সে সময় ইংরাজের পক্ষ না থাকিলে, ব্রহ্মবিজয় ততটা সহজ হইত না এবং টিকেন্দ্রজিৎ বক্র হইয়া তাহাদের পরিচালনা করিলে, অদ্যাপিও উত্তর ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত হইয়া উঠিত না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে, মণিপুর চিরদিনই যেমন অনুগত ও শ্রেয়ঃসাধক মিত্ররাজ্য ছিল, এই ব্রহ্মাধিকাররূপ দুরূহ কার্য্যেও তদ্রূপ অনুকূল থাকিতে তিলমাত্র ত্রুটি করে নাই।

বড় চাওবার দ্বিতীয় আক্রমণের পর, এক বৎসর যাইতে না যাইতেই, (১৮৮৬ সালে) পরলোকগত মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত মন্ত্রী ভুবন সিংহের পুত্র ওয়াঙ্কারাইপো. ভাদ্রমাসে সহসা একদিন রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তাঁহার চারিটি পুত্রই তাঁহার সহিত, এই অবৈধ সমরে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লাইরেঙ্গাও মাইপা বিশেষ

বলবান ও পরাক্রমী। তাঁহারা পিতা পুত্র সকলে মিলিয়া সৈন্য সঞ্চালনে নিযুক্ত থাকিয়া ভীম পরাক্রমে ইম্ফালাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুন্দুভিনিনাদে ও বন্দুকাদির বিকট শব্দে সহর তোলপাড় হইয়া উঠিল। ওয়াঙ্কারাইপোর উৎসাহ, কার্য্যকুশলতা এবং বলবিক্রমের কথা সকলেই জানিত। বিশেষতঃ তাঁহারা বড়চাওবা হইতেও অধিকতর সুবন্দোবস্তে আসিয়াছিলেন। ইহাতে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইল। মহারাজ শূরচন্দ্র ঝটিতি এক দরবার করিয়া, তখনকার পলিটিকেল এজেণ্ট প্রিমরোজ সাহেবের নিকট ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিলেন। এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের সহিত গোপাল সেনা বা পদ্মলোচন সিংহকে সহকারী করিয়া, প্রচুর সৈন্যাদি সহ শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠাইলেন।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং সমস্ত দিন রাত্রি তাহা অবিশ্রান্ত রূপে চলিতে লাগিল। বন্দুকের নিরবচ্ছিন্ন শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত ও মণিপুরস্থ সমস্ত লোকেই থর থর কাঁপিতে লাগিল। উভয় পক্ষেই বিস্তর হত ও আহত হইল, কিন্তু শূরচন্দ্রের পক্ষীয় সৈন্যেরাই অধিকতর বিপন্ন ও অক্ষম হইয়া পড়িল। টিকেন্দ্রজিৎ ও পদ্মলোচন উভয়ে বড়ই ভাবিত হইলেন। তাঁহারা ইংরাজ সাহায্য পাইবার আশায় কোনমতে সমরক্ষেত্রে মান প্রাণ বাঁচাইয়া তিষ্ঠিয়া রহিলেন। এমন সময় আরও বিপদ—পলিটিকেল এজেণ্টের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সৈন্য আসিবে না। এই সংবাদে সেনাপতি সাতিশয় বিচলিত হইলেন এবং তাহার হৃদয় একবারে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তাড়িৎ প্রবাহবৎ তাঁহার মনে একটি নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। হইবামাত্র গোপালসেনার সহিত মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিলেন। অনতিপরেই তাঁহাদের সৈন্য দ্বিভাগে বিভক্ত হইল।

সম্মুখস্থ সৈন্যদল লইয়া সেনাপতি পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিলেন এবং পশ্চাৎদিকের অর্দ্ধাংশ লইয়া গোপালসেনা রণস্থল হইতে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষেরা ইহার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু গোপাল সেনা সদলে যখন দৃষ্টির বাহির হইলেন, তখন তাঁহারা অধিকতর উৎসাহে, সেনাপতির সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শশব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা ভাবিলেন, তিনি আর তাঁহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। তখন তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহে ও বর্দ্ধিত-বিক্রমে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৌশলময় বক্রগতিতে টিকেন্দ্রজিৎ সসৈন্যে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়াই, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অমনি, কতকগুলি সৈন্য প্রাচীরের উপরে উঠিয়া, কেহ বা প্রাচীরমধ্যস্থিত ছিদ্র দিয়া, বিপক্ষের প্রতি গুলি চালাইতে লাগিল। ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। বিপক্ষেরা মহোল্লাসে দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রাচীর ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভিতর হইতে কেহই আর তাহাদিগকে বাধা দিল না।

ওয়াঙ্কারাইপো বুঝিলেন, মহারাজের সৈন্যগণ, তাঁহার সহিত আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। অতএব তিনি দুর্গ অবরোধ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই দেখা গেল যে, কেল্লার সর্ব্বপ্রধান দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে মনুষ্য থাকার চিহ্ন মাত্রও নাই। তখন আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে, টিকেন্দ্র সসৈন্যে কেল্লাছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। সুতরাং পুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, পরমানন্দে সমস্ত সৈন্যকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার আদেশ দিলেন। অবিলম্বেই দুর্গ ও রাজপ্রসাদ

অধিকৃত হইবে, এই আশায়, সকলেরই মুখ প্রফুল্ল হইল, জয়নাদ উঠিল, বিজয় ডঙ্কা উচ্চমধুর রবে বাজিতে এবং পতাকা সকল সগৌরবে উড়িতে লাগিল। সকলেই হাসিতে হাসিতে দুর্গে প্রবেশ করিল। কিন্তু সর্ব্বনাশ! অকস্মাৎ একি ব্যাপার! চতুর্দ্দিক হইতে ভয়ঙ্কর বজ্র নির্ঘোষে কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠিল। ভূতাগত ব্যাপারের ন্যায় শত শত সৈনিক বিকট লম্ফে ঝম্পে কোথা হইতে আসিয়া সিংহ বিক্রমে যেন মৃগযূথের উপর পড়িল। দেখিবার, শুনিবার, ভাবিবার, বুঝিবার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই তাহারা বহুসংখ্যকের প্রাণনাশ করিল। সপুত্র ওয়াঙ্কারাইপো চমকিত ও স্তম্ভিতবৎ কিয়ৎক্ষণ ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন—সেই অল্পক্ষণই যথেষ্ট। ভিতরের গুপ্ত স্থান হইতে পদ্মলোচন এবং বাহিরের গুপ্ত স্থান হইতে টিকেন্দ্র যুগপৎ সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাৎ আক্রমণ করিলেন। সে দুর্জ্জয় বেগ ধারণ করা দুঃসাধ্য হইল—ভয়ঙ্কর রুধিরপাত, আর্ত্তনাদ, ভঙ্গ, পলায়ন, সৈন্যনাশ, পরাজয়, সম্পূর্ণ রূপেই ঘটিল।

ওয়াঙ্কারাইপো ও পুত্রগণ সেই সর্ব্বগ্রাসী সমর-সাগরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া চিরদিনের মত রাজ্য-পিপাসা মিটাইলেন। তাঁহাদের তাবৎ সঙ্গী হত, আহত, পলায়িত বা বন্দীকৃত হইল। রাজ্যময় ধি ধি পড়িয়া গেল। সকলেই টিকেন্দ্রজিতের তীক্ষ্ণ উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। মহারাজ শূরচন্দ্রও তাঁহাকে (অশেষ সুখ্যাতির সহিত) প্রাণ খুলিয়া প্রেমালিঙ্গন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাহেব আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া সবিস্ময় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

টিকেন্দ্রের অতুল পরাক্রমে মহারাজা যেমন আহ্লাদিত হই-

লেন, ভৈরবজিৎ সেই পরিমাণে গোপনে গোপনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পাকাসেনা অন্যরূপে স্বীয় ইষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিয়া প্রায় বৎসরাবধি মহারাজের প্রীতি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই শূরচন্দ্রের কাছে কাছে থাকিতেন এবং উত্তম লেখা পড়া বোধ থাকায়, রাজকার্য্যে নানারূপ সাহায্য করিতেন। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে মহারাজের অধিক প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হইতেছিলেন। বিবিধ রাজকার্য্য পরিচালনায় ভৈরবজিৎ উত্তম সহায় এবং কঠিন রাজনৈতিক মীমাংসায় ভৈরবজিৎ প্রধান অবলম্বন, এইরূপ ধারণা ক্রমশঃ মহারাজের মনে বদ্ধমূল হওয়াতে কাজেই ভৈরবজিতের প্রতিপত্তি রাজ্য মধ্যে দিন দিন দৃঢ়রূপে বাড়িতেছিল। শূরচন্দ্র, ভৈরবজিতের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ না হইলেও, তাঁহার গুণে বাধ্য হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু ভৈরবজিৎকে রাজ্যমধ্যে অতি অল্প লোকেই ভাল বাসিত। তথাচ মহারাজের অনুগ্রহ ভাজন হওয়াতে এখন সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পক্ষান্তরে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা সকলে ভৈরবজিতের ব্যবহারে দিন দিন ব্যথিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি জন্মিয়া এখন তাহা এক প্রকার প্রণয় ও সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন দুঃখ কষ্ট হইলে, টিকেন্দ্রজিৎ তন্নিবারণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের যেমন ঘটিয়া থাকে, কত বিষয়ে ভ্রাতৃগণ মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইত। সে সব বিবাদের কথা মহারাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া সদুপদেশ দিতেন ও দ্বেষ হিংসাদি পরিহারার্থ অনুরোধ করিতেন। নিজের উদার স্বভাব বশতঃ তাঁহার বিশ্বাস

হইত যে, সেই মিষ্ট উপদেশ ও মিষ্ট ভৎর্সনায় সে বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। শেষে দেবোপাসনা ও ধর্ম্মকর্ম্মে তিনি এত নিবিষ্ট হইলেন যে, সে সকল বিষয়ে চিত্তার্পণ করিতে তাঁহার আর অবসর বা প্রবৃত্তি প্রায়ই হইত না।

ফলতঃ তিনি শান্তিময় পবিত্র জীবনেরই প্রয়াসী। কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে নিরুপদ্রব রাজ্য ভোগ লিখেন নাই। পুনরায় খৃঃ ১৮৮৭ সালে, প্রান্ত সীমাধিবাসী কুকিরা অবাধ্য হইয়া উঠিল। কুকি-সর্দ্দার তমহুর সহিত একজন রাজকর্ম্মচারীর মনান্তর ঘটে। কর্ম্মচারী কিছু অসঙ্গত পার্ব্বণী চাওয়াতেই এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। তমহু সেই কর্ম্মচারীকে তাহার এলেকাধীন গ্রাম সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। কিন্তু মহারাজার কর্ম্মচারী একজন সামান্য সর্দ্দারের নিষেধ মানিবে কেন? সে অবশ্যই পূর্ব্বের মত নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বত্র গতায়াত করিত। তাহাকে পদচ্যুত করণার্থ রাজভক্ত তমহু ভূপতি সমীপে আবেদন করিল। তমহুর অধিকারস্থ ও অধীনস্থ বিস্তর কুকি আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয়ে ঐ দরখাস্তের পোষক হইল। শূরচন্দ্র অতিশয় প্রজাবৎসল নরপতি, সুতরাং কুকি-দের মনোরঞ্জনার্থ প্রার্থনা পূরণে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তিনি ন্যায়বানও বটেন, কাহারও অনুরোধে কাহারও প্রতি অবিচার করিবার লোক নহেন। তিনি ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য ও আইনসঙ্গত কোন প্রমাণ পাইলেন না। কাজেই কুকিদের কাকুতি মিনতি অনুরোধ প্রভৃতি, স্রোতের জলে তৃণাদির ন্যায়, ভাসিয়া গেল। দোষ সাব্যস্ত হইল না, কর্ম্মচারীও শাস্তি পাইল না। কিন্তু কুকিরা তো অত শত বুঝে না—তাহারা সত্য ভিন্ন, মিথ্যা বলিতে জানে না; কর্ম্মচারীর ছলনায় তাহাদের সত্য কথা উড়িয়া গেল এবং কেবলই

উড়িল না, মিথ্যারূপে প্রকাশ পাইল। তাহারা রাজভক্ত হইলেও এতটা ফের ঘোর না বুঝিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল।

পার্ব্বত্য ও জঙ্গলী জাতিদের একতা অতি আশ্চর্য্য। তমহুর অধীনে এক বৃহৎ পঞ্চায়েত বসিল। তাহাতে ধার্য্য হইল, যেপর্য্যন্ত না মহারাজ শূরচন্দ্র কুকিদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা কেহই তাঁহাকে রাজকর ও ব্যাগার দিবে না এবং মণিপুর রাজ্যের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না। তাহাদের মধ্যে তমহু সর্দ্দারের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, তাহার জন্য কুকিরা মরিতেও প্রস্তুত। এক্ষণে এই মীমাংসা প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করিতে সকলেই এক বাক্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

মহারাজ বেগতিক দেখিয়া, তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য নানামতে চেষ্টা করিলেন। তমহুকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার বিশেষরূপ প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কোন ফলই হইল না। মনান্তরের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে, শুদ্ধ মিষ্ট বচনে ভুলিবার লোক কুকিরা নহে। তাহাদের শাদাসিদে যুক্তি এইরূপ;—তমহুর অনুরোধ মহারাজ যখন রাখিলেন না, তখন তাঁহার কথাই বা তমহু রাখিবে কেন? রাজশক্তির নামে তাহারা তত ভীত নয় যে, রাজকৃত কার্য্য বলিয়া এত অপমান সহ্য করিবে।

রাজকর, ব্যাগার বন্ধ হইয়া গেল—কুকিরা আর কোনরূপ রাজাজ্ঞারই বশবর্ত্তী রহিল না—কার্য্যতঃ বিদ্রোহী হইল। কাজেই তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য, সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু আশার বিপরীত ফল ফলিল। কুকিদের প্রচণ্ড তেজের কাছে মহারাজের সৈন্যগণ তিষ্টিতে পারিল না। রাজসৈন্যের অনেক মরিল ও অবশিষ্ট বন্দী হইল বা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিল। এই ঘটনায়, তমহুর স্পর্দ্ধার সীমা রহিল না।

তখন তাহাদের বিরুদ্ধে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ প্রেরিত হইলেন। পক্ষান্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর কুকিরাও, এ যুদ্ধ সাধারণ হিতার্থেও সকলেরই স্বার্থসাধক জ্ঞানে, তমহুর সহিত যোগ দিল। উভয় পক্ষে বার বার আক্রমণ ও তুমুল যুদ্ধ হইল। কুকিরা প্রকৃত বীর জাতির ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের সম্মুখে কতক্ষণ স্থির থাকিবে? পরিশেষে তমহু নিতান্ত হীন বল হইয়া, পলায়ন করিল। সেনাপতি তাহাকে অনতি বিলম্বে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তমহুর দল বল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদিগের কিছু মাত্রও অনিষ্ট না করিয়া, টিকেন্দ্রজিৎ তমহুকে লইয়া, অগ্রজ মহারাজের চরণে অর্পণ করিলেন। ইহাতে মহারাজ যে টিকেন্দ্রজিৎকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আপামর সাধারণের মধ্যে তাঁহার সুনাম কত যে বাড়িল, তাহা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক ইউরোপীয় রাজনীতি অনুসারে বিচার হইলে বিদ্রোহী তমহুর নিশ্চিতই প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু ধার্ম্মিক শূরচন্দ্র তাহার পরিবর্ত্তে তমহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে বাধ্যতা স্বীকার করিবে কি না? শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী তমহু নির্ভয়ে উত্তর করিল—না। অগত্যা তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে মহারাজ বাধ্য হইলেন। খেচর পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন ভ্রমণকারী এবং পার্ব্বত্য বিমল বায়ু সেবনে অভ্যস্ত তমহু সর্দ্দারের পক্ষে অন্ধকূপ কারাবাসে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল। তদবস্থায় প্রায় দুই মাস অতীত হইবার পর, একদিন সুযোগমত মহারাজের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাঁহার নিকট যোড় করে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও মুক্তি ভিক্ষা করিল। মহারাজ তৎপূর্ব্বেই যে তমহুর অসন্তোষের কারণ সেই কর্ম্মচারীকে দূরীভূত করিয়াছেন, তাহা বলিলেন; এবং তমহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে ভবিষ্যতে, বশবর্ত্তী

থাকিবে কি না? তমহু আহ্লাদিত হইয়া, তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিল; এবং মহারাজও তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দিতে কারারক্ষককে আদেশ দিলেন এবং নানারূপ সান্ত্বনা-বাক্যে তাহাকে বিদায় করিলেন।

এই রাজোচিত ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণে আন্তরিক বশীভূত ও কৃতজ্ঞ হইয়া তমহু সর্দ্দার তদবধি নির্দ্দিষ্ট রাজকর যথা নিয়মে প্রদান করিতেলাগিল এবং সেই হইতে কুকিজাতির হৃদয়ে মণিপুরেশ্বর দেবরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কুকিযুদ্ধের প্রায় এক বৎসর পরে (ইং ১৮২৮ সালে) যোগীন্দ্র সিংহ নামক এক ব্যক্তি, কাছাড়-প্রবাসী ৫০০ শত মণিপুরীকে সংগ্রহ করিয়া, শূরচন্দ্রের রাজ-সিংহাসন অধিকার অভিলাষে অগ্রসর হইতে-ছিল। সেখানকার ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহা অবগত হইয়া, প্রকৃত মিত্র রাজের কর্ম্মচারীর মত, তাহার প্রতিবন্ধকতা করিলেন। তাহাতে যোগীন্দ্রের কতক লোক জনের সহিত ইংরাজ সৈন্যের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই যোগীন্দ্র হত হইল।

বহিঃশত্রু এইরূপে বারম্বার অকৃত-কার্য্য ও দলিত হওয়াতে মণি-পুর রাজ্যের বল বিক্রম, বাহ্য দৃষ্টিতে অটুট থাকিয়া বরং বর্দ্ধিত ও দৃঢ়ীভূত হইলেও ভ্রাতৃবিরোধরূপ কালকূট সদৃশ আভ্যন্তরীণ চক্রান্তে শূরচন্দ্রের রাজসিংহাসনের তলভূমি যেন মূষিকছেদিত ভূখণ্ডবৎ শূন্য-গর্ভ হইয়েছিল। ভ্রাতৃগণের কয়েকবৎসর-ব্যাপী অবিরত মনান্তরে এখন রাজ পরিবারের মধ্যে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দল গঠিত হইয়াছে। এখন মহারাজ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, রাজ্যের মধ্যে ভৈরবজিৎ সিংহই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, কার্য্যদক্ষ, দূরদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও বিশ্বাস-পাত্র বলিয়াও মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কাজেই প্রজা

সেনার প্রায় সকল কথাই এখন তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ও অবিচার্য্য ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয় চন্দ্রকীর্ত্তির আমল হইতেই, যুবরাজের পদ ও মান সম্ভ্রম মহারাজের নীচেই গণ্য। তদনুসারে তাঁহার সময়ে শূরচন্দ্র অনেক দিন যুবরাজ ছিলেন এবং এখন তিনি মহারাজা হওয়াতে কুলচন্দ্র যুবরাজ হইয়াছেন। বিচার বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যুবরাজের অন্যতম কার্য্য। কুলচন্দ্র, স্বীয় কর্ত্তব্য যোগ্যতার সহিত সমাধা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পাকা সেনা তাঁহার কার্য্যে সহস্র দোষ বাহির করিয়া, তিনি এ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, মহারাজের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন। সুতরাং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নিতান্ত আবশ্যক ভাবিয়া মহারাজ বিচার-সচিব (জুডিসিয়াল জেনারেল) নামে একটি পদের সৃষ্টি করিয়া, ভৈরবজিতকেই তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে কুলচন্দ্র আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া বিশেষরূপেই ক্ষুন্ন হইলেন। মিঃ গ্রিমউড এই সময়ে পলিটিকেল এজেণ্ট ছিলেন। শুনা যায় তিনি নাকি ভৈরবজিতের মন্ত্রণায় ভুলিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কুমন্ত্রণা-রোপিত ও কুযত্ন-সিঞ্চিত বিষ বৃক্ষের স্বাভাবিক ফল ক্রমেই ফলিল।

বীরভাবাপন্ন সরল প্রকৃতির লোক সচরাচর কিছু উদ্ধত হইয়া থাকে। টিকেন্দ্রজিতের বিপক্ষেরা মিথ্যা রটনা করিল যে দুইজন মণিপুরী (ভ্রাতা) নিজের বাড়ীতে বসিয়া এক রাত্রে তাহার ভয়ানক নিন্দা করিতেছিল। তিনি স্বকর্ণে তাহা শুনিয়া পরদিন তাহাদিগকে ভয়ানক বেত্রাঘাত করেন এবং (সত্য কি না জানি না—কিন্তু গুজব উঠিল যে) তাহাতেই তাহাদের উভয়ের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

পরস্পরের ভৃত্য ও অনুগত লোক জন লইয়া, পূর্ব্ব হইতেই পাকাসেনার সহিত সেনাপতির বিশিষ্টরূপ মনান্তর ছিল। এখন আবার ঐ একটা ও অন্যান্য ছল ধরিয়া টিকেন্দ্রের নানা দোষের কথা ভৈরবজিৎ ও অন্যান্য লোক মহারাজের গোচর করিতে লাগিলেন; এবং "তিলকে তাল করিয়া" মহারাজের মন অত্যন্ত ভারি করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু মহারাজ টিকেন্দ্রজিতের প্রতি যত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ততই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে প্রায় সকল বৈমাত্রেয় ভ্রাতারাই টিকেন্দ্রজিতের দলরূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইলে, টিকেন্দ্রজিৎ তাহা নিজেরই ক্ষতি বিবেচনা করিতেন।

এক দিন অজেয় সিংহের সহিত ভৈরবের ভয়ানক বচসা হয়, উভয়েই বিস্তর কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন। আর এক দিন, (লোকে বলে) ভৈরবের পরামর্শেই মহারাজ শূরচন্দ্র, জিল্লাসিংহের বহির্গমন কালে, চির-প্রথানুযায়ী সম্ভ্রম-সূচক শিঙ্গা-ধ্বনি বন্ধ করিয়া দিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ জিল্লাসিংহের হইয়া মহারাজকে বিশেষ করিয়া বলাতেও কোন ফল হইল না। এই সকল বিষয়ের কতক বিবরণ ৯,১৩,২৯ ও ৩৪ নং দলীলে আছে। সে যাহা হউক, এইরূপে ক্রমে ক্রমে যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাকেই রাজপরিবারকে ধ্বংস করিয়া সোণার মণিপুরকে ছারখার করিয়া ফেলিল।

——

দশম অধ্যায়।

শূরচন্দ্রের পদ-ত্যাগ ও কুলচন্দ্রের অভিষেক।

পাঠক মহাশয়! এই অধ্যায়োক্ত বিষয়ের অনেক কথাই এই ইতিহাসের দলিল বিভাগে (বিশেষতঃ ৭ হইতে ১৪ নং মধ্যে) জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা এ স্থলে সে সমস্তের আভাস মাত্র দিয়া নূতন কথার আলোচনা করিব।

খৃঃ ১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বরের রাত্রি দ্বিপ্রহর গত—মহারাজ শূরচন্দ্র গভীর নিদ্রামগ্ন। এমন সময় কুমার অজেয় সিংহ (দোলয়াই হাজাবা) ও জিল্লাগম্বা কতিপয় অনুচর সঙ্গে মৈ লাগাইয়া অন্দর মহলের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মহারাজার শয়নপ্রকোষ্ঠের নিকটে উপনীত। ক্ষণপরে অবিরত বন্দুকের শব্দে পুরীসুদ্ধ জাগরিত ও চমকিত। তখনই গুলির অজস্র বোঁ বোঁ শব্দ। বিকট ধ্বনিতে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং নিমেষের মধ্যেই তিনি সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তান্ত উপলব্ধি করিলেন। নিকটে রাজ-তরবারি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অধিকন্তু তিনি যুদ্ধ-কার্য্যে কখনই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। অধিকাংশ সৈন্যই তখন স্ব স্ব আলয়ে, গ্রামান্তরে। তখন তাহারা রাজবাড়ীতে থাকিলেও কোন ফল হইত কি না সন্দেহ। যে সকল সৈন্য, রক্ষক, ও অনুচরাদি তখন প্রাসাদের মধ্যে ও তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারাও যে তখন তাঁহার সাহায্য করিবে, মহারাজের মনে এমন বিশ্বাসও হইল না। এদিকে তিনি মাথায় পাকড়ি জড়াইতে না জড়াইতেই, অজেয় সেনা প্রভৃতি প্রাসাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হই-

লেন। চতুর্দ্দিকে যে সকল গুলি চলিতেছিল তন্মধ্যে আসিয়া তাঁহার মস্তকে লাগে নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তখন বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে, তদপেক্ষা পলায়নই শ্রেয়ঃ। ফলতঃ চকিত, বিস্মিত ও ভয়বিহ্বলচিত্ত ব্যক্তির সাহস, বল ও আশাহীন হওয়া স্বাভাবিক। মহারাজ শূরচন্দ্র খিড়কির দ্বার দিয়া, ৩।৪ জন মাত্র অতি বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে, বাড়ীর বাহির হইলেন।

ঠিক এই সময়েই টিকেন্দ্রজিৎ আসিয়া অঙ্গের সেনা প্রভৃতির সহিত যোগ দিলেন। মহারাজের সহোদর ভ্রাতা কেশরজিৎ এবং গোপাল সেনা (পদ্মলোচন), তাঁহাদের অনুগত অনুচরগণের সহিত রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সৈন্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতিতে রাজপুরী লোকারণ্যময় হইয়া গেল এবং তাহাদের ভয়ানক কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইল।

ওদিকে মহারাজা প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, কেল্লা পার হইয়া যখন সংগেম্বন পুলের নিকট গিয়াছেন, সেই সময় তদীয় গুণধর সহোদর পাকাসেনা, স্বীয় কর্ম্মচারী মণিলাল দে ও ৮০ জন সুসজ্জিত সৈন্য সঙ্গে, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই শূরচন্দ্রকে রক্ষা করিতে আসিতেছিলেন। কিন্তু তখন আর রাজবাড়ী পুনঃ-প্রবেশের পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তিনি এবং পশ্চাতে তাঁহার ভ্রাতা প্রভৃতিরা সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে, (পড়িতে পড়িতে—উঠিতে উঠিতে) রেসিডেন্সি অভিমুখে দৌড়িলেন।

এদিকে সেনাপতি কেল্লা, বারুদখানা, খাজনাখানা প্রভৃতি সমস্তই হস্তগত করিলেন, এবং তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার যুক্তি করিয়া মহারাজের পক্ষ হইতে যদি কোন আক্রমণ হয়, তন্নিবারণের জন্য

সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সমবেত সকলেই বারম্বার "সেনাপতির জয়—সেনাপতির জয়" শব্দে নৈশ বায়ু কম্পিত ও গিরি, কন্দর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

যুবরাজ কুলচন্দ্র এই রাত্রেই (কি ভাবিয়া, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশ নাই—বোধ হয়, হেঙ্গামে লিপ্ত না থাকা অভিপ্রায়ে) কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে, রাজবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

অকস্মাৎ মণিপুরের মধ্যে যেন প্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত ভয়ানক গোলযোগেও (অসাবধানতা বশতঃ একজন প্রহরীর গাত্রে সামান্য তরবারির চোট ভিন্ন) কাহাকেও কোনরূপ আঘাত মাত্রও লাগে নাই—হতাহত হওয়াত্ দূরের কথা। ইহা নিশ্চয় যে, কাহারও প্রাণ হানি করা টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। সে যাহাই হউক, ইহা যে প্রকার কৌশলে সাধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদিও কার্য্যটি ধর্ম্মনীতির বিরোধী, তথাপি অনুষ্ঠাতাগণের নৈপুণ্য স্বীকার করিতেই হইবে।

রাজ বাড়ীর অনতিদূরেই রেসিডেন্সি অবস্থিত। সুতরাং বন্দুকের শব্দ ও জনতার কোলাহল তথা হইতেও শ্রুত হইয়াছিল। বন্দুকের শত শত গুলি রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণে পড়িয়াছিল, ঘরের খড়খড়িতে লাগিয়া সার্সি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়াছিল। ইহাতে মিঃ গ্রিম্‌উডের নিদ্রাভঙ্গ হইবে আশ্চর্য্য কি? তিনি গাত্রোত্থানের পর রাজ ভবনের দিকে চাহিয়া দেখিয়া গোলের কারণ বুঝিতে পারিলেন কি না, অর্থাৎ এই বিদ্রোহের পূর্ব্বাভাস তিনি কিছু পাইয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু শুনা যায়, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের রক্ষী সৈনিকগণকে সুসজ্জিত হইতে ও সতর্ক-প্রহরিতা করিতে আদেশ

দিলেন এবং লেংথোবালে যে সকল ইংরাজ সৈন্য ছিল, তাহাদের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ইহা স্বাভাবিক, কি জানি কিসের গোল, আত্মসারা নিতান্তই কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজপুরীতে দূত পাঠাইয়া সঠিক তথ্য জানিবার উপায় কেন করিলেন না, ইহাই আশ্চর্য্য।

রাত্রি প্রায় ২॥০ টার সময় মহারাজ, তাঁহার সহোদর পাক্কা সেনা ও অনুষঙ্গীগণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইলেন। শূরচন্দ্র এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়া ছিলেন যে, গ্রিমউডের প্রশ্নের ভাল উত্তরই দিতে পারিলেন না। মিঃ গ্রিমউড মহারাজের থাকিবার জন্য রেসিডেন্সির দরবার ঘরটি ছাড়িয়া দিলেন এবং সেই ঘরেই তিনি অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে, মহারাজের অনুরক্ত সৈন্যগণ ও প্রজারা—কেহ সুসজ্জিত হইয়া, কেহ বা যেমন ছিল, সেইরূপ দলে দলে আসিয়া রেসিডেন্সি প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই অধ্যায়ে প্রথমাবধি যে সকল কথা আমরা লিখিয়াছি, সে গুলি বিশ্বাস-যোগ্য। কিন্তু তদ্বাদে সমস্তেরই মহাগোল। মিঃ গ্রিমউডের কথার সহিত, মহারাজ শূরচন্দ্রের কথার নানা স্থানে মিল নাই।

মিঃ গ্রিমউড নিজ রিপোর্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে;—মহারাজকে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া, আমি তখনই পাক্কা সেনাকে কতকগুলি সৈন্য লইয়া রাজধানী পুনরায় দখল করিতে—নিদান পক্ষে (ম্যাগেজিন) বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রাগার আয়ত্বাধীনে রাখিতে বলিলাম। তিনি সাহস করিলেন না। আমি তাঁহাকে বহু ভৎসনা করিলাম। অবিলম্বেই মহারাজের অপর দুই জন সহোদর সামুহাঞ্জাবা (কেশরজিৎ) ও গোপাল সেনা (পদ্মলোচন) কর্ণেল সামু-

বৃদ্ধমন্ত্রী থঙ্গাল জেনারেল।

১০৮ পৃষ্ঠা।

সিংহ, থালারাজা, মেজর জাম্বুবানসিংহ, থঙ্গেল জেনারেল এবং কতক-গুলি মণিপুরী কয়েকটি বন্দুক লইয়া উপস্থিত হইল। ইতি কর্ত্ত-ব্যতা বিষয়ে নানা যুক্তি তর্ক হইতে লাগিল।

কিন্তু বহু পরামর্শেও কিছুই স্থির না হওয়ায় থঙ্গাল জেনারেল বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ! যদি আপনার মান ও রাজপদ বজায় রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই চলুন—সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজবাটী পুনরধিকার ও ম্যাগেজিন রক্ষা করি। আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিতে, আপনার ভয় কি? আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণের অধীনেও আমি কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি; তাঁহারা সকলেই আমার পরামর্শ লইতেন—আপনিও আমার কথা শুনুন ইত্যাদি। কিন্তু মহারাজা যুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন না। টিকেন্দ্র-জিৎ ম্যাগেজিন দখল করিয়াছিলেন—তাহা রক্ষা বা পুনরধিকার করা সহজ না হইলেও, যোদ্ধা পুরুষের সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ছিল। নানারূপ বৃথা কথা হইতে লাগিল—কিন্তু কার্য্যে কেহই অগ্রসর হইলেন না। এই সময়ে টিকেন্দ্রজিৎ সহস্তে কারা-গারের দ্বার খুলিয়া সমস্ত বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তাহারা কেহই কোনরূপে তাঁহার সাহায্য করে নাই।" ইত্যাদি।

কিন্তু মহারাজা শূরচন্দ্র ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত দিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে যে;—"আমি যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলাম এবং সকল লোকেই আমাকে সাহায্য করিতে উদ্যত ছিল। কিন্তু মিঃ গ্রিমউড সে পক্ষে মত দিলেন না। অধিকন্তু রেসিডেন্সি রক্ষকগণের দ্বারা আমার অনুগত সৈন্যগণকে তিনি নিরস্ত্র করিলেন। কারামুক্ত কয়েদীরা টিকেন্দ্রজিতের পক্ষে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিল।" ইত্যাদি।

তৎপরে গ্রিমউড বলিতেছিলেন যে, "মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন এবং কোনরূপ নিষেধই শুনিলেন না। আর মহারাজার বৃন্দাবন যাইবার কথা শুনিয়া আমিও বিস্মিত হই নাই। কেননা, সেই স্থানে ৪০০০ হাজার বিঘা ভূমি ক্রয় ও তাহাতে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক নিজে সেই স্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা তিনি পূর্ব্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বৃন্দাবনে বাস করিবার কথা শূরচন্দ্র পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন বলিয়াই যে সেই বিপদের সময়েই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার বাসনা হইবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। যদিও ধার্ম্মিক হিন্দুর পক্ষে বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া ব্রজবাস সঙ্গত বটে, কিন্তু ঘোর বিদ্রোহকালে সাধ্যমত তন্নিবারণের চেষ্টা না করিয়াই, বৃন্দাবন যাওয়ার (কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত) সম্ভাবনা অল্প। সেই বিশেষ কারণ, (মহারাজার বর্ণনায়) সাহেবের প্রতিকূলতা-ভাব। অর্থাৎ যখন দেখিলেন যে, শুদ্ধ ভ্রাতারা নহে, বড় আশার স্থল রেসিডেন্ট সাহেবও বিপক্ষ, তখন ঘৃণাজনিত ধিক্কার ও বিবেক হৃদয় মধ্যে দেখা দিল।

আবার মহারাজা টিকেন্দ্রজিৎকে যে পত্র লিখিয়াছেন, (দলীন ৭) তাহাতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, যুদ্ধ করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার করিবার "আশা আমার নাই," কিন্তু সে পক্ষে তাঁহার ইচ্ছা যে কি ছিল, তাহা তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। মণিপুরী বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবনকে মহাতীর্থ জ্ঞান করেন এবং কেহ তথায় যাইবার প্রস্তাব করিলে, পরম শত্রুতেও তখন তাঁহার প্রতি বৈরিতাচরণ করে না, বরং যথাসাধ্য আনুকূল্যই করিয়া থাকে। শূরচন্দ্রের তখন চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রু এবং অর্থেরও সম্পূর্ণ অনাটন সুতরাং বৃন্দাবন যাত্রার ভাণ করিয়া

বিপক্ষতার তীব্রতা কমাইয়া ইংরাজের আশ্রয়ে আসিবার প্রকৃত মতলব ছিল কি না, বিচক্ষণ পাঠক বিবেচনা করিবেন।* আর কোন্ ঘটনার পরেই বা বৃন্দাবন যাইবার কথা তুলিলেন, তাহাও নিম্নোদ্ধৃত পত্রখণ্ড পাঠে বেশ বুঝা যাইবে।

গ্রিমউড সাহেব চিফ কমিশনারকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকখানি আমরা দলীলে দিয়াছি। কিন্তু এইখানি বড়ই গুপ্ত-রহস্যময়, এজন্য এইখানে দিলাম। তিনি চিফ কমিশনারকে ঠিক এইরূপ লিখিয়াছিলেন।—

"অপরাহ্নে রেসিডেন্সিতে এত অধিক সংখ্যক মণিপুরী একত্র হইল যে, আমি তাহাদের অনেককে (বিশেষতঃ অস্ত্রধারীগণকে) জিদের সহিত বিদায় করিলাম। যেহেতু কোন্ মণিপুরী মহারাজের পক্ষ, আর কেইবা বিপক্ষ, তাহা রাত্রে নির্ণয় করা, আমাদের সিপাহীগণের পক্ষে অসম্ভব হইত, এবং তাহাদের মধ্যে কোন একজন বন্দুক ছুড়িলে, অন্ধকারে মহা বিভ্রাট ঘটিত। রাত্রে রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কাও না হইতেছিল. এমত নয়। তদবস্থা ঘটিলে, যাহাতে সেসব রক্ষা পায়, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত মিঃ বার্কলি পূর্ব্ব হইতেই করিলেন এবং তাহারই পরামর্শক্রমে আমি পূর্ব্বোক্ত মত কার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে মহারাজার মনে যে অত্যন্ত কষ্ট হইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন লোকে বলিবে যে, আমি তাঁহাকে বন্দী করিয়াছি। তৎপরেই তিনি গদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনাবস্থায় বৃন্দাবন গমনের কথা প্রথম উত্থাপন করিলেন।"

---

* মহারাজ শূরচন্দ্র নিঃসম্বলে রাজবাটী হইতে বহির্গত হয়েন। বৃন্দাবন যাইবার ব্যয় স্বরূপ কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহাকে লক্ষ্মীপুরে ১০০০, কাছাড়ে ১৫০০, গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারির হাত দিয়া ১৫০,০ এবং আসামের চিফ কমিশনারের দ্বারা ৩০০০, সর্ব্ব সাকল্যে এই সপ্ত সহস্র মুদ্রা ক্রমশঃ পাঠাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যৎকালে তিনি রেসিডেন্সি হইতে চোরের মত কাছাড় যাত্রা করেন, তখন তাঁহার শোকার্ত্ত প্রজাবৃন্দ দুই তিন হাজার টাকা (স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত) নজর দিয়াছিল।

এই পত্রে সত্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক! বুঝিলেন কি, কেমন তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া—স্বেচ্ছায় বিরাগী হইয়া চিরদিনের মত বৃন্দাবন-বাসের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

গ্রিমউড সাহেব পলিটিকেল এজেন্টের পদে বাহাল হইয়া মণিপুরে যাইবার পরেই, প্রথম প্রথম পাকা সেনাকে ভালবাসিতেন এবং মহারাজের প্রতিও অনুকূল ছিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই গ্রিমউড জানিতে পারিলেন যে, শূরচন্দ্র অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী। প্রতিদিনই বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি ঈশ্বর আরাধনা ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; এবং রাজকার্য্যাপেক্ষা ধর্ম্মকর্ম্মেই অধিক মনোনিবেশ করেন। ইহা অবশ্যই মহাদোষ।

অধিকন্তু শুনা যায়, ব্রিটিশ রেসিডেন্সির রক্ষক-সৈন্যসংখ্যার বৃদ্ধি বা ইংরাজের এতদ্রূপ অন্যান্য সুবিধাজনক কার্য্যে, মহারাজ অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা করুন বা না করুন, ইটি নিশ্চয় যে, আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্য সম্বন্ধে তিনি কখনই গ্রিমউডের মতামতের অপেক্ষা করিতেন না। একবার গ্রিমউড সাহেব মণিপুরী ভদ্রমহিলাগণের ছায়াচিত্র (ফটোগ্রাফ) লইতে ইচ্ছুক হইয়া, মহারাজের অনুমতি ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারাজ হিন্দু-কুলগৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রকৃত স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর ন্যায় তাহাতে (প্রতিবাদপূর্ব্বক) মত দিলেন না। শেষে টিকেন্দ্রজিৎ যোগাড় যন্ত্র করিয়া গ্রিমউডের সেই মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

টিকেন্দ্রজিতের সহিত গ্রিমউডের ক্রমে ক্রমে গাঢ় প্রণয় হইয়াছিল। দুজনে একত্রে শিকারে যাইতেন এবং অনেক সময় সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতেন ও একত্রে বেড়াইতেন। বিবি গ্রিমউডের সহিতও টিকেন্দ্রজিতের বেস সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে গ্রিমউডের

সহিত কোন পরামর্শ বাদ হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে কাপ্তেন হিয়াসে সম্প্রতি যে পুস্তিকা বিলাতে বাহির করিয়াছেন, তাহাতে সেরূপ আভাস স্পষ্ট থাকিলেও আমরা তাহা ইতিহাস-গ্রাহ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি না—সে পুস্তিকা আমরা দেখিও নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, হয় তো গ্রিমউডের ভাবগতিকে অঙ্গেয় সেনা প্রভৃতি বিশেষ প্রোৎসাহিত হইয়া থাকিবেন। অন্ততঃ টিকেন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, গ্রিমউডের দ্বারা তাঁহার কোনরূপ অনিষ্টই হইবে না। বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া যে তিনি নিতান্ত অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চমৎকার ব্যাপার এই যে, গ্রিমউড তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা (একটি কথাও) লিখেন নাই। আবশ্যক হইলে ২০০ শত সৈন্য চাহিতে, চিফ্ কমিশনার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন (৬ দলীল দেখুন); কিন্তু তাহা তিনি চাহিয়া পাঠান নাই—বেশী সৈন্যের দরকার বলিয়াও জানান নাই। তিনি যুবরাজ কুলচন্দ্রকে মহারাজ বলিয়া স্বীকার করা বিষয়ে চিফ্ কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এবং তিনি শূরচন্দ্রকে মণিপুর ছাড়া করিয়া, তবে যেন প্রাণে শান্তি লাভ করিলেন, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায় (দলীল ৯।১০।১৫)।

২৩ শে সেপ্টেম্বর (১৮৯০) প্রাতে, শূরচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎকে পত্র লেখেন যে তিনি "একবার বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছুক"। টিকেন্দ্রজিতের সবিনীত সম্মতি-সূচক উত্তর-পত্রখানিও আমরা ৮ নং দলীলের মধ্যে দিয়াছি। গ্রিমউড তৎপরে রাজবাড়ীতে গেলেন। যুবরাজ কুলচন্দ্রকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। কুলচন্দ্র তখন কাছাড়া-

ভিমুখে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গ্রিমউড ফিরিয়া আসিয়াই শূরচন্দ্র ও ভৈরবজিৎ যাহাতে অবিলম্বে বিদায় হন, তজ্জন্য বড়ই জিদ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, ভৈরবই যত অনিষ্টের মূল। সুতরাং তাঁহাকে মহারাজ সঙ্গে লইয়া আইসেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই বার বার বলিতেছিলেন। গ্রিমউডের ফিরিবার পরেই তাঁহাদের সকলের যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল।

ওদিকে কুলচন্দ্র ধ্বজ ফিরিয়া আসিয়া একটি প্রকাশ্য দরবারে আপনাকে মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ ও অঙ্গেয় সেনা প্রভৃতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যুবরাজ কুলচন্দ্র মহারাজ হইলেন, কাজেই টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজের পদ পাইলেন এবং অঙ্গেয় সেনা সেনাপতি হইলেন।

সেই দিন (বাঙ্গালা ১২৯৮ সালের ৮ই আশ্বিনে) রাত্রি ৭৷৷৹ টার সময়, নিজের তিনটি সহোদর ভ্রাতা, ৬০ জন অনুচর ও গ্রিমউডের প্রদত্ত ৩৫ জন গুর্খা সৈনিক সমভিব্যাহারে মণিপুরেশ্বর মহারাজ শূরচন্দ্র স্বীয় রাজপাট ছাড়িয়া চলিলেন। তখন তিনি দুই দিন নিরম্বু উপবাসী; যেহেতু সাহেবের বাটী—ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ—বলিয়া জলগ্রহণও করেন নাই।

শূরচন্দ্রের বিদায়কালে মণিপুর সহরে যে হৃদয়-বিদারক শোকাবহ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা জগতের ইতিহাসে রাজগণের শিক্ষার বিষয়রূপে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

দলে দলে রাজভক্ত মণিপুরী প্রজা আসিতেছে—প্রিয়তম রাজ্যেশ্বরের অকস্মাৎ দেশ-ত্যাগ দেখিয়া কাঁদিতেছে, হাহাকার করিতেছে অনেকেই সজল নয়নে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক সাধ্যমত ভেট আনিয়া মহারাজচরণ সমীপে রাখিতেছে। প্রজাদুঃখে কাতর প্রজাবৎসল ধার্ম্মিক শূরচন্দ্র বাষ্প-গদগদ-স্বরে সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছেন এবং নানা ভাবে

মহারাজ কুলচন্দ্র।

১১৪ পৃষ্ঠা।

বীর হৃদয় ঘোর আন্দোলিত হইলেও নিজ মনকে ধৈর্য্যবন্দে বাঁধিয়া সন্তান তুল্য প্রজা-মণ্ডলীকে নানামত প্রবোধ দান করিতেছেন, এই দৃশ্য ও তখনকার অবস্থা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হয়।

আবার যখন আপন সর্ব্বনাশের নিদানভূত এবং বিদ্রোহী-নেতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা টিকেন্দ্রজিৎকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিলেন এবং তাঁহাকে কতকগুলি আবশ্যকীয় চাবি ও রাজপ্রসাদ-স্বরূপ রত্নাভরণাদি নিজ অঙ্গ হইতে খুলিয়া প্রদান করিলেন—যখন, নবভূপতি কুলচন্দ্রের উদ্দেশে শুভ প্রার্থনা ও আশীর্ব্বচনের সহিত রাজপরিচ্ছদ ও রাজতরবারি স্বদেহ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক দিয়া চলিলেন, তখন—হায়! তখন কি অনির্ব্বচনীয় সুবিমল স্বর্গীয় সকরুণ ভাবে দর্শক মাত্রেরই অন্তর দ্রবীভূত হইল—ঠিক যেন সর্ব্বলোকাভিরাম রামচন্দ্র অনুজ ভরত উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ ও রাজ্যভার দিয়া যেরূপে বনে গিয়াছিলেন, আজিও অভিন্ন সেইরূপ শোচনীয় ভাব ঘটিল।

এইরূপে শূরচন্দ্র নির্ব্বাসিত ও কুলচন্দ্র তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বৃদ্ধসচিব থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতি নূতন রাজার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। মণিপুরী প্রজারাও বিনা আপত্তিতে নব ভূপতির শাসনাধীনে শান্তি, সুখ, ও সন্তোষে কাল যাপন করিতে লাগিল। তাঁহার শাসন বা বিচার-বিতরণাদি কোন বিষয়ে কোন বিরুদ্ধবাদ বা অখ্যাতির কথা মাত্রেই শুনা গেল না। ভারতের প্রজাপুঞ্জ যে কিরূপ নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় তাহার অকাট্য প্রমাণ এইবার আবার জগৎ সমক্ষে মণিপুরীরা প্রদান করিল।

একাদশ অধ্যায়।

মণিপুর-মহাবিভ্রাটের সূচনা।

রাজ্যভ্রষ্ট শূরচন্দ্র, আসামের চিফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় শিলচরে আসিলেন। কিন্তু নিরাশ হইলেন, যেহেতু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই কুইণ্টন সাহেব স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তখন শূরচন্দ্র কলিকাতায় আসাই স্থির করিলেন।

আসাম চিফ কমিশনারের প্রধান সেক্রেটারি 'কলিকাতার পুলিস-কমিশনারকে তার যোগে এই সংবাদ পাঠাইয়া রাজার সঙ্গে পুলিস-ইনিস্পেক্টর মোতায়েন দেন। এখন পাকতঃ মহারাজ শূরচন্দ্র "রাজ-বন্দী" (State-prisoner) পুলিস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার পুলিস-কমিশনারের হস্তে সঁপিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

শিলচরে আসিয়া শূরচন্দ্র যখন জানিতে পারিলেন যে, পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ গ্রিমউড, তাঁহার সঙ্গে (ইংরাজী ভাষায় লিখিত) যে পাশ দিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, "মহারাজা স্ব-ইচ্ছায় যুবরাজকে রাজপদ প্রদান করিয়া গেলেন" তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ৬ই অক্টোবর (অর্থাৎ ২০শে আশ্বিন) তারিখে, গ্রিমউড ও আসামের চিফ কমিশনর সাহেবকে তারযোগে সংবাদ দিলেন যে, "তিনি একবারে রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিবার কথা কখনই বলেন নাই—একবার বৃন্দাবন যাইতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।" (দলীল ৭)

বস্তুতই তিনি টিকেন্দ্রজিৎকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ চিরদিনের মত রাজপদ পরিত্যাগ করা কোন মতেই হইতে পারে না।

চীফ্ কমিশনর কুইন্টন।

১১৬ পৃষ্ঠা ॥

আর রাজতরবারি ও পরিচ্ছদাদি অর্পণ করার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, সেগুলির প্রয়োজন হইবে—পক্ষান্তরে মণিপুরের সীমার বাহিরে সে সকল তাঁহার কোন কার্য্যেই লাগিবে না। ইহাতে তাঁহার সুবুদ্ধি ও সদাশয়তাই প্রকাশ পাইতেছে।

কুলচন্দ্রকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য মিঃ গ্রিমউড কুইণ্টনকে যে অনুরোধ করেন, তদুত্তরে কুইণ্টন লিখেন যে, "গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কুলচন্দ্রকে রাজ-অছি (Regnt) বলিয়া স্বীকার করিবে।" (দলীল—৯)

কুলচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ১৫ই আশ্বিনে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেলকে মঞ্জুরীর নিমিত্ত লিখেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মণিপুর যখন স্বাধীন রাজ্য, তখন ইংরাজ গভর্ণমেন্‌টের মঞ্জুরীর প্রার্থনা কেন? বস্তুতঃ রাজছত্র-দণ্ড গ্রহণ কালে ইংরাজের প্রতিনিধি গ্রিমউড সাহেবের অপেক্ষাও তিনি করেন নাই; তথাপি মণিপুর দুর্ব্বল, সুতরাং প্রবল ভারত-সাম্রাজ্যাধিপের মুখ চাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই সঙ্গত। অধিকন্তু সর্ব্বত্র (ইউরোপেও) চিরপ্রথা এই যে, নব রাজপদে যিনি যখন অভিষিক্ত হন (বিশেষতঃ বিপ্লবে), তাঁহাকে তখন মিত্ররাজবর্গকে সে সংবাদ দিয়া তাঁহাদের মঞ্জুরী অভিপ্রায় সংগ্রহ করিতে হয়। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যাধিপতি বলিয়া স্বীকার না করিলে বিরোধ বাধে।

এদিকে শূরচন্দ্র স্বীয় রাজ্য উদ্ধারার্থ ইংরাজের সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কলিকাতা হইতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও আসামের চিফ কমিশনরকে যে পত্র লিখিলেন, তাহার কিয়দংশ ১২ নং দলীলে আছে। ভারত-গভর্ণমেণ্টেরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে পুনঃ স্থাপিত ও টিকেন্দ্রকে দেশান্তরীত করেন। কিন্তু মিঃ গ্রিমউড শূর-

চন্দ্রের সাক্ষাৎ শনি স্বরূপ। তিনি চিফ কমিশনার কুইণ্টনকে এবং তদনুসারে কুইণ্টন গভর্ণমেণ্টকে বার বার লিখিতে লাগিলেন যে, দুর্ব্বল-চিত্ততা জন্য রাজ্য-শাসন পক্ষে শূরচন্দ্র নিতান্তই অনুপযুক্ত। এই ভাবের কথা গ্রিমউড পুনঃ পুনঃ খুব জোরে লিখিয়া কুইণ্টনকে বিগ্‌ড়াইয়া দিলেন। আবার কুইণ্টনের জোর লেখাতে গভর্ণমেণ্টেরও শূরচন্দ্র সম্বন্ধে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হইল। কাজেই গভর্ণমেণ্টের মত ও আদেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া শূরচন্দ্রকে পরিবর্জ্জন ও কুলচন্দ্রকে নিগড় বন্ধনে ফেলিয়া সিংহাসন দান, এইরূপ অভিপ্রায়ই দাঁড়াইল। কুইণ্টনের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, টিকেন্দ্রজিতের রীতিমত বিচার করিয়া তৎপরে তাঁহাকে ন্যায্য শাস্তি দেওয়া হউক। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি বিনা বিচারেই টিকেন্দ্রের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার সংকল্প করিলেন। এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে যে সব লেখালেখি হইয়াছিল, তাহা দলীলবিভাগে প্রকাশ করা গেল। (দলীল ১৫।১৬।১৭।১৮)

পরিশেষে ধার্য্য হইল যে, (১ম) যদি কুলচন্দ্র মণিপুরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে ৩০০ রক্ষক সৈন্য রাখিতে দেন (২য়) পলিটিকেল এজেণ্টের পরামর্শ-মতে রাজকার্য্য করিতে সম্মত হন এবং (৩য়) টিকেন্দ্রজিতের নির্ব্বাসনের অনুমোদন ও তৎপক্ষে সাহায্য প্রদান করেন, তবে তাঁহাকেই ভারত গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের মনে বিলক্ষণ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এ সকল প্রস্তাবে দুর্ব্বল কুলচন্দ্র অবশ্যই সম্মত হইবেন। যদি তিনি স্বীকৃত না হন, তদবস্থায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, তাহা তাঁহার চিন্তার বিষয় বলিয়া একবারও মনে করেন নাই। নচেৎ কুলচন্দ্রের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই

কুইণ্টন যখন ওদিকে সসৈন্যে মণিপুরে পৌছেন, সেই সময়ে (২১ শে মার্চ্চ দিবসে) এ দিকে শূরচন্দ্রকে লেখা হইবে কেন যে, "তিনি আর রাজত্ব পাইবেন না—কুলচন্দ্রকেই মহারাজা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন। এবং যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে উচিত মত শাস্তি দেওয়া যাইবে। তাঁহাকে বৃত্তি-ভোগী হইয়া গভর্ণমেণ্টের মনোনীত স্থানে থাকিতে হইবে।" (দলীল২০)

এ স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, এ সিদ্ধান্তের ন্যায় আশ্চর্য্য মীমাংসা প্রায় আর দেখা যায় না। "এত বড় স্পর্দ্ধা—তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়! যাহারা তোমার এ দশা করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব—কিন্তু তোমার এই দশাই থাকিবে—তুমি আর রাজ্য পাইবে না!" কি আত্ম-যুক্তি-বিরোধী চমৎকার বিচার! কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় তো অতলস্পর্শ গভীর রাজনৈতিক তত্ব-সাগরের তলা দেখিতে পায় না—রাজতান্ত্রিক ন্যায়শাস্ত্র অবশ্যই দারুণ দুরধিগম্য।

হায়! ইংরাজের পরম প্রিয়-চিকীর্ষু ও সম্পদে বিপদে সাহায্য-কারী প্রিয় মিত্র চন্দ্রকীর্ত্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপদে পড়িয়া শরণাগত হইয়া বড়লাট বাহাদুরের সাহায্য ভিক্ষায় এত যে বিনীত প্রার্থনা করিলেন, তাহার এই ফল ফলিল! সেই মিত্রভূপতির দ্বিতীয় পুত্রের গলে অজ্ঞাতপূর্ব্ব কঠোর নিগড় বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার অপর পুত্র টিকেন্দ্র-জিৎকে জন্মভূমি-রূপ স্বর্গচ্যুত করিতে চিফ কমিশনার কুইণ্টন বাহাদুর ৭ই মার্চ্চ গোলাঘাট হইতে মণিপুরাভিমুখে শুভ (বা অশুভ) যাত্রা করিলেন। তাঁহার রক্ষীরূপে কর্ণেল স্কীনের অধীনে আসামের চারি-শত সংখ্যক বন্দুকধারী গুর্খা সৈনিক চলিল। শিলচর হইতে আরও ২০০ গুর্খা সৈন্য মণিপুর যাইবার কথাও স্থির হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছিলেন যে, টিকেন্দ্রজিৎ কোনরূপে প্রতি-রোধকতা করিতে এবং গোল বাধাইতে না পারেন, এমত কোন কৌশলপূর্ণ 'উপায়ে তাঁহাকে হস্তগত ও নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, (১৮নং দলীল দেখুন)। অতএব তাঁহার ভাবগতিক জানিবার জন্ত, কুইণ্টন, নিজের অধীনস্থ এসিষ্টাণ্ট কমিশনার গর্ডন সাহেবকে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউডের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ভাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া কইরং নামক স্থানে ১৮ই মার্চ্চ দিবসে চিফকমিশনারের সহিত পুনঃমিলিত হইলেন। গ্রিমউডসাহেব মিঃ গর্ডনকে বলিয়াছিলেন যে "টিকেন্দ্রজিৎ কখনই আত্মসমর্পণ করিবেন না—তাঁহাকে ধৃত করাও সহজ নহে" ইত্যাদি। কুইণ্টন গর্ডনের মুখে এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, গভর্ণর জেনারেলের আদেশ জ্ঞাপনার্থ দরবারের ভাণ করিয়া চাতুরীতে তাঁহাকে তথায় আনিয়া গ্রেপ্তার করাই সুপরামর্শ। তিনি এতৎ সম্বন্ধে সেই তারিখে লাট সাহেবের নিকট যে তারের সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহা (২০ নং দলীলে দেখুন।) ২১ শে মার্চ্চ গভর্ণমেণ্ট তারযোগে তাঁহার প্রস্তাবের মঞ্জুরী আদেশ পাঠান। এদিকে গর্ডনের পরামর্শমতে, গ্রিমউডকেও আগু বাড়াইয়া আসিবার জন্য কুইণ্টন সংবাদ দিলেন। এই দিনই কুইণ্টন সদলে ইম্ফাল হইতে কয়েক মাইল দূরে মণিপুর রাজ্যান্তর্গত সেঙ্গমাই গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রিমউডও আসিয়া পৌঁছিলেন। টিকেন্দ্রজিতের নির্ব্বাসন সম্বন্ধে উভয়ে তর্কবিতর্ক চলিয়া শেষে কুইণ্টন দরবারে গ্রেপ্তার করিবার কথা, গ্রিমউডকে খুলিয়া বলিলেন। গ্রিমউড যে টিকেন্দ্রজিতের অনিষ্ট সম্বন্ধে মত দিবেন না, তাহা কে না বুঝিতেছেন? সুতরাং কুইণ্টনের সহিত

কর্ণেল স্কীনে।

১২০ পৃষ্ঠা।

তাঁহার মতৈকতা ঘটিল না। কিন্তু তিনিঅধীনস্থ কর্ম্মচারী—কুইন্টনের মতের পরিবর্ত্তন কিছুই করিতে পারিলেন না। অবিলম্বেই তিনি মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন। (দলীল ২৮।২৯।)

সে দিন প্রাতে ইংরাজ-পক্ষীয় এই সকল প্রধান ব্যক্তি সেঙ্গমাইতে উপস্থিত ছিলেন ;—আসামের, চিক কমিশনার কুইন্টন, পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড, এসিষ্টাণ্ট কমিশনার লেঃ গর্ডন, চিফ কমিশনারের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী কসিন্স, এসিষ্টাণ্ট কমিশনর মিঃ উড্‌স্‌, আসাম টেলিগ্রাফ বিভাগের মিঃ মেলভিল ও উইলিয়মস, কর্ণেল স্কীনে, কাপ্তেন বুচার, লেফটেনাণ্ট চেটার্টন, এড্‌জুটেণ্ট লেঃ লুগার্ড, কাপ্তেন বইলো, লেঃ সিম্‌সন, লাটকাউন্সিলের তৎকালীক সমর-সদস্যের ভ্রাতুষ্পুত্র লেঃ ব্রাকেনবরি, ডাক্তার কালভার্ট। তদ্বাদে, ৪০০ গুর্খা সৈন্য এবং সকলের খানসামা ও পাচক ইত্যাদি। ঘোড়ার সইস ও বাহক মজুর প্রভৃতি রেসেলাও বিস্তর সেই দলে অনেক ছিল।

মণিপুর রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল এবং মহারাজ কুলচন্দ্রও প্রকৃত হিন্দুরাজার মত রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারেন নাই। কেন না এ পর্য্যন্ত তিনি গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন। নিজের লিখিত পত্রের কোন উত্তরও লাটসাহেবের নিকট হইতে পান নাই। অধিকন্তু শূরচন্দ্র পুনরায় রাজ্যলাভের জন্য যে বারম্বার লাট সমীপে দরখাস্ত করিয়াছেন, সে সংবাদও তিনি রাখিতেন। আবার নবযুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ কলিকাতা হইতে তারযোগে একটি সংবাদ পান। তাহার মর্ম্ম এই যে, "অনতি বিলম্বেই মণিপুরে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র শিকার করা হইবে।" "A large tiger is shortly to be bagged in Manipur ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের কর্ম্মচারী বা এজেণ্ট যেমন

সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকে, মণিপুরেরও সেইরূপ লোক তথায় আছে। অনুভব হয়, এই তারের সংবাদ সেইরূপ লোকেই পাঠাইয়া থাকিবে।

ঐ তারের সংবাদ ব্যতীত চিফ কমিশনারের আগমনের ১৫।১৬ দিন পূর্ব্ব হইতে, মণিপুরে নানারূপ জনরব উঠিতেছিল। তন্মধ্যে একটি রটনা এই যে, মহারাজ শূরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৮০০ সৈন্য সহিত আসামের চিফকমিশনার তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করিতে আসিতেছেন। সুতরাং রাজদরবারেও নানারূপ কল্পনা ও যুক্তি পরামর্শ চলিতে লাগিল। স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট বা পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ত্তৃক এসম্বন্ধে সঠিক সমাচার রাজদরবারে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা তাহার কিছুই করেন নাই। অধিক কি, চিফ কমিশনারের প্রেরিত গর্ডন সাহেবের মুখে সেনাপতির নির্ব্বাসনাজ্ঞা ও তৎসাধনার্থ চিফ কমিশনারের সসৈন্যে আগমনের কথা গ্রিমউড সমস্তই জ্ঞাত হইবার পরেও তিনি টিকেন্দ্রজিতের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুতা-ভাবেই চলিতেন—এক দিন একত্রে মৃগয়া করিতেও গিয়াছিলেন। তথাপি ঐ সব গুরুতর সংবাদের বিন্দুমাত্রও ব্যক্ত করেন নাই। ইংরাজরাজপুরুষগণের অন্তরে বাহিরে কত যে অনৈক্য, তাহা মণিপুরের কাণ্ডে বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক, তাহারা না বলিলেও চিফ কমিশনারের সসৈন্যে আগমন বার্ত্তা রাজদরবার বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শূরচন্দ্র যে সে সঙ্গে ছিলেন না, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই—তাহারা ভাবিয়াছিলেন, অবশ্য তিনিও সঙ্গে আছেন।

চিফকমিশনার কোহিমা পৌঁছিয়াছেন, এই সংবাদ পাইবার পরে যদি শূরচন্দ্র তাহার সহিত থাকেন, তবে তাঁহার গতিরোধ ও তজ্জন্য কুমার অঙ্গেয় সেনাকে এক সহস্র সৈন্য সহিত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য

বলিয়া অবধারিত হয়। গ্রিমউড তাহা শুনিতে পাইয়া সেরূপ ভয়ানক বিপজ্জনক সংকল্প পরিত্যাগার্থ মহারাজা কুলচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে কুলচন্দ্র মন্ত্রীগণের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা তাহাদের অভিপ্রেত নহে, কেবল শূরচন্দ্রের মণিপুর প্রবেশ নিবারণই একমাত্র উদ্দেশ্য।" তাহারা ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, "ব্রিটিশ পক্ষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।" ফলতঃ তাঁহাদের ঘরাও বিবাদে ও নিজেদের রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে, ইংরাজ যে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাহা কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি তখন পর্য্যন্তও বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শূরচন্দ্র কোথায় কি ভাবে আছেন তাহার সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত্যর্থ রাজাদেশ মতে রাজকেরাণী বাবু বামনচরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতাস্থ গোলাপ সিংহ মণিপুরীকে তারযোগে সংবাদ দিলেন।

কুলচন্দ্রও স্বয়ং চিফ কমিশনারকে পত্র লিখিলেন যে "তিনি শুনিয়াছেন, কমিশনার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা শূরচন্দ্রকে লইয়া আসিতেছেন এবং তাহার সহিত অনেক ব্রিটিস সৈন্য আছে। এ সকল কথা যথার্থ কিনা?" তদুত্তরে কমিশনার লিখেন যে, "শূরচন্দ্র তাহার সহিত নাই। আর বহুসংখ্যক রক্ষক সঙ্গে থাকার বিষয়ে তিনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের হুকুম প্রতিপালন করিতেছেন।" কলিকাতা হইতেও তার-সংবাদ পৌঁছিল যে, "শূরচন্দ্র কোথাও যান নাই—পূর্ব্বের মত কলিকাতাতেই রহিয়াছেন।"

সেঙ্গমাই হইতে ২১শে মার্চ্চ অর্থাৎ ১২৯৭ সালের ৮ই চৈত্র তারিখে চিফকমিশনার মহারাজাকে এইরূপ পত্র লিখিলেন;—"আমি কল্য প্রাতে ১০ টার সময় মণিপুর পৌঁছিব। পৌঁছিবার অনতি পরেই

রেসিডেন্সিতে একটি দরবার করিব। তাহাতে আপনি সমস্ত ভ্রাতা ও মন্ত্রীগণের সহিত উপস্থিত হইবেন। আমি সেই দরবারে ভারতের রাজ-প্রতিনিধির একখানি পত্র আপনাকে দিব।" এই পত্র পাইবার পরেই কুলচন্দ্র তাঁহার মন্ত্রীগণের দ্বারা পলিটিকেল এজেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে "২১শে মার্চ্চ ধর্ম্ম পর্ব্বাহের (একাদশীর) দিন, এদিনে, মণিপুরীরা সকলেই উপবাস করিয়া থাকেন। পরদিন ২২শে তারিখে দ্বাদশীর পারণ; বিশেষতঃ চিফকমিশনার মহাশয়কে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করণার্থ ও তদনুষঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে সকলেই ব্যস্ত থাকিবেন। অতএব ২২শে না হইয়া দরবারের দিন ২৩ শে তারিখে ধার্য্য করা হউক।" গ্রিমউড সাহেব উত্তর দিলেন যে "চিফকমিশনারের হুকুমের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই।" মহারাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "দরবারের জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?" মিঃ গ্রিমউড বলিলেন যে "কমিশনার সাহেবের শীঘ্রই টামু যাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে—এখানকার কার্য্য অবিলম্বে সারিয়াই তিনি রওনা হইবেন।"

টিকেন্দ্রজিতের শরীর তখন অসুস্থ ছিল—তাহার উপর আবার তিনি একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন। তথাচ তিনি চিফকমিশনারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, দুইদল সৈন্য লইয়া, রাজধানী হইতে প্রায় ২ ক্রোশ দূরে কইরংকাই নদীতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু শরীর স্বচ্ছন্দ নাথাকায়, ডুলিতে যাতায়াত করিয়াছিলেন। সেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং পরস্পর ইংরাজি সভ্যতানুযায়ী শিষ্টাচারের বিনিময় করিলেন। কুইণ্টন সাহেব তাঁহার শিকারকে সেই খানে দেখিয়া কি ভাবিয়াছিলেন এবং কেনই

বা গ্রেপ্তার করিলেন না, তাহা তাঁহার পরলোকগত আত্মাই জানে। কিন্তু টিকেন্দ্রজিতের সহিত সৈন্য ছিল, পাছে অনর্থ ঘটে ও গোল বাধে, বা যে কারণেই হউক, কুইণ্টন তখন মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গেই মণিপুর নগরাভিমুখে চলিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কুইণ্টনের আগমন ও সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

১২৯০খৃঃ ২২শে মার্চ্চ (৯ইচৈত্র) রবিবার বেলা প্রায় ১০ টার সময় কুইণ্টন সাহেব সদলে মণিপুরের রেসিডেন্সি-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেঙ্গমাই আড্ডায় তার-বিভাগের উইলিয়মস্ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে কয়েকজন প্রহরী, কতকগুলি আসবাব, শতজনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ও মুটে মজুর মাত্র রহিল—আর সব তাঁহার সঙ্গেই আসিল।

তাঁহার সম্মানার্থ তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ কাজাই খেলার ময়দানে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। স্বয়ং মহারাজা পূর্ব্ব হইতেই তথায় উপস্থিত ছিলেন; কমিশনার আসিবা মাত্র অগ্রসর হইয়া স্বাগত অভ্যর্থনাদি পূর্ব্বক যথোচিত মান দান করিলেন। এক দিনের জন্য দরবার স্থগিত রাখা বিষয়ে পলিটিকেল এজেণ্টকে কুলচন্দ্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, চিফকমিশনারকেও সেইরূপ অনুরোধ করিলেন। অধিকন্তু, সেদিন রবিবার, খৃষ্টানের বিশ্রাম দিন, একথাও স্মরণ করাইয়া

দিলেন। কিন্তু কুইণ্টন সাহেব কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না—সেই দিন "মধ্যাহ্নেই দরবার নিশ্চিতই হইবে," বলিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সর্কলের সহিত মহারাজ রাজপুরীতে গেলেন।

এদিকে রেসিডেন্সির প্রধান কেরাণী বাবু রসিকলাল কুণ্ডের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র মণিপুরী ভাষায় অনুবাদের ভারার্পণ হইল এবং দরবারের সমস্ত আয়োজন সহিত, সৈন্য, রক্ষী যথাস্থানে স্থাপনাদি, গ্রেপ্তারের পূর্ব্ব ব্যবস্থা সকল চলিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নব-যুবরাজ টিকেন্দ্র, মন্ত্রী অঙ্গেয় মিঙ্গতো প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রেসিডেন্সির মালখানার ফটকে উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে কুলচন্দ্র প্রভৃতিও আসিলেন। রসিক বাবু তখনও অনুবাদ শেষ করিতে পারেন নাই। এই হেতু এক রাজ্যের স্বাধীন রাজা ও রাজভ্রাতাদিগকে চৈত্রের ভয়ঙ্কর রৌদ্রে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করা হইল। ইহা দেখিয়া নানা লোকে নানা রূপ বলাবলি করিতে লাগিল। তাহারা আপনারাও ক্রমে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, ও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদিগকে নিতান্তই অপমানিত বোধে মনে মনে মহা কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ একে অসুস্থ ছিলেন, তাহাতে অর্দ্ধ ঘণ্টায় অধিকও ঘোড়ার উপর সেই প্রখর আতপে অবস্থান করাতে তাহার মহা অসুখ হইতে লাগিল। সুতরাং "আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না" বলিয়া তিনি রাজবাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। নবসেনাপতি কুমার অঙ্গেয় সেনাও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। তৎপরে মহারাজ কুলচন্দ্র, কুমার জিল্লাসিংহ, থঙ্গাল জেনারেল, আয়াপারেল, ও লুয়াঙ্গ নিঙ্গতো প্রভৃতি মন্ত্রীগণের সহিত প্রায় ২ ঘণ্টা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রেসি-ডেন্সির ধাপে উঠিলেন। সেইখানে গ্রিমউডের সহিত তাহাদের

দেখা হইল। গ্রিমউড যুবরাজের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাহাকে প্রকৃত ঘটনা বলা হইল। তিনি যুবরাজকে ডাকিতে বলায়, আয়াপারেল তদুদ্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইলেন। বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিতান্ত অপমান করা হইতেছে, এই কথা গ্রিমউডকে বলায়, তবে তিনি সকলকে ঘরের মধ্যে বসিতে দিলেন। প্রায় ২॥০ টার সময় আয়াপারেল ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, টিকেন্দ্রজিতের শরীর এত অসুস্থ হইয়াছে যে, তিনি আসিতে পারিবেন না।

পরস্পরের কথোপকথন কালে, গ্রিমউড মহারাজকে বলিলেন যে, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ উপস্থিত না হইলে, চিফকমিশনার তাঁহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। ভারত-গভর্ণমেণ্টের হুকুম কি, জানিতে চাওয়াতেও গ্রিমউড বলিলেন যে, টিকেন্দ্রজিৎ না আসিলে, তাহাও বলা হইতে পারে না। শেষে, সাক্ষাৎপূর্ব্বক চিফকমিশনারের নিকট বিদায় লইয়া প্রসাদে ফিরিবার কথা মহারাজ বলিলেন। গ্রিমউড প্রকাশ করিলেন যে, "সে দিন আর তিনি কমিশনারের সাক্ষাৎ পাইবেন না। কিন্তু পরদিন বেলা ৮টার সময় যে দরবারটি হইবে, তাহাতে যেন নিশ্চয়ই টিকেন্দ্রজিতের সহিত মহারাজের আসা হয়।" মহারাজ উত্তর করিলেন যে "টিকেন্দ্রজিতের অসুখ হইয়াছে; তাঁহার উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে তিনি স্থির কিছুই বলিতে পারেন না, তবে সে পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।"

এইরূপে অসহ্য নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আত্মভাগ্য ও জীবনের প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে, ভূপতি কুলচন্দ্র সিংহ অপরাহ্ন প্রায় ৩টার সময়, স্বরাজধানীস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্সি ভবন হইতে স্বধামে স্বগণে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পলিটিকেল এজেণ্ট হুকুম জারি করিলেন যে, অনুবাদের মর্ম্মাভাস যদি কেহ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে পদচ্যুত করা হইবে। শিকার হস্তগত-প্রায় হইয়াও কবলিত হইল না, সুতরাং সাহেবেরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। রসিক বাবুকে সঙ্গে লইয়া গ্রিম-উড ও সিম্‌সন বেলা প্রায় ৫টার সময় টিকেন্দ্রজিৎকে দেখিতে গেলেন। পূর্ব্ব হইতে অকৃত্রিম বন্ধুতা কি না! তাই গ্রিমউড অপর বন্ধু সহ, গেলেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তাঁহার শরীর এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, তিনি বাহিরে আসিয়া দেখা করিতে পারিবেন না। কিন্তু গ্রিমউডের মৈত্রতা তো যেমন তেমন ধরণের নয়—প্রয়োজনও যৎসামান্য নয়—অসভ্য পুরী[illegible] অভব্য আত্মীয়গণের সকাশ হইতে সভ্য জনপদে লইয়া যাওয়া—সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে সংবাদ পাঠাইলেন যে, "তিনি কেবল একবার নিজের চক্ষে যুবরাজকে দেখিয়া তাঁহার অসুখের কথা চিফকমিশনারের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন।" তথাপি অকৃতজ্ঞ টিকেন্দ্রজিৎ আসিতে পারিলেন না—বা আসিলেন না। ইংরাজ-রাজপুরুষগণের পক্ষে ইহা বড় সন্তোষজনক হইল না। রেসিডেন্সিতে তাঁহারা নানা চিন্তায় ও নানা মন্ত্রণায় কোন মতে যামিনী যাপন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই, গ্রিমউড প্রভৃতি আবার যুবরাজকে দেখিতে গেলেন; কিন্তু সেবারেও দেখা হইল না। গ্রিমউড তাঁহাকে ডুলি করিয়া নামিয়া আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন; টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু আসিলেন না। গ্রিমউড প্রভৃতি রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে বেলা ৮টার সময় দরবার হইবার কথা, কিন্তু কেহই আসিল না। কেবল মহারাজ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "অসুস্থতা হেতু যুবরাজ

যাইতে পারিলেন না—যুবরাজ ব্যতীত আমার যাওয়া বিফল বিবেচনায়, আমিও একাকী গেলাম না।"

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়, মহারাজা ভারত-গভর্ণমেণ্টের হুকুমের মর্ম্ম জানিবার জন্য, চিফ্ কমিশনারকে পুনরায় একখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু তখনও টিকেন্দ্রজিৎকে দরবার-জালে জড়িত করিবার একটু আধটু আশা আছে, বিশেষরূপ চেষ্টাও আছে। অতএব পত্রের উত্তর হঠাৎ না দিয়া বেলা ১টার সময় যুবরাজের ভাবগতিক জানিবার উদ্দেশে রসিক বাবুকে পুনর্ব্বার পাঠান হইল। রাজদরবারেও সংবাদ গেল যে রাত্রিকালে রেসিডেন্সিতে নাচ হইবে। তাহা দেখিতে স্বভ্রাতৃ[illegible] মহারাজ এবং মন্ত্রীগণ, সকলেই যেন আইসেন ও নাচের সমস্ত বন্দোবস্ত করেন।" তদনুসারে মহারাজ কতকগুলি লোকের উপর নাচের আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন।

কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ রসিক বাবু অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও টিকেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলেন না। এদিকে রেসিডেন্সিতে সাহেব মহাশয়েরা অধীর হইয়া পড়িলেন। বিনা গোলযোগে যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার আশা সুদূরপরাহত দেখিয়া—নাচের কাঁদেও টিকেন্দ্র যে পড়েন, এমত বিশ্বাসেরও সূত্র না পাইয়া—চিফ্-কমিশনার মহা ক্ষুব্ধচিত্তে মহারাজার পত্রের উত্তর লিখাইলেন এবং বেলা ৪টার সময় রসিক বাবুকে সংবাদ দিলেন, তিনি যেন প্রসাদ-মধ্যস্থ দরবার গৃহে যান।

ঐ পত্র হস্তে মিঃ গ্রিমউড ও সিম্‌সন উক্ত গৃহে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ কর্ত্তৃক সমুচিত অভ্যর্থনাদির পর উক্ত লিপি তাঁহারা তাহাকে দিলেন। পত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপ—ভারতগভর্ণমেণ্ট কুলচন্দ্রকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু দুর্ব্যবহারের

নিমিত্ত কুমার টিকেন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাসিত করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতএব অবিলম্বেই তাহাকে ইংরাজ কর্ম্মচারী হস্তে অর্পণ করিতে হইবে,” ইত্যাদি।

মহারাজ এ বিষয়ে যতই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, গ্রিমউড সাহেব ততই পুনঃ পুনঃ জিদ করিয়া শেষে বলিলেন “গত কল্যাবধি আমি স্বয়ং দুই বার গিয়াও যুবরাজের সাক্ষাৎ পাই নাই; আপনি যদি আমার সহিত তাঁহার একবার দেখা করাইয়া দিতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়।” মহারাজ তৎক্ষণাৎ স্বীয় সুবাদারের দ্বারা যুবরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে “শরীরের অবস্থানুসারে পারিয়া উঠিলে, তিনি যেন একবার পলিটিকেল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন।” সুবাদার গেলে মহারাজ বলিলেন “সকল মন্ত্রীর মত ব্যতীত তিনি যুবরাজকে বন্দী করিতে পারেন না।” গ্রিমউড মহারাজের নিকট গ্রেপ্তারী পরওয়ানা চাহিলেন। মহারাজ ঐ কারণে সম্মত হইলেন না। গ্রীমউড পুনশ্চ বলিলেন “অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ শেষ করুন।”

এই কথা শুনিয়া মহারাজ প্রাসাদের ভিতর দিকে গিয়া তৎক্ষণাৎ (যুবরাজের সহিত) সকল সচিবকে ডাকাইয়া দরবার করিলেন। রাজকেরাণী বামন বাবু সমবেত সর্ব্ব সমক্ষে চিফ্ কমিশনারের পত্রের অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ার পর, মহারাজা সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবরাজ অমনি বলিয়া উঠিলেন;—“যদি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন তবে আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।” কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীগণ সকলে পরামর্শ দিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে চিফ্ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়া কিরূপ ফল হয়, তাহা দেখা উচিত। তদনুসারে মহারাজা চিফ্ কমিশনারকে এইরূপ পত্র লিখিলেন;—“আমাকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করাতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যুবরাজ

টিকেন্দ্রজিতের শরীর এখন বড় অসুস্থ। আরোগ্য হইলে, তাঁহার দেশ ত্যাগের কথা আপনাকে লিখিব।"

ও দিকে রসিক বাবু ও মিঃ গ্রিমউড প্রভৃতি তখনও দরবারগৃহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মন্ত্রী অঙ্গের মিঙ্গতো সেই পত্র লইয়া আসিয়া গ্রিমউড্‌কে দিলেন, গ্রিমউড্‌ বলিলেন, "এ পত্র লইয়া ফল কি? হয় যুবরাজকে, নয় তাঁহার গ্রেপ্তারী হুকুম মাত্র আমি চাহি। তখন মন্ত্রীরা সকলে ও অন্যান্য অনেকে তথায় আসিয়া বিস্তর কাকুতি মিনতি সহকৃত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গ্রিমউডকে বলিলেন "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করুন—চিফ্‌কমিশনার সাহেবকে বলিয়া ক্ষান্ত করুন, এ যাত্রা আপনারা যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবেন না" ইত্যাদি।

যে সময় দরবারে গ্রিমউডের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, সেই সময় যুবরাজ সংবাদ পাঠাইল যে, সওয়াপাঁচটার সময় তিনি পলিটিকেল এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তদনুসারে মিঃ সিম্‌সন ও রসিক বাবুকে সঙ্গে লইয়া মিঃ গ্রিমউড যুবরাজের মহালের দিকে গেলেন। অনতি পরেই যুবরাজ ডুলি করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পীড়িত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিল;—

গ্রিমউড্‌। আপনাকে মণিপুর রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।

যুবরাজ। রাজদরবার হইতে যেরূপ হুকুম হইবে, তাহাই আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিপালন করিব।*

গ্রিমউড। আপনি বৃত্তি পাইবেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোন

* বিশেষ আদালতে টিকেন্দ্রজিতের দরখাস্তের লিখিত সময়ের সহিত এই সাক্ষাৎ কালের এবং মহারাজের দরবারের সময়ের অনৈক্য হইতেছে।

স্থানে থাকিবেন। আপনি সদ্ব্যবহার করিলে, গভর্ণমেণ্ট পুনরায় আপনাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবেন।

যুবরাজ। সে সকল কোন বিষয়ের জন্যই আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। মহারাজা আমায় যেরূপ আদেশ দিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করিব।

গ্রিমউড। আপনাতে আমাতে বহুদিনের বন্ধুতা—

যুবরাজ। আপনি বলিতে পারেন যে চিফ্ কমিশনার আমাকে কি জন্য মণিপুর ছাড়া করিতে চাহেন?

গ্রিমউড। মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ হুকুম দিয়াছেন।

যুবরাজ। মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য গভর্ণমেণ্টের যেরূপ চেষ্টা, ইংরাজের খাসদখলী স্থান সকলের জন্য সেইরূপ করিলে, বড় ভাল হয়। আর আমাদের ক্ষুদ্র দেশের কথা লইয়া তাঁহাদের এত মাথাব্যথা কেন?

গ্রিমউড। মহারাজ শূরচন্দ্র বারম্বার দরখাস্ত—

যুবরাজ। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শূরচন্দ্র যুধিষ্ঠির তুল্য ধার্ম্মিক। তাঁহাকে আমি উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি। কিন্তু আপনি তো জানেন তাঁহার অন্যান্য সহোদরেরা বিশেষতঃ পাকাসেনা কিরূপ?

গ্রিমউড। আমি আর না জানি কি? কিন্তু গভর্ণমেণ্ট—

যুবরাজ। আপনাদের গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় ক্ষমতাবান বটেন। তাই বলিয়া আমার দোষগুণের তদন্ত না করিয়া, মণিপুর রাজ্যের সকলে আমাকে কিরূপ ভাল বাসে, তাহা না জানিয়া, বিনা বিচারে শাস্তি দেওয়া কি উচিত?

গ্রিমউড। আপনার মত দাতা, সদাশয় ও মহৎ অন্তঃকরণের লোক—

যুবরাজ। এই দোষেই কি আমার দণ্ড হইতেছে?

গ্রিমউড। না না—গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই সুবিচার—

যুবরাজ। আমি সমস্তই জানি—এখন আপনার বক্তব্য?

গ্রিমউড। আমি আপনাকে সুহৃদ্ভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, আমার সহিত রেসিডেন্সিতে আসুন এবং—

যুবরাজ। তার পর?

গ্রিমউড। চিফ্‌কমিশনারের নিকট আত্মসমর্পণ করুন। কষ্ট—

যুবরাজ। আমার শরীর এখন নিতান্ত অসুস্থ। আপনিও তাহা বুঝিতেছেন। ভাল হইলে, পরে আমি যাইব।

এইরূপ কথার পর গ্রিমউড প্রভৃতি রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রত্যাগমনের একটু পরে (প্রায় সন্ধার সময়) রেসিডেন্সি হইতে একজন চাপরাসী রাজবাড়ীতে আসিয়া বলিল যে, "কল্য প্রাতে কমিশনার সাহেব রওনা হইবেন—তাঁহার জিনিষ পত্র বহিবার জন্য কুলির দরকার।" ইহাতে বুঝাইল যে গ্রিমউড সাহেব পূর্ব্বে যে চিফ্‌কমিশনারের টামু যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, ২৪শে প্রাতে যেন তাহাই হইবে। এইরূপ বিশ্বাস করিয়া মহারাজ কুলি সংগ্রহের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে, তীক্ষবুদ্ধি টিকেন্দ্রজিৎ ইংরাজ কর্ম্মচারীদের নানারূপ অনুষ্ঠান ও ভাবগতিক দেখিয়া, মনে মনে বিবিধ প্রকার তর্ক-বিতর্ক ও সন্দেহ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি এমন আশঙ্কা করেন নাই যে, রাজদরবারের বিনা অনুমতিতে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে রাজপুরী মধ্যে চড়াও হইয়া গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিবেন, তথাচ "সাবধানে বিনাশ নাই" এই নীতিটুকু যে তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা বেস বুঝা যায়।

রসিক বাবু যখন (বেলা ৪টা পর্য্যন্ত) যুবরাজের সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলেন, তখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, যুবরাজের বাড়ীর লোকেরা দ্রব্যাদি সরাইতেছে। আবার বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তর দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, যুবরাজের বাড়ীর ফটকের প্রায় ১০০ হাত দূরে ঘেরা-প্রাচীরের ভিতর দিকে সৈন্য সন্নিবেশিত হইতেছে। রেসিডেন্সিতে ফিরিবার পর, সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রেই তিনি একথা পলিটিকেল এজেণ্টকে বলেন। পুনর্ব্বার তিনি সন্ধ্যার সময় গ্রিমউডের নিকট গিয়া বলিলেন যে, "ইংরাজেরা যুবরাজকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করিতে গেলেই, মণিপুরী সৈন্যেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে।" রাজকেরাণী বামন বাবুও বাঙ্গালী বুদ্ধির চতুরতা দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। লোক জনের চলন বলনের ধরণ দেখিয়া, তিনিও বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং মহারাজের বেতন ভোগী চাকর হইয়াও এবিষয়ে মিঃ গ্রিমউডকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেও বাঙ্গালীকে ইংরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না ভাবিয়া তদ্বিপরীতে বিদ্রোহভাবের পোষক জ্ঞানে অবিশ্বাস করা এখনকার অধিকাংশ ইংরাজের কেমন একটা কুবুদ্ধি-রোগ ধরিয়াছে! রাজপুরীর বহির্ভাগস্থ ঘেরার মধ্যে বামন বাবুর বাসা ছিল। গ্রিমউডের পরামর্শমতে, তিনি রাত্রি ১১টার সময় (বোধ হয় গোপন ভাবে এবং কাহাকেও না বলিয়া) সপরিবারে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। রেসিডেন্সি প্রাঙ্গণের মধ্যে রসিকবাবুর বাসা ছিল। কিন্তু তিনি (ইংরাজের চাকর) নিজে না যাইতে পারিয়া, পরিবারস্থ বালক বালিকা প্রভৃতিকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। রেসিডেন্সির ডাক্তার (হিন্দুস্থানী) লক্ষ্মণ প্রসাদও তাঁহার পরিবারদিগকে বিদায় করিলেন। রেসিডেন্সির চারিদিকের
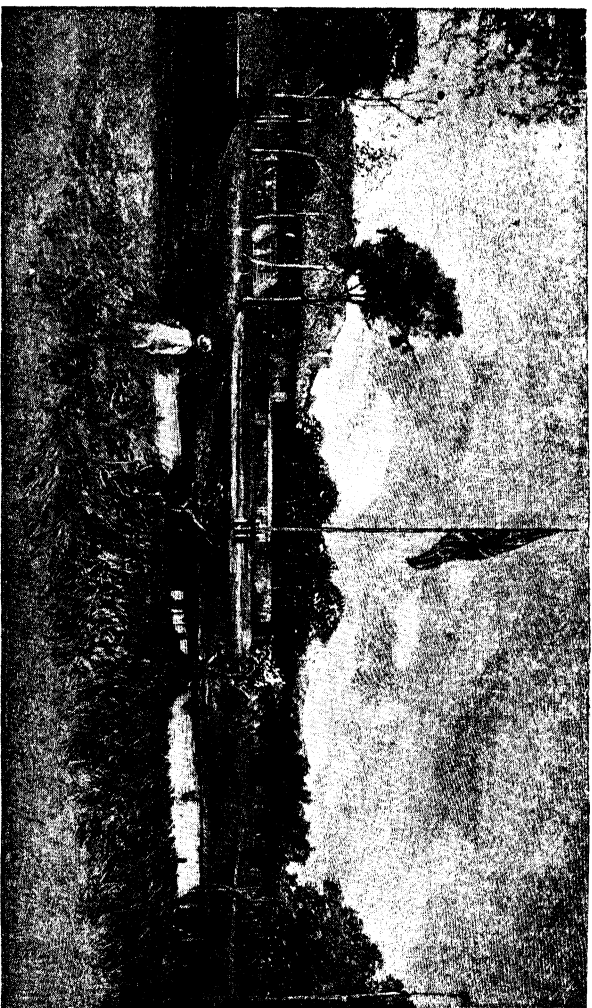
মণিপুরে ব্রিটিশ রেসিডেন্সী।

১৩৫ পৃষ্ঠা।

গ্রামবাসী মণিপুরীরাও নানা স্থানে চলিয়া গেল। "মণিপুরী সৈন্যেরা আসিতেছে—এখনই রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবে" এইরূপ গুজবও বারম্বার উঠিতে লাগিল।

সে রাত্রে রেসিডেন্সিতে ইংরাজ মাত্রেরই নিদ্রা হয় নাই। সকলের প্রধান চিফ্‌কমিশনার মিঃ কুইণ্টন। তাঁহার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা ভার। সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যে তাঁহার কি দেখা অভ্যাস?—ইংরাজের নাম গন্ধ থাকিলে, সামান্য পেয়াদাকে দেখিয়াও কি লোকে কাঁপে না? ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর প্রতি কোনরূপ অবাধ্যতা দেখাইতে কেহই কি সাহসী হয়? পথের ভিখারী ও মাঠের কৃষক হইতে আমীর ওমরাহও নামে স্বাধীন, এমন মুকুটধারী পর্য্যন্ত, ইংরাজের আজ্ঞায় কে না মস্তক অবনত করে? তাঁহার বহুদর্শনে ইহাই জানা আছে—তাঁহার দৃষ্টিতে ইহাই স্বাভাবিক। আজ এই ক্ষুদ্র মণিপুরে তদন্যথা দেখিয়া তিনি অবাক্—আজ সারাদিনের ঘটনা পরম্পরা দেখিয়া—মহারাজ ও যুবরাজের ধৃষ্টতা ভাবিয়া—যেমন বিস্মিত, তেমনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং আপনাকে ঘোর অপমানিত বোধ করিলেন। বিশেষতঃ টিকেন্দ্রকে হস্তগত করিতে না পারাতে, লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন আকুল হইয়া উঠে তিনি তেমনি ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় ও ভাবী চিন্তায় কেমন যেন এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিষম উদ্বেগ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই হুতাশনে সহকারী ইংরাজগণের মন্ত্রণা ও উৎসাহরূপ আহুতি পড়িয়া, এই সংকল্প স্থির হইল যে, "যেরূপেই হউক, নিশাবসানের পূর্ব্বেই, টিকেন্দ্রকে ধরিতেই হইবে—মহারাজা সন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট, যাহাই হউন, গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে টিকেন্দ্রের নির্ব্বাসন ঘটাইতেই হইবে।"

গ্রিমউডকে স্বাভিপ্রায় সম্বন্ধে দুই চারি কথা মাত্র কুইন্টন বলিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরামর্শ সৈনিক কর্ম্মচারীদের সহিত হইল। এই সময় মণিপুরী সৈন্য কর্ত্তৃক রেসিডেন্সি আক্রমণের জনরব শুনিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক আরো উদ্বেলিত—আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রেসিডেন্সির চারিদিকে স্থানে স্থানে উপযুক্ত প্রহরিতার বিধান হইল। কুইন্টনের সঙ্গে চারিশত গুর্খা সৈন্য আসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন নিজ রেসিডেন্সির রক্ষী সৈন্যও এক শতের কিছু কম। এই অল্পবল সাহায্যে, গ্রেপ্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না, এ প্রশ্ন উঠিলে, এক জন বলিলেন "শিলচর হইতে কাপ্তেন কাউলীর অধীনে যে ২০০ সৈন্য আসিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা করা উচিত।" অন্য কর্ম্মচারী সদর্পে উত্তর করিলেন "সমস্ত মণিপুরী সৈন্যকে পরাস্ত, নিহত বা বন্দী করিতে উপস্থিত গুর্খাই প্রচুর।" "প্রচুর, প্রচুর" বলিয়া কর্ণেল স্কীনে তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, "ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যে সৈন্যদলের নেতা, কোন ভারতীয় সৈন্যই তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। আমাদের বুদ্ধিবলে ও কৌশলে তাহাদের প্রত্যেকে সহস্রের দৈহিক বল ধারণ করে।" বোধবর্জ্জিত কুইন্টন সাহেব মহা আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ভীরুতাই অনর্থের মূল—ভীরুপুরুষ ইংরাজ-সৈন্যদলের যোগ্যই নয়, অন্য কোনকার্য্যেরও উপযুক্ত নহে।" প্রথম বক্তা এইরূপে ভৎর্সিত ও অপ্রতিভ হইয়া নিরুত্তর রহিলেন। ধার্য্য হইল,যে, শেষরাত্রে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সসৈন্যে গিয়া, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিবেন। যে কর্ম্মচারীকে যে দিকে গিয়া, যেরূপে, যত সৈন্য লইয়া যাহা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও পরামর্শ ধার্য্য হইয়া বিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইল। কর্ম্মচারীরা সুসজ্জিত হইয়া উদগ্রীব রহিলেন।

টিকেন্দ্রজিতের একজন গুপ্তচর, ইংরাজদের সকল পরামর্শের কথাই তাঁহাকে জানাইল। তিনি অবশ্যই মনে মনে হাসিলেন এবং আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থাই করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আক্রমণ, পরাজয় ও হত্যাকাণ্ড।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সামরিক কর্ম্মচারীরা সসৈন্যে বহির্গত হইলেন। লেঃ ব্রাকেনবরি ৩০ জন সৈনিক লইয়া, উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। কাপ্তেন বুচার ৭০ জন সমভিব্যাহারে, রাজপুরীর পশ্চিম দ্বারেব প্রায় ৪০০ হাত দূরে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, সেনাপতির বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন। লেঃ লুগার্ড ৫০ জন সঙ্গে, কাপ্তেন বুচারের বিশেষ সহকারী রূপে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে অগ্রসর হইলেন।

কেমন চমৎকার কৌশল দেখুন!

প্রথমতঃ সময়—রাত্রি বেশী নাই, অথচ প্রভাতও হয় নাই। সমস্ত রজনীর প্রহরিতার পর এ সময় প্রহরিদের পক্ষে অবসন্ন হইয়া পড়া এবং নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত থাকাই সম্ভব। আবার, যদিও তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না থাকুক, ওদিকে লেঃ ব্রাকেনবরি উত্তর দ্বারে যে গোল বাধাইতে গেলেন, রক্ষীবর্গের মন সেই দিকেই আকর্ষিত হইবে। অপিচ, অবশিষ্ট সৈনিকগণকে ব্যাপৃত রাখিবার উদ্দেশে ৫০ জন গুর্খার সহিত লুগার্ড পশ্চিম ফটকে অগ্রসর। এ সকলের পূর্ব্বেই কাপ্তেন বুচার অবশ্যই গুপ্তভাবে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবেন। অন্য দুই

দিকে যেমন গোল বাধিবে, মণিপুরীরা সেই দিকেই দৌড়িবে—তাহাদের ধাঁধা লাগিয়া যাইবে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কাপ্তেন বুচার আসল (গ্রেপ্তার করা) কাজটি সারিবেন। সফলতা পক্ষে কর্ণেল স্কীনে ও কুইণ্টনের অন্তরে সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু তাহা ঘটিল না—টিকেন্দ্রজিতের সুবন্দোবস্ত ইংরাজ-কৌশলকে পরাস্ত করিল।

উত্তর দ্বারে নিষ্কোষিত অসি হস্তে দুই শ্রেণীতে চল্লিশ জন সিপাহী পাহারা দিতে ছিল। সসৈন্য ব্রাকেনবরিকে দেখিয়া তাহারা বিনীত ভাবে ডাকিয়া বলিল, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক কথা শুনুন—অন্যায় ব্যবহার করিবেন না—আমরা রাজসরকারের দাস, আপনারা শত্রুতাচরণ করিলে বাধা দিতে আমরা বাধ্য হইব।" চাতুরীর সহিত অযথা কথা যোগ করিয়া ব্রাকেনবরি বলিলেন "না, না, সেরূপ কোন চিন্তা নাই—আমরা যুবরাজের সহিত আলাপ (মিল) করিতে আসিয়াছি।"

কিন্তু সে চাতুরী খাটিল না। বুদ্ধিমান মণিপুরীরা সে কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করিল না—তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অমনি দুর্গমধ্য হইতে বিকট চিৎকার ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ব্রাকেনবরি নিজের সৈন্যগণকে বিস্তৃত ভাবে দাঁড়াইতে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে বন্দুকের শব্দের সহিত গুলি চলিতে লাগিল। ইংরাজ সৈন্যেরা পশ্চাৎ হটিয়া নদীতীরের বাঁধের অন্তরালে শুইয়া পড়িয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। কাহারা যে অগ্রে গুলি চালায়, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। দুই জন ইংরাজ কর্ম্মচারী ও তাহাদের এক জন সিপাহীর কথামতে মণিপুরীরাই প্রথম বন্দুক ছুড়ে। ও পক্ষে মণিপুরী সৈনিকেরা এবং টিকেন্দ্রজিৎ নিজে এ বিষয়ে ইংরাজদিগকেই দোষী করেন। অধিকন্তু ইংরাজ সৈনিকগণের যে সব দুর্ব্যবহারের কথা টিকেন্দ্রজিৎ বলেন, তাহা তাঁহার দরখাস্তে দেখুন। (দলীল ৩৪)

মণিপুর রাজবাটীর তোরণ দ্বার

১৩৮ পৃষ্ঠা।

এইতো বাহিরের ব্যাপার; ওদিকে কাপ্তেন বুচার মৈ লাগাইয়া অলক্ষিত ভাবে সদলে প্রাচীর টপ্‌কাইয়া যুবরাজের প্রাসাদের নিকট-বর্ত্তী হইলেন। তখনই সতর্ক মণিপুরীরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। লেঃ লুগার্ডের সহিতও অন্যত্র মণিপুরী রক্ষীবর্গের সংগ্রাম বাধিল।

এইরূপে তিন দিকে ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও মণিপুরীরা ক্ষান্ত রহিল না। তাহারা রাজপাটের পশ্চিম দ্বার হইতে রেসিডেন্সির উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ৩০ জন সৈন্যসহ লেঃ চেটার্টন প্রেরিত হইলেন।

কাপ্তেন বুচারের আঁকস্মিক আক্রমণে যুবরাজের প্রাসাদের রক্ষকেরা প্রথমে একটু থতমত খাইয়াছিল। সুতরাং সাহেবদের গুলিতে অনেক মণিপুরী হত ও আহত হয়। ইংরাজ পক্ষেরও আট জন আহত হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই বুচার যুবরাজের বাড়ী দখল করিয়া বসিলেন। তখন মহা আহ্লাদে ও উৎসাহে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিতে গেলেন। বড় আশাতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ও হরি! যাঁহার জন্য এতকাণ্ড—এত অনর্থ ব্যাপার—তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। পুরী মধ্যে সকল স্থানেই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, টিকেন্দ্রজিৎ তো নাই, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গের কোন সন্ধান পর্য্যন্তও পাওয়া গেল না।

টিকেন্দ্রজিতের সংবাদ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল। তিনি রেসিডেন্সির সমস্ত পরামর্শ ও সমস্ত আয়োজনেরই তথ্য পাইয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি নিজ বাড়ীতে অবস্থিতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়া ইংরাজাক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্বপরিবারে প্রস্থান

করেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিলে কাপ্তেন বুচার এত সহজে কখনই তাঁহার প্রাসাদ অধিকার করিতে পারিতেন না—আদৌ পারিতেন কি না, সে পক্ষেও বিশেষ সন্দেহ আছে।

এই যুদ্ধের সময়ে অথবা আরম্ভেই বালক-বালিকা বধ, গো হত্যা, গৃহদাহ, বাস্তুদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের গহনা লুণ্ঠন ও মন্দির ভগ্ন প্রভৃতি ইংরাজ সৈন্যগণের নানারূপ অকার্য্যের কথাও মণিপুরীদের মুখে শুনা যায়। ইংরাজ পক্ষের অনেক গুর্খা সৈন্যও এই কথার পোষকতা করিয়াছে। কি সত্য কি মিথ্যা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু ইংরাজ পক্ষও স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যেরা দেব-মন্দিরের উপরে উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ও আত্মরক্ষার্থ তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিতেও বাধ্য হইয়াছিল। এবং একথা নিশ্চয় যে, (যেই করুক) বৃন্দাবন চন্দ্রের সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখা গিয়াছিল।

রাজপাটের পশ্চিম দ্বারে, লেফ্‌টেনাণ্ট চেটার্টনের অধীনস্থ গুর্খারাও মণিপুরী সৈন্যদিগকে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজ পক্ষের ১টি মাত্র সৈন্য আহত হয়, কিন্তু মণিপুরী ৪।৫ জন আহত ও ২ জন হত হইয়াছিল। অধিকন্তু ১৭ জনকে বন্দী করিয়া চেটার্টন রেসিডেন্সিতে পাঠান।

ইংরাজ পক্ষ পরম আহ্লাদিত হইয়া, মহা উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মণিপুরী সৈন্য মধ্যে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল এবং রাজবাড়ীতে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কাপ্তেন বুচার শুনিলেন যে, যুবরাজ মহারাজের খাসমহলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। তথায় সবেগে সসৈন্যে প্রবেশ করিবেন কি না এবং তৎপক্ষে নিরাপদ উপায় কি হইতে পারে, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। বেলা তখন ৭টা।

অকস্মাৎ দুর্গ মধ্যস্থ সৈন্যগণ কোলাহল করিয়া উঠিল এবং রাজ-পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, সকলেই তাহাতে যোগ দিল। আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ ও ইষ্টদেব শ্রীশ্রী বৃন্দাবন চন্দ্রের দুর্গতি দেখিয়া বিজিত হইলে যে দুরবস্থা সম্ভব তাহা উপলব্ধি করিয়া মণিপুরীরা বার বার ভয়ানক চিৎকার করিতে লাগিল। দুর্গমধ্যে রণবাদ্য ভীষণ রবে বাজিয়া উঠিল। সমস্ত সৈনিকই যেন একতানে একপ্রাণে রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। পূর্ব্বে মণিপুরীরা প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া ও অন্যান্য স্থান হইতে এলোমেলো ও ছত্রভঙ্গ ভাবে গুলি চালা-ইতে ছিল। এখন প্রাচীর ও প্রাসাদের উপরে উঠিয়া ও অন্যান্য নানাস্থলে মিলিত হইয়া অবিশ্রান্ত ভয়ানক বন্দুক চালাইতে লাগিল এবং কামানযোগেও অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। নদীর পার হইতেও ব্রাকেনবরির দলের উপর গুলি পড়িতে লাগিল। একটি গুলিতে নিজে ব্রাকেনবরি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া শুইয়া পড়িলেন। সুবাদার হেমচাঁদ ও সিপাহী ধুপচাঁদ ঠাকুর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় হেমচাঁদও আহত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও ২ জন সৈন্যের গায়ে গুলি লাগিয়া, তাহারাও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। পরিশেষে সিপাহী জয়মণি থাপ্পা তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল।

রাজপাটের পশ্চিম দ্বারে লেঃ চেটার্টনের উপর অজস্র বন্দুকের গুলি ও একটি কামানের গোলা চলিতে লাগিল। কয়জন হতাহত হওয়াতে এবং সকলেরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিয়া তাঁহাদের তথায় তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠাতে, পলায়ন দ্বারা অবশিষ্টের প্রাণ রক্ষা করিবেন কিনা চেটার্টন ভাবিতে লাগিলেন।

কাপ্তেন বুচারকেও অধিকক্ষণ যুবরাজপুরের অধিকারী থাকিয়া গ্রেপ্তারের চিন্তা করিতে হইল না। যেহেতু দুর্গস্থ বৃহৎ কামান

সকল তাঁহার দলের উপর অনবরত অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক সৈন্য হতাহত হইয়া পড়িল। ক্রমে মণিপুরীরা সমস্ত দলকে একবারে ঘিরিবার উপক্রম করিল। কয়েকজন ইংরাজের সিপাহী, মণিপুরীদের হস্তে বন্দীও হইল। কাজেই এখন জয়াশা ও যুবরাজকে গ্রেপ্তারের চিন্তা ঘুচিয়া গিয়া, মান প্রাণ রক্ষার ঘোর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। অসৎ বুদ্ধির বিষময় ফল ফলিল।

সাংঘাতিকরূপে আহত ব্রাকেনবরি রেসিডেন্সিতে আনীত এবং তাহার তদবস্থা দেখিয়া সকলেই মহা দুঃখিত হইলেন। কিন্তু দুঃখ বা শোক প্রকাশের সময় তখন নয়। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ আসিল যে "লেঃ চেটার্টন ও কাপ্তেন বুচার বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কাপ্তেন বুচারকে অবিলম্বে সাহায্য না করিলে তিনি স্বদলে মণিপুরীদের হস্তে বন্দী হইতে পারেন।" এই সংবাদে, মহা তটস্থ ও ব্যস্ত হইয়া, কর্ণেল স্কীনে স্বয়ং ৮০ জন সৈন্য লইয়া কাপ্তেন বুচারের সাহায্যার্থ দৌড়িলেন। সেঙ্গমাইয়ের তার-আফিসে, উইলিয়মস সাহেবের নিকট আসবাব ও সমস্ত প্রহরী সৈন্যগণকে পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইল। তখন বেলা প্রায় ১০টা। লেঃ চেটার্টনের সাহায্যার্থও কতকগুলি সৈন্য প্রেরিত হইল। রেসিডেন্সির মধ্যে উৎসাহ এবং সাহসের পরিবর্ত্তে আশঙ্কা আসিয়া দেখাদিল। মুটে, খানসামা প্রভৃতি বাজে লোকেরা পলাইতে আরম্ভ করিল। পলিটিকেল কেরাণী রসিক বাবু চাকরীর মায়া ছাড়িয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া এরিংবুমে পলাইয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করিলেন।

রাজপুরীর ভিতরে, বাহিরে ও রেসিডেন্সির দিকে এইরূপে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও বধ্য-ব্যাপার চলিতে লাগিল। ইংরাজ পক্ষেরই ক্রমশঃ অধিকতর প্রাণ হানি দৃষ্ট হইল। ধূলিপটলে ও বারুদের ধূমে সূর্য্যদেব অদৃশ্যপ্রায়

হইলেন। ঠিক মধ্যাহ্নকালে নিকটস্থ একটি নাগা পল্লী হইতে রেসি-ডেন্সির উপর ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হওয়াতে, তত্রত্য সকলে মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইংরাজ জাতি অসামান্য বীর। কাপ্তেন বইলো অসীম সাহসে কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে দৌড়িয়া গিয়া সেই গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিলেন। মণিপুরীরাও সামান্য সাহসী নয়। তাহারা বইলোর দলকে এমন ভীষণ বলে আক্রমণ করিল যে, তিনি আঘাত পাইয়া দৌড়িয়া রেসিডেন্সির মধ্যে পলাইয়া আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

পুনর্ব্বার অন্যান্য দিক হইতে রেসিডেন্সির উপর অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ওদিকে, স্বয়ং কর্ণেল স্কীনে কাপ্তেন বুচারের সাহায্যে গিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না—তেমন সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়াও মণিপুরীদের সংখ্যা ও বিক্রমের নিকট আর তিষ্ঠিতে সমর্থ হইলেন না—রেসিডেন্সিতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তখন তথায় যে দুরবস্থা, তাহাতে কে কাহাকে সাহায্য করে? আহা! দারুণ শোচনীয় দশা! স্কীনে ও বুচারের বিস্তর লোক ধরাশায়ী হইল। পরিশেষে, যাহারা জীবিত ও চলচ্ছক্তিবান ছিল, তাহাদিগকে লইয়া রেসিডেন্সি মধ্যে তাঁহারা পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। বিজয়ী বিপক্ষ পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক রেসিডেন্সির প্রায় তিন দিক অবরোধ করিয়া ফেলিল। রাজবাটীর বাহির প্রাচীরের উপরে উঠিয়া এবং তাহার রন্ধ্র দিয়াও রেসিডেন্সির অপরদিকে অবিরত গুলি গোলা চালাইতে লাগিল। ইংরাজ-পক্ষের যাবতীয় সৈন্য ও লোকজন তখন রেসিডেন্সির ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল।

এই সময় সেঙ্গমাই হইতে আসবাব সহিত সৈন্যগণ আসিয়া পৌঁছিল। বাহক মুটেরা ভাব গতিক দেখিয়া দূর হইতেই জিনিষ

পত্র ফেলিয়া পলাইল। সৈনিকগণ কোন মতে রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করিল। সংবাদ আসিল যে, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন এবং রাজদরবার হইতে যুদ্ধের সংবাদ সমুদায় থানা-ব-থানা ও পথের ঘাঁটিতে প্রেরিত হইয়াছে।

বেলা ৪ টার সময় ইংরাজ পক্ষের এমন দুরবস্থা দাঁড়াইল যে, সাহস, বল, বুদ্ধি, আর কিছুই কার্য্যকর হইল না, অথবা ঘটনাসূত্রে সব যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অনেকেই তখন কুইণ্টন ও স্কীনে প্রভৃতির দোষ দেখিতে ও দিতে লাগিল। তাঁহারা নিজেও মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিলেন যে, যুবরাজকে সেরূপে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া মণিপুরীদিগকে উত্তেজিত করিয়া "তুলা ভাল কাজ হয় নাই।

তখন রেসিডেন্সি ভবনে শোক, দুঃখ, আক্ষেপ ও হতাশার ছায়া পড়িয়াছে। আহত ব্রাকেনবরি মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন। অন্য কয়েকজন সাহেবও অল্প বিস্তর আঘাত পাইয়াছেন। প্রাতঃকাল হইতে কাহারও রীতিমত আহার হয় নাই—কাহারও বা একেবারেই ঘটে নাই। একে অনাহার বা অল্পাহার, তাহাতে অবিরত শ্রম ও চিন্তায় শরীর মন অবসন্ন; তথাপি আহার বা বিশ্রামের কথা মনেও নাই। সিংহযূথ মধ্যে একটি মাত্র সিংহিনী বিবি গ্রিমউড ছিলেন। তিনি সেই দুর্দ্দিনে সকল ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে বিবিধরূপে যত্ন ও স্নেহ করিয়া তাঁহাদের শুষ্ক প্রাণে যেন রস-সঞ্চার করিতেছিলেন। তাঁহার সকরুণ পালনে ব্রাকেনবরির মৃত্যুযাতনারও অনেক লাঘব হইয়াছিল।

আবার এদেশীয় গুর্খা সৈনিকগণের কষ্ট ভাবিয়াও কষ্ট হয়। রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণ-ভূমে হাতকাটা, পাভাঙ্গা, ক্ষতদেহ, চলচ্ছক্তিহীন

আহত ও মুমূর্ষগণের দুরবস্থার একশেষ—তখন বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণে ও আত্মরক্ষণে সকল যোদ্ধাই বিব্রত, কে কাহাকে দেখে ?

যুদ্ধের কিন্তু বিরাম নাই। গোলা গুলি বরাবরই চলিতেছে, যত বেলা যাইতেছে, ততই তাহা বাড়িতেছে। ক্রমে ইংরাজ পক্ষের বিপদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য প্রাঙ্গণের প্রাচীরের উপর সৈন্যগণকে উঠাইয়া গুলি চালাইতে আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু রণোন্মত্ত মণিপুরীরা তাহাতেও নিবারিত হইল না। লাভে হইতে আরো ভীষণ ক্ষিপ্রতায় শিলা বৃষ্টির ন্যায় গুলিপ্রপাতে গুর্খারা কদলিতরুর ন্যায় ছেদিত ওভূপতিত হইতে লাগিল। মণিপুরী কামানের গোলাতেও রেসিডেন্সির নানা অংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কয়েটি রক্তবর্ণ গোলা অশ্বশালার উপর পড়াতে তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজকর্ম্মচারিগণের মূল্যবান অশ্ব সকল দাঁড়াইয়া দগ্ধ হইল। ক্রমে বিশৃঙ্খলার এক শেষ এবং রেসিডেন্সি বাটী মণিপুরীদের হস্তগত হয় হয় হইয়া উঠিল। মণিপুরীদের হস্তে বন্দী হইলে কি দশা ঘটিবে, সেই শঙ্কায় সকলেই আকুল এবং কর্ত্তব্য-বিমূঢ় প্রায় হইয়া পড়িলেন।

তখন সন্ধি করিবার কথা কাণা-ঘুষা এবং ক্রমে স্পষ্টতঃ আন্দোলিত হইল। কিন্তু ইংরাজই প্রথমে শান্তিহারক, আক্রমক ও প্রাণনাশক হইয়াছিলেন, এমন বৈরীকে কবলে পাইয়া প্রতিশোধোদ্দীপ্ত মণিপুরীরা সন্ধির প্রস্তাব শুনিবে কি ? ইত্যাদি বাক্য তাঁহাদের আপনা আপনিই বলা কওয়া হইতে লাগিল। এমন সময় দিবাকর মণিপুরের পশ্চিম দিকের ভূধরমালার অন্তরালে লুকাইলেন। তাঁহার অদর্শনের সঙ্গে অন্য কোন উপায়ও আর দেখিতে না পাইয়া, সন্ধির প্রস্তাবে বিপক্ষ পক্ষ সম্মত হয় কি না, তাহার পরীক্ষা দেখাই উচিত বলিয়া স্থির হইল।

তদনুসারে রেসিডেন্সি ভবনের উচ্চ স্থান হইতে সমর-স্থগিতের সাঙ্কেতিক শিঙ্গা ঘোর রবে নিনাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে রব টিকেন্দ্রজিতের কর্ণে প্রবেশ করিল। মহাবীর টিকেন্দ্রজিৎ এমনি উচ্চহৃদয় মহানুভব বৈরী যে, সে সঙ্কেত শুনিবামাত্রই শশব্যস্তে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে দূত পাঠাইলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভীষণ অগ্নিবর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল। রণোন্মত্ত মণিপুরী সৈন্যেরা যুবরাজের আদেশে কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইংরাজ পক্ষ হাঁপ ছাড়িবার সময় পাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই, (বিশেষতঃ গুর্খা প্রভৃতি) মণিপুরীদের ভদ্রতা ও সততার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখ্যাতি অন্যের নয়, কেবলই সদাশয় টিকেন্দ্রের প্রাপ্য। কেননা, মণিপুরীরা তখন যেরূপ উন্মত্ত, তাহাতে টিকেন্দ্রের দৃঢ় আজ্ঞাতে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় মহা-ক্ষুব্ধ হইল। এমন কি, অনেকে ক্রোধে ও দুঃখে দন্তে ওষ্ঠ কামড়াইতে লাগিল। অবিলম্বে সাধারণ মণিপুরী প্রজারা ও হতাহত সৈনিকদের আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া আক্ষেপ ও ক্রন্দনের রোলে চতুর্দ্দিক মহা কোলাহলময় করিয়া তুলিল। যতই তাহারা গুর্খাশবের সহিত আপনা-দের আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ ও দারুণ আহত অবস্থা দেখিতে পাইল, ততই তাহাদের শোকোন্মত্ত হৃদয়ে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাদের মনের ভাব এই যে, অকস্মাৎ মণিপুরের এ শোচনীয় দশা কেন? নিরপরাধে ইংরাজের এ দুঃসহ অত্যাচার কেন? যতই ইহা মনে জ্বলিতে লাগিল, ততই তাহারা পরস্পরে জানিতে চাহিল "যুদ্ধ বন্ধ হইল কেন? এমন নিদারুণ শত্রুকে ধ্বংশের মুখে ফেলিবার সুযোগ পাইয়াও ছাড়া হইতেছে কেন? এমন নির্দ্দয়কেও দয়া?" ক্রমে টিকেন্দ্রের উপর তাহাদের মহারাগ ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল।

কেহ বা এমন কথাও স্পষ্ট বলিতে লাগিল যে, হয় তো তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ সাধন জন্যই লড়াই বন্ধ করিলেন। কেহ কেহ বা ক্ষিপ্তবৎ টিকেন্দ্রকেও বধ করিয়া মনের দুঃখ মিটাইতে চাহিল। সামরিক কর্ম্মচারীরা এই অনর্থকারী মত্ততার ভাব বুঝিতে পারিয়া মিষ্টবাক্যে ও সময়োচিত যুক্তির প্রবোধে অতি কষ্টে সৈনিক ও সাধারণ প্রজাদিগকে যদি শান্ত না করিতেন, তবে সেই ক্ষিপ্ত জনতায় কি মহাপ্রলয় ব্যাপার ঘটাইত, বলা যায় না।

এদিকে, ভয়ানক ঝটিকা থামিয়া গেলে বনস্থলী যেমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত লক্ষিত হয়, রেসিডেন্সি মধ্যেও সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা। কিছু পরে, চিফকমিশ্নার মহাশয়, মহারাজকে পত্র লিখিলেন। কেরাণী রসিক বাবু প্রাতেই স্থানান্তরে পলায়ন করাতে, ইংরাজী ভাষাতেই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলেন। সে পত্রার্থ এই, "আপনি কি সর্ত্তে আমাদের উপর গোলা গুলি ক্ষেপণ বন্ধ করিবেন এবং টেলিগ্রাফের ছিন্ন তারের মেরামত করিতে দিয়া গভর্ণর জেনারেলকে সংবাদ পাঠাইতে ও তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে অবসর দিবেন?"

মিঃ গ্রিমউড সেই পত্র-হস্তে মালখানার ফটকের বাহিরে গিয়া একজন মণিপুরীকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা সেখানি পাঠাইলেন। তৎপরেই তিনি এবং মিঃ কুইন্টন ও কর্ণেল স্কীনে প্রভৃতি মালখানায় গিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহাদের এইরূপ ধরণের কথোপকথন হইয়াছিল।

স্কীনে। যাহা স্বপ্নেও ভাবা যায় নাই, তাহাই ঘটিল।

গ্রিম। পশ্চাদনুশোচনা বৃথা। এখন মান বাঁচাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করাই উচিত।

কুই। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি?

গ্রি। আমার মতে এখনই রেসিডেন্সি ছাড়িয়া প্রস্থান করা উচিত। প্রায় এক ক্রোশ দূরে প্রশস্ত-শির সমুচ্চ এক গিরি আছে, আমি জানি। আমরা যদি তথায় উঠিয়া বৃক্ষতলাদিতে আশ্রয় লই—

কুই। সেখানেও তো মণিপুরীরা অনুসরণ করিতে পারে?

গ্রি। তথায় তাহারা আক্রমণ করিলেও আমাদের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাদের কামান এখন যে ভাবে বসান আছে, তাহাতে গোলা তত উর্দ্ধে উঠিবে না।

স্কী। তবে সেইরূপ স্থানেই এখনি যাওয়া কর্ত্তব্য। এস্থান হইতে তথায় যে অধিক নিরাপদ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রি। আরো ভাবিয়া দেখুন, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হওয়া দেখিয়া কোহিমা ও গোলাঘাট প্রভৃতি স্থানীয় কর্ম্মচারীরা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের বিপদ ঘটিয়াছে। আবার কাপ্তেন কাউলি তো সৈন্য লইয়া আসিতেছেন। যদবধি অপর সৈন্য সাহায্য না আইসে, সে সময় পর্য্যন্ত সেই শেখরে আমরা অনায়াসে মণিপুরীদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিব। উচ্চস্থানের সুবিধা বিস্তর। সেখানে—

কুই। উচ্চস্থানের সুবিধা যে অনেক, তাহা আমি বুঝি; কিন্তু মণিপুরীদের যেরূপ বল বিক্রম কৌশল আমি দেখিতেছি, তাহাতে সেখানেও যে আমরা যুদ্ধ করিয়া আত্ম রক্ষায় সমর্থ হইব, সে আশা আমার নাই। বিশেষতঃ তাহারা যদি উচ্চ স্থানেই কামান বসায়, তখন কি উপায়?

গ্রি। কামান লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখিলেই, আমরা পাহাড় হইতে সহসা নামিয়া আসিয়া আক্রমণ করিব ও কাড়িয়া লইব। একবার কামান কয়টা হাতে পাইলেই তো—

কুই। কল্পনা অপেক্ষা কার্য্য করা অনেক কঠিন।

স্কী। আপনার কথা ঠিক—মণিপুরীরা যে সামান্ত শত্রু নয়, তাহা আমিও বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।

কসিন্স। এ দেশ হইতে সদলে একেবারে প্রস্থানই, আমার মতে সুযুক্তি।

স্কী। এ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমার দুর্ভাবনা বাড়িতেছে; মিঃ কসিন্সের মতানুযায়ী প্রস্থানই উচিত বলিয়া মনে লাগিতেছে।

কুই। এইরূপ করাই উচিত বলিয়া আমিও মনে করি; কিন্তু কার্য্যে তাহা আমরা পারিয়া উঠিব কিরূপে? আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারে যে, সেরূপচেষ্টা করিলেই হয় আমরা সকলেই হত, নয় বন্দীকৃত ও অশেষ-বিশেষরূপেই অপমানিত হইব। রাজদরবার হইতে এই যুদ্ধের সংবাদ যে দেশময় বিশেষতঃ প্রত্যেক থানা ও ঘাঁটিতে দেওয়া হইয়াছে, সে কথা তো আপনারাও শুনিয়াছেন।

গ্রি। তবে ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে আপনার মত কি?

কুই। রেসিডেন্সিতে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই আমাদের পক্ষে নিরাপদে থাকা অসম্ভব। পলায়নের চেষ্টা করিলেও মণিপুরী, নাগা, কুকি হইতে মৃত্যু অথবা বন্দীর দুর্দ্দশা নিশ্চিত। এক্ষেত্রে এমন কোন সন্ধির চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে মানও বাঁচে, সকলের প্রাণও রক্ষা হয়।

গ্রি। প্রাণরক্ষার ভাবনাই এখন বেশী। এক তো যুদ্ধ স্থগিতের সঙ্কেত করাতেই আমাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে বাকী নাই। তৎপরে নরমভাবে পত্র লেখাতেই বিশেষ খাট হইতে হইয়াছে। ইহার উপরে এখন আবার সন্ধির ভিখারী হইলে—

কুইন্টন। বস্তুতঃই এসকল কথা ভাবিয়া দারুণ কষ্ট হইতেছে; কিন্তু যখন উপায় নাই—

ইত্যবসরে একজন মণিপুরী একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে তাহা খুলিয়া দেখা হইল যে সেখানি মহারাজেরই পত্র বটে। পত্রখানি বাঙ্গালায় লেখা। মিঃ গ্রিমউড ও মিঃ কসিন্স তাহা আস্তে আস্তে পড়িতে ও সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জমা করিতে লাগিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই ;—"আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না ; কিন্তু আপনাদের পক্ষীয় সৈন্যেরা, সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করায় আমার লোকেরা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমার প্রাসাদে উপস্থিত কেহই নাই যে ইংরাজী ভাষা পড়িতে ও বুঝিতে পারে। * কিন্তু সমর-স্থগিতের পরেই আপনার পত্র পাইয়া আমি বুঝিতেছি যে, আপনি সন্ধি করিতে চাহেন। আপনাদের সৈন্য সামন্তেরা যদি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করে, তবে এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি।"

কুইন্টন জিজ্ঞাসা করিলেন "অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করার" অর্থ কি ?

---

* রাজকেরাণী বামন চরণ বাবুর পূর্ব্বরাত্রে সপরিবারে স্থানান্তরে প্রস্থানের কথা আমরা অগ্রেই লিখিয়াছি। চিফকমিশনারের ইংরাজি পত্রের তর্জ্জমার জন্য, নানা স্থানে বহু লোক সন্ধান করিয়া, রাত্রি প্রায় ৯॥০ টার সময়, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। তিনি তৎপরে সেই পত্রের অনুবাদ করিয়া দিলেন। আবার তিনি রাত্রি ১২॥০ টার সময় ১ খানি পত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আমরা বিষম ফাঁদে পড়িয়াছি—তাহারা আমাদের বন্দুকাদি চাহিতেছে।" এই কথাগুলি এক টুকরা কাগজে, পেন্সিলে লেখা—শিরোনাম ও দস্তখত না থাকায়, কে কাহাকে লিখিতেছে বুঝা যায় না। কিন্তু মনে হয় যে, মহারাজের পত্র পাইবার পর, ইংরাজ কর্ম্মচারীরা, সেইটুকু লিখিয়া, সেঙ্গমাইয়ের তার আফিসে উইলিয়মস্ সাহেবের নিকট পাঠাইতেছিলেন। তাহা পাইলে তিনি, গভর্ণমেণ্টের কোন আড্ডায় সংবাদ দিতে পারিতেন। কিন্তু সেখানি মণিপুরীদের হস্তগত হইয়াছিল।

কসিন্স। বন্দুক প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া বা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া। সে ক্ষেত্রে আমাদের অস্ত্রাদি মণিপুরীদের কর্তৃত্বাধীন হইবে।

গ্রিমউড। তাহা কেন? আমার বোধ হয় যে, ইহার অর্থ কেবল যুদ্ধ বন্ধ করা মাত্র।

কুইন্টন। যুবরাজতো রাজবাটীর পশ্চিম ফটকে এখন আছেন শুনা গিয়াছে—প্রকৃত অর্থ কি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে ভাল হয়।

গ্রিমউড। (পত্রবাহক মণিপুরীর প্রতি) চিফকমিশনার অথবা আমরা কেহ গেলে, যুবরাজ দেখা করিবেন কি?

মণিপুরী। অবশ্যই করিবেন।

কুইন্টন। আমাদের এখন যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া কি নিরাপদ মনে করেন?

গ্রিমউড। সে জন্য কোন ভয়ই নাই। (মণিপুরীর প্রতি) কেমন তুমি শপথ করিয়া বলিতে পার যে, সেখানে গেলে আমাদের কোন বিপদ ঘটিবে না?

মণিপুরী। আপনাদিগকে আমরা দেবতা তুল্য ভক্তি করি। আমাদের দ্বারা আপনাদের অমঙ্গল ঘটিবে কেন?

গ্রিমউড। যুবরাজের পরিবার-ভুক্ত অনুচরদের মধ্যে এই ব্যক্তি একজন গণ্য লোক। আমি ইহাকে বিশেষ জানি। যখন এ অভয় দিতেছে, তখন আমাদের গমন পক্ষে কোন আপত্তিই আর দেখি না।

কর্ণেলস্কীনে, তাঁহার কথার পোষকতা করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই অর্থাৎ কুইন্টন, স্কীনে, গ্রিমউড, সিম্‌সন, কসিন্স প্রায় রাত্রি ৮॥০ টার সময়, মালখানার ফটক দিয়া রেসিডেন্সির বাহির হইলেন। নিয়তি একজন (বিগেল) শিঙ্গাবাদ্যকারী সিপাহীকেও তাঁহাদের সহিত টানিয়া লইল। কর্ণেল স্কীনের কথামত, লেঃ চেটার্টন, দুই খানি কেদারা দিয়া,

তাঁহাদের পশ্চাতে সেই সিপাহীকে পাঠাইলেন। তাঁহারা যাঁহাকে স্বদেশ, ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, স্ত্রী পুত্রাদি সকল প্রিয় পদার্থ হইতে বলপূর্ব্বক অন্তর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এখন ঘটনাচক্রে পড়িয়া সেই যুবরাজের নিকট উপযাচক হইয়া গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

সাহেবেরা যখন রাজপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন যুবরাজ তোপখানায় শুইয়াছিলেন। অগ্রে অঙ্গেয় মিঙ্গতোকে পাঠাইয়া আপনিও অবিলম্বে নামিয়া আসিলেন। সে সময় দরবার-গৃহটি বন্ধ থাকাতে কেদারা আনাইয়া কেল্লার ভিতর প্রাঙ্গণে তাঁহাদিগকে লইয়া বসিয়া মজলিস করিলেন। কোন কোন মন্ত্রী প্রভৃতি আসিয়াও মিলিলেন। তাঁহাদের কিছু দূরে প্রায় চারি দিকেই বিস্তর মণিপুরী সৈনিক ও সাধারণ প্রজাগণ দলে দলে দাঁড়াইয়া নানারূপ কাণাযুষ, পরামর্শ, অনুমান ও কল্পনাময় অভিপ্রায় প্রকাশে নিযুক্ত রহিল। তন্মধ্যে কেহ বা সাহেবদের নিন্দা, কেহ বা যুদ্ধ বন্ধ করায় টিকেন্দ্রকে কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। কেবল ভয়ে কেহ উচ্চরবে কোন কথাই বলে নাই। কিন্তু দরবারের ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই যেন উদ্‌গ্রীব।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইল। যুবরাজ বলিলেন "আপনাদের ব্যবহারে আমাদের বড়ই ভয় হইয়াছে, সুতরাং অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ ভিন্ন সুদ্ধ মুখের কথায় আর বিশ্বাস হয় না।" ইংরাজের পক্ষে ইহা অবশ্যই মান হানিকর, অতএব চিফকমিশনার সম্মত হইলেন না। টিকেন্দ্রজিৎ সাহেবদের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্বন্ধে যেন চিন্তায় আকুল হইলেন। চিফকমিশনার শেষে বলিলেন "কল্য প্রাতে আর একটি দরবার হইবে।" এই কথার পরেই সাহেবেরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। টিকেন্দ্রও যেন ভাবনায় বিভোর হইয়া অন্যমনস্ক ভাবে তোপখানার দিকে চলিলেন।
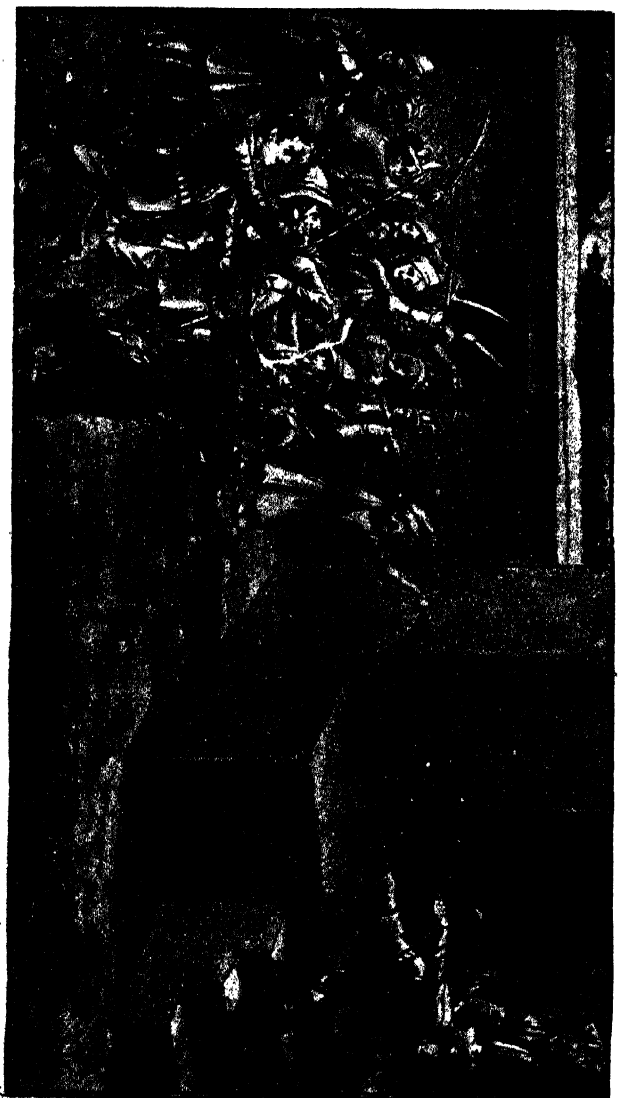
ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে মণিপুরীদের আক্রমণ।

১৫৩ পৃষ্ঠা।

যুবরাজ বৃষ্টির বাহির হইবামাত্রেই মণিপুরীরা গোলমাল করিয়া উঠিল। গ্রিমউড তখন মন্ত্রী অঙ্গেয় মিঙ্গতোকে বলিলেন "আপনি আমাদিগকে রাজবাড়ীর বাহির পর্যান্ত নিরাপদে পৌঁছিয়া দিয়া আসিবেন—চলুন।" অঙ্গেয় মিঙ্গতো উচ্চরবে যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি সাহেবদের সহিত যাইব ?" টিকেন্দ্রজিৎ দূর হইতে বলিলেন—"নিশ্চয়ই।"

যেখানে মজলিস হইয়াছিল, তাহার প্রায় একশত হাত দূরে যে দরজা, তাহা দিয়া সাহেবেরা বাহির হইবার আশায় যাইতেছিলেন। কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই ক্ষিপ্ত মণিপুরীরা কপাট বন্ধ করিয়া দিল ও সাহেবদিগকে বন্দুকের কুন্দার দ্বারা ও ইট-পাটকেল ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই সকলে, বিকট চীৎকার— "মার মার—কাট কাট" শব্দ করিয়া উঠিল। সাহেবেরা শশব্যস্ত হইলেন। লেঃ সিম্‌সন ফটকের উপরের ঘরের মধ্যে পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেখানে একজন মণিপুরী তাঁহার মস্তকে তরবারির দ্বারা কঠিনরূপে আঘাত করিল। রাজসরকারের জমাদার থাত্রাসিংহ আসিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল এবং নিজের পাকড়ি খুলিয়া ক্ষত স্থান বান্ধিয়া দিল। সিম্‌সন রুধিরাক্ত কলেবরে নীচে আসিয়া অন্যান্য সাহেবদের সহিত দরবার গৃহের দিকে ফিরিলেন। মণিপুরীরাও উন্মত্তবৎ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। দরবার ঘরের থাপের নীচে তাহাদেরই একজন গ্রিমউডকে এমন এক বর্শার খোঁচা মারিল যে, তিনি সেই আঘাতেই সেইখানেই পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইলেন।

মন্ত্রীবর অঙ্গেয় মিঙ্গতো, জমাদার থাত্রাসিংহ এবং উইখগি, উন প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা বরাবরই সাহেবদের রক্ষার্থ প্রাণপণ

পাইতেছিল। এখন বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া যাত্রাসিংহ জোরে ধাক্কা দিয়া দরবারের ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল।

ওদিকে ভয়ানক গোলযোগের শব্দ যুবরাজের কর্ণে প্রবেশ মাত্রই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। উত্তেজিত উগ্রমূর্ত্তি সৈনিকাদি সকলকেই দূরে যাইতে বলিলেন, এবং একগাছি ছড়ি লইয়া সকলকে মারিতে লাগিলেন। তাহারাও ছত্রাকারে চারিদিকে পলায়ন করিল। যুবরাজ চিফকমিশনারের নিকটে আসিয়া কি কথা যে কহিলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই—আর পাইবেও না। তৎপরে অঙ্গেয় মিঙ্গতোর উপর সাহেবদিগকে তথায় সযত্নে রক্ষা করিবার ভার দিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন। অঙ্গেয় মিঙ্গতো সেখানে সাহেব-দিগকে সুরক্ষার জন্য ৮।১০ জন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।*

বৃদ্ধ মন্ত্রী থঙ্গাল জেনারেলও ক্ষণেক পূর্ব্বে সাহেবদের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি তোপখানায়। তিনি সেইখান হইতেই "মারকাট" শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং গ্রিমউডের হত্যা ও অন্যান্য সাহেবদের রক্ষার বিষয়ে যুবরাজের ব্যবস্থারও সংবাদ লইলেন। নানা চিন্তায় বৃদ্ধের মন তখন আন্দোলিত। সে গৃহে তখন আর কেহই নাই, কেবল একজন বিশ্বস্ত মণিপুরী কর্ম্মচারীর সহিত তিনি নানারূপ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত। হঠাৎ দ্বার রক্ষক আসিয়া "একজন মণিপুরী প্রবেশ করিতে চাহিতেছে" বলিল এবং অনুমতি পাইয়া একজন প্রবীণকে সঙ্গে করিয়া আনিল। প্রবীণ আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল "বাল্যকাল হইতে যাহা শুনিয়া আসিতেছি, এত দিনে আজ তাহাই ফলিল।"

* যুদ্ধ স্থগিতের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিচার অধ্যায়ে এবং ২২ নং দলীলের ১১ দফা হইতে ১৯ দফা এবং ৩৪ নং দলীলের ৭৩ হইতে ৭৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

থঙ্গাল। তুমি কি বলিতেছ?—খুলিয়া বল।

প্রবীণ। আপনি কি শুনেন নাই যে, আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, "মণিপুরে বিষম যুদ্ধ বাধিবে; সে সময় ৫ জন শত্রুর শোণিত দেবোদ্দেশে উৎসর্গ এবং তাহাদের পঞ্চ মুণ্ড একত্রে একটি খাদে প্রথিত করিতে না পারিলে, কিছুতেই মঙ্গল হইবে না।"

থঙ্গাল। কতবার শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কোন্ গ্রন্থে লিখিত, দেখি নাই।

প্রবীণ। আমি তাই আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে আসিলাম। সেই যুদ্ধই এই এবং সেই নরবলির উপযুক্তই এই পঞ্চ ইংরাজ। এক জনকে তো উৎসর্গ করা হইয়াছে। যুবরাজ নিবারণ না করিলে আর ৪ জনকেও এতক্ষণে হইত।

এই কথা বলিতে বলিতে প্রবীণ লোকটি হস্ত আস্ফালন করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

থঙ্গাল। ক্ষান্ত হও—তুমি বড় বিচলিত হইয়াছ—

প্রবীণ। আমি স্থির থাকিব কিরূপে? আমার দুইটি পুত্র, মহারাজের সিপাহী ছিল। দুই জনকেই আজিকার যুদ্ধে হারাইলাম। একজন মরিয়া গিয়াছে—আর এক জন এখনও এরূপ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, যে তাহা আর আমি দেখিতে—উঃ! এইরূপ বলিতে বলিতে সে উন্মত্তের মত স্বীয় বক্ষে বারম্বার করাঘাত করিতে লাগিল। উপস্থিত কর্ম্মচারী তাহাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

থঙ্গাল। বস্তুতঃ ইংরাজেরা আজি যেরূপ অধর্ম্ম ও অনর্থ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড করা উচিত।

কর্ম্মচারী। কিন্তু এখন যে তাহারা আশ্রিত ও অনুগত হইয়াছে—

থঙ্গাল। দায়ে পড়িলে সকলেই অনুগত হয়। তাহারাই তো

বিনা কারণে অগ্রে আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে। এখন কেবল বিপাকে ঠেকিয়া নরম, আবার নির্লজ্জতা কত দেখ! উপযাচক হইয়া পুরীর মধ্যে ৫ জনে আসিয়াছে! যুবরাজ গিয়া তাহাদের কাছে যদি এইরূপ আশ্রিত হইতেন, তাহা হইলে তাহারা কি করিত?

কর্ম্মচারী। তাঁহার প্রাণদণ্ড করিত কি?

থঙ্গাল। তাহা যে করিত না, এমন বিশ্বাস তো আমার হয় না। স্বার্থ সাধনের জন্য ইংরাজেরা সকল কার্য্যই করিতে পারে। আর যুবরাজের প্রাণদণ্ড না করিলেও, চিরনির্ব্বাসিত করিত, এ কথা নিশ্চয়।

কর্ম্মচারী। যুবরাজ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন—ইংরাজেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় যথার্থই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা—

থঙ্গাল। ম্লেচ্ছের সহিত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মোচিত ব্যবহার করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। আমরা যুদ্ধ স্থগিত করিতে চাহিলে, তাহারা কি শুনিত?

প্রবীন। কোন মতেই না—তাহাদের সকলকেই হত্যা করা উচিত। আপনি আমাদের মুখ রক্ষা করুন—দেশের মঙ্গল করুন।

এইরূপ কথার পরে থঙ্গাল জেনারেল ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উসর্ব্বা নামক জমাদারকে ডাকিয়া সাহেবদিগকে হত্যার হুকুম দিলেন।* সেই আদেশ শুনিয়া প্রবীন মণিপুরী, হঠাৎ শোক দুঃখ ভুলিয়া, উল্লা-

---

* থঙ্গাল বলিলেন "সাহেব লোকগি মচিল টপ ছিলো"—অর্থাৎ সাহেবদের মুখ (কুকুরের মত) বন্ধ করিয়া দাও।

সিক্ত হইয়া উঠিল এবং "আমি ঘাতুক ডাকিয়া আনিগে" বলিয়া সবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

আমাদের ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধান আছে "অতিথি সর্ব্বদেবময় —মহাশত্রুও গৃহে অভ্যাগত হইলে তাঁহাকে যত্নে আপ্যায়িত ও সৎকার করা উচিত।" কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আজি বৃদ্ধ থঙ্গাল জেনারেল আশ্রিত ইংরাজগণের প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ দিলেন। মহারাজ তখন খাস মহলে, যুবরাজ তখন দক্ষিণ ফটকে, রাত্রি প্রায় ১০টা— থঙ্গাল জেনারেল তাঁহাদের সহিত কোন পরামর্শ ব্যতীতও এই সাঙ্ঘাতিক আদেশ প্রদান করিলেন। এই ভয়ানক বাক্য উচ্চারণের পূর্ব্বে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল না কেন? ইহাতে হিন্দু নামে কলঙ্ক ঘোষিত—হিন্দু গৌরব অবনত হইয়াছে।

থঙ্গালের আজ্ঞায় কত কাল ধরিয়া কত শত লোকের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু থঙ্গালের অদ্যকার আজ্ঞা অতি গুরুতর— অতি গর্হিত। এই জন্যই উসর্ব্বা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল এবং ক্ষণেক পরে যাত্রাসিংহকে সঙ্গে লইয়া, যুবরাজের নিকট গিয়া সেই কথা জানাইল। তাহা শুনিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন "অঁ্যা!—বল কি?—থঙ্গাল জেনারেল কি এমন ভয়ানক কথা বলিয়াছেন!—না, তাহা হইবে না—আমি যাইতেছি।"

টিকেন্দ্রজিৎ শশব্যস্তে তোপখানায় আসিয়া বলিলেন "ঠাকুরদাদা! একি ভয়ানক কথা শুনিতেছি—আপনি নাকি ইংরাজদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছেন?"

থঙ্গাল। হাঁ দিয়াছি তো বটে—যেরূপ ব্যাপার—

যুবরাজ। আপনি বলেন কি!—

থঙ্গাল। তুমি নিতান্ত বালক—যেরূপ বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে,

তাহাতে ইংরাজের সহিত আর আমাদের সদ্ভাব হইবার আশাই নাই। তবে কেন ন্যায্য শাস্তি—

যুবরাজ। ঠাকুরদাদা! বিপন্ন, আশ্রিত জনকে হত্যা!—এমন বিষম পাপের কথা—

থঙ্গাল। ওহো পাপ!—ঘৃণিত শঠ শত্রুকে বিনাশ করায় পাপ কিসের? টাংলি মারিলে পাপ হয় নাকি?

যুবরাজ। (কথা কহিতে কহিতে শুইয়া পড়িলেন) ইংরাজদের সহিত পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করা যাইবে। কল্য প্রাতে মহারাজের সহিত যুক্তি করিয়া—

থঙ্গাল। ভায়া! তুমি বড় নির্ব্বোধ—ইংরাজ কি আর আগেকার মত ধার্ম্মিক আছে? এখন তাহাদের যত প্রতাপ বাড়িতেছে, যত রাজ্য বাড়িতেছে, ততই তাহারা ধর্ম্মহীন ও স্বার্থপর হইতেছে। আমি মহারাজা গম্ভীর সিংহের আমলের লোক—তোমার বাপ চন্দ্রকীর্ত্তিকে জন্মাইতে দেখিয়াছি—এই বয়সে ইংরাজদের কত কাণ্ডকারখানাই দেখিলাম—

যুবরাজ। তা যাহাই হউক, ইংরাজেরা বড় সামান্য লোক নহে। ঠাকুরদাদা! ইংরাজদের হত্যা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এমন অধর্ম্ম—

থঙ্গাল। কোন ভয় নাই—আমি তাহাদের দলবলকে মণিপুর রাজ্য ছাড়া করিয়া কাছাড় পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিব।

যুবরাজ। কোনমতেই ইংরাজদিগকে হত্যা করা হইবে না। আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি—

থঙ্গাল। তোমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ হইয়াছে। তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্যই মণিপুরে আজি এ ভয়ানক দুর্দ্দৈবের সংঘটন।

তোমার দায়ে—ইংরাজের বদমাইসিতে কত মণিপুরীর আজ প্রাণ গিয়াছে—দেশময় লোক হাহাকার করিতেছে—আবার তুমিই ইংরাজদের পোষকতা করিতেছ ?

যুবরাজ। আপনি এ কুঅভিপ্রায় ত্যাগ করুন।

এইরূপ কথার কিয়ৎক্ষণ পরে থঙ্গাল জেনারেল ইয়েঙ্গকর্ব্বা নামক জনৈক সর্দ্দার চাপরাশিকে বলিলেন "যুবরাজ ইতিপূর্ব্বে তোমাকে সাহেবদিগকে ঘাতক-হস্তে সমর্পণ করিতে বলিয়াছেন, তুমি কেন তাহা কর নাই ?" টিকেন্দ্রজিৎ তখন শুইয়াছিলেন এবং ইয়েঙ্গকর্ব্বা দেখিয়াই বুঝিয়াছিল যে, তিনি ঘুমাইয়াছেন। যুবরাজ নিজে তাহাকে এমন কথা বলেন নাই, তথাচ থঙ্গালের কথায় সে ভাবিল, অবশ্যই তবে যুবরাজের আদেশ হইয়া থাকিবে। ইহাই বুঝিয়া সে, দরবার-গৃহে সাহেবদের যাহারা রক্ষক ছিল, তাহাদের প্রধান যাত্রাসিংহ ও উসর্ব্বা প্রভৃতিকে থঙ্গাল জেনারেলের দ্বিতীয় হুকুমের কথা বলিল।

অনতিপরেই মহারাজের লৌহকার মিস্ত্রী (টাংজাবা) জৈমন আসিয়া সাহেবদের পদে শৃঙ্খল লাগাইবার জন্য উপস্থিত হইল। সাহেবদের সহিত শিঙ্গাবাদ্যকারী গুর্খা সিপাহীর পদেও নিগড় লাগাইয়া দিল। পরে প্রহরীরা কুইন্টন প্রভৃতিকে একে একে বাহির করিয়া দিল এবং সাগল্লেসবা ধনসিংহ নামক একজন রাজকীয় ঘাতুক টেঙ্গাং টাং নামক দা দ্বারা তাঁহাদের মুণ্ডচ্ছেদন করিতে লাগিল। এবং থঙ্গাল জেনারেলের কোন আজ্ঞা ব্যতীত ও সেই সঙ্গে ইংরাজ-সহচর সিপাহীরও প্রাণ বিনষ্ট হইল। মণিপুরীরা গ্রিমউড প্রভৃতি সকলের মস্তক একত্রে একটি খাদে প্রোথিত করিয়া, শাস্ত্রের অভিপ্রেত কার্য্যসাধনজ্ঞানে, পরম আহ্লাদিত হইল। কিন্তু গম্ভীর সিংহের বংশের রাজলক্ষ্মী যে মহা দুঃখিত ও আতঙ্কিত হইয়া, মণিপুর

রাজপুরী হইতে তদ্দণ্ডেই অন্তর্ধান করিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইংরাজের পলায়ন ও পরবর্ত্তী ঘটনা।

কুইন্টন প্রভৃতি রাজবাটীতে গেলে, রেসিডেন্সিস্থ অবশিষ্ট ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা, আহতদের সুশ্রূষায় ও আপনাদের আহারাদির বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলেন। আহত ব্রাকেনবরি ও অনেক আহত গুর্খা সিপাহী-দের মৃত্যু ঘটিল।

রাজবাড়ীর যেখানে বসিয়া মজলিস হইয়াছিল, তাহা রেসিডেন্সির উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে ২০০ হাতের অধিক দূর হইবে না। তবে মধ্যে অবশ্যই গভীর পরীখা ও প্রাচীর ব্যবধান আছে। রেসিডেন্সি হইতে সে মজলিস সুদৃষ্ট হইতেছিল। যেহেতু শুক্লা চতুর্দ্দশীর শশী উজ্জ্বল কিরণে সর্ব্বস্থান আলোকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক-ক্ষণ কেহই দেখিতে পারিলেন না, সকলেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

লেঃ চেটার্টন আহার করিয়াই নিদ্রা গেলেন। অবশিষ্টের মধ্যেও হয় তো অনেকেই তাঁহার অনুকরণ করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহবা গল্প গুজবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সর্ব্বসন্তাপহারিণী আরাম-দায়িনী সুরা সে রাত্রে রেসিডেন্সিতে ছিল কি? না থাকিলেও সে রাত্রে তাঁহারা যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে মদোন্মত্ত ভাবা ন্যায়েরই কার্য্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কাপ্তেন বইলো লেঃ চেটার্টনের ঘুম ভাঙ্গাইলেন। তখন সকলে রাজবাড়ীর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাজবাড়ীর পশ্চিম ফটকে ও রেসিডেন্সির মধ্যবর্ত্তী পথেও কাহাকেও দেখা গেল না। তখন একটু ভাবনা হইল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! রাত্রি প্রায় ৮॥৹ টার সময় কুইন্টন প্রভৃতি রাজবাড়ীতে গিয়াছিলেন—আর তখন দ্বিপ্রহর অতীত—এই ৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঘোর বিপদ-সঙ্কুল শত্রুভবনে কুইন্টন প্রভৃতি কি করিতেছেন—সেখানে কি হইতেছে—তাঁহাদের ফিরিতে এত অন্যায়রূপ বিলম্ব হইতেছে কেন—ইত্যাদি বিষয়ে রেসিডেন্সির কাহারঁও কোন খোঁজখবর ছিল না। এমন বুদ্ধিও কাহারও হইল না যে, দূত পাঠাইয়া বা ৪।৫ জনে মিলিয়া আপনারা গিয়া তাঁহাদের বিলম্বের কারণ জানেন। রেসিডেন্সির ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তখন যেন ঠিক খাস-নবাবী-মেজাজে বা মদের ঝোঁকে ছিলেন। তাহাতেও এমন বিপদের সময়ে এমন ঘটা সম্ভব হয় না। তাঁহারা সে প্রকার দূষণীয় ভাবে উদাস বা নিদ্রিত না থাকিয়া, যদি প্রকৃত ইংরাজের ন্যায় কর্ত্তব্য-কার্য্য করিতেন, তবে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, হয় তো কুইন্টন প্রভৃতির মহৎ প্রাণ কয়টি, সে প্রকার নির্দ্দয়রূপে হত হইতে পারিত না—তাঁহাদের সতর্ক চেষ্টা দেখিলে দুষ্কৃতিপরায়ণ শৃগাল প্রভৃতি অবশ্যই কিছু ভয় পাইতেন—অবশ্যই টিকেন্দ্র জাগরিত হইয়া গোলমালের কারণ জানিয়া হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতেন—যদি না করিতেন, তবে তাঁহার দোষ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিত না।

কিন্তু যাহা হইবার নয়, হইবে কেন! যাহা হইয়াছে, তাহাই বলি। প্রায় রাত্রি ১টার সময় যখন কাপ্তেন বইলো প্রভৃতি রাজবাড়ীর দিকে চাহিয়া, রেসিডেন্সির পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন,

তখন প্রাসাদের পশ্চিম ফটকের নিকট একজন মণিপুরী তাহার স্বদেশীয় ভাষায় উচ্চস্বরে ডাকিয়া কি বলিল। সাহেবেরা তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য, রেসিডেন্সিতে তখন যে সকল মণিপুরী সৈনিকাদি বন্দী ছিল, তাহাদের মধ্যে ১ জনকে আনাইলেন। অমনি রেসিডেন্সির মালখানার ঠিক বিপরীত দিকে রাজপাটের প্রাচীরের উপর, রেসিডেন্সি হইতে প্রায় সওয়াশত হস্ত দূরে যে কামান স্থাপিত ছিল, তাহা হইতে বিষম অনলোদ্গীরণ আরম্ভ হইল। পীড়িত টিকেন্দ্র তখন নিদ্রিত।

মণিপুরীরা তাহার কিয়ৎ পূর্ব্বেই কুইণ্টন প্রভৃতির প্রাণদণ্ড করিয়াছে। এবং রাজপুরীর সর্ব্বস্থানেরই সৈন্যসামন্তকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখা হইয়াছে যে, সঙ্কেত করিলেই যেন সকলে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তদনুসারে অপর সকলকে সতর্ক করিয়া, পূর্ব্বোক্ত মণিপুরী পশ্চিম ফটকের নিকটে আসিয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে "চিফকমিশনার ও তাঁহার সঙ্গীগণ আর ফিরিবেন।না।" অমনি কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে বন্দুকের গুলি চলিতে লাগিল। মণিপুরীরা ৪টি কামান এমন ভাবে স্থাপিত করিল যে, তন্নিক্ষিপ্ত গোলায় রেসিডেন্সির ভঙ্গপ্রবণ দেওয়াল সকল চূরমার হইতে লাগিল। আবার পরিখার অপর পার হইতে অবিরত বন্দুকের গুলি আসাতে রেসিডেন্সির সকলেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। গ্রিমউড প্রভৃতির কি দশা হইয়াছে, তখনও তাঁহারা জানেন না—পাঁচ ঘণ্টার পরে, তাঁহারা অনুমান করিলেন যে, মণিপুরীরা অবশ্যই তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়াছে।

তখন সকলে মিলিয়া সসৈন্যে, মহোদ্যমে ও প্রচণ্ডতেজে, অকস্মাৎ হল্লা দ্বারা রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করা সাহেবদের কর্ত্তব্য

ছিল। তাঁহারা পরের রাজ্যে বীরবেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন—তাঁহাদের দেখান উচিত ছিল যে, তাঁহারা যথার্থই সে কার্য্যের উপযুক্ত বটেন। এইরূপ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ একটা অনুকূল ফলোৎপন্ন হইত। অন্ততঃ ওরূপে নিরূপায়, নিরাশ্রয় ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পলাইতে হইত না। কিন্তু করে কে? তেমন পরিচালক কেহই ছিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহাদের মনে যে তেমন কোন কল্পনারও উদয় হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। তাঁহাদের সকল দর্প তখন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ক্রমে মণিপুরীরা রেসিডেন্সির চারিদিক ঘিরিয়া গুলি চালাইতে লাগিল এবং ইংরাজ-পক্ষ প্রাণের দায়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মণিপুরীরা গোলা-গুলিতে মালখানার দরজা ও অন্যান্য স্থান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল—কামানের গোলায় নানা স্থানের প্রাচীর হুড়ুম-হুড়ুম শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—ইংরাজ পক্ষের আর বল, বুদ্ধি, সাহস, আশা, ভরসা কিছুই রহিল না। কাপ্তেন বইলো, বুচার, লেঃ লুগার্ড ও উড্স প্রভৃতি যখন দেখিলেন যে, মণিপুরীরা ধনাদি লুটিতে আরম্ভ ও রেসিডেন্সিস্থ মণিপুরী বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছে, সেই অবসরে তাঁহারা বিবি গ্রিমউডকে ঘরের বাহির করিলেন এবং প্রায় ২০০ গুর্খা সৈন্য সমভিব্যাহারে, খিড়কির দ্বার দিয়া, কাছাড়ের রাস্তায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। আসবাব পত্র প্রায় সমস্তই এবং অনেক বন্দুকাদি পড়িয়া রহিল—মণিপুরের রাজ-কারাগারে অনেক সৈন্যাদি বন্দীদশায় থাকিল এবং রেসিডেন্সির মৃত সৈনিকাদির সৎকারের কোন ব্যবস্থাই হইল না। শুনা যায় যে, অনেক আহত, উত্থান-শক্তি-রহিত অথচ জীবিত সৈনিকদিগকে ইংরাজেরা ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অধিক কি যখন

অত সুসভ্য বীরপুরুষ সত্ত্বেও বিবি গ্রিমউডের বেশভূষা ও ভাল জুতা বিশেষতঃ টুপি পর্য্যন্তও ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল, তখন তাঁহারা যে কিরূপ অতিমাত্র ত্রস্থ ও তটস্থ ও ছত্রভঙ্গ ভাবে পলাইয়া আইসেন, তাহা আর বেশী বলা বাহুল্য। মণিপুরীরা ইংরাজদের সদলে পলায়নের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল না। তৎপূর্ব্বেই পাঁচজন ইংরাজ-শত্রুর মুণ্ড প্রোথিত হইয়াছে—আর কাহারও প্রাণহানি করা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। শত্রু চলিয়া গেল দেখিয়া তাহারা পরম আহ্লাদে রেসিডেন্সিস্থ যাবতীয় দ্রব্য হস্তগত করিল এবং পরিশেষে অগ্নি লাগাইয়া শত্রুর আড্ডা (রেসিডেন্সি ভবন) ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

রাত্রি প্রায় ২টার সময় ইংরাজেরা রেসিডেন্সি হইতে পলায়ন আরম্ভ করেন। তাঁহারা বাম ও দক্ষিণ দিকে নাগা-গ্রাম সকলকে রাখিয়া অথচ কোনটির মধ্যেই প্রবেশ না করিয়া এবং সরকারী রাস্তায় না উঠিয়া, তাহার টানে টানে চলিতে লাগিলেন। বিবি গ্রিমউড কয়েক বৎসর সেখানে থাকায়, বিশেষতঃ কাছাড় প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ চা-করদের নিকট বহুবার গতি বিধি করায়, মণিপুরের পথ ঘাট—বিশেষতঃ কাছাড়ের দিকের অন্ধি-সন্ধি-সমস্তই তাঁহার জানা ছিল। বঙ্গ ইংরাজ ললনা—বিবি গ্রিমউড সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। ক্রমে নিশাবসান হইল, তথাচ ইংরাজপক্ষ বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড় পর্ব্বতের অন্তরাল দিয়া চলিতে লাগিলেন। মণিপুর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি অতি অল্প। বহু দূর ব্যবধানে, কোন কোন স্থানে নাগা ও কুকিদের গ্রাম আছে মাত্র। আবার মণিপুরী সৈন্তেরাও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয় নাই এবং কোথাও আক্রমণ করে নাই। কেবল স্থানে স্থানে কখন নাগা কুকি প্রভৃতিরা স্বদেশের শত্রু

জানে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া (বিতাড়িত করিবার উদ্দেশে) তাঁহাদের বিরুদ্ধে তীর চালাইয়াছিল। তাহাও অতি সামান্য। তথাচ যত বেলা অধিক হইতে লাগিল, ততই ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলে কাতর হইয়া পড়িলেন। কর্দ্দমাক্ত জলে পিপাসা কথঞ্চিত নিবারিত হইলেও আহার্য্য দ্রব্যাভাবে সকলের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে জঠরজ্বালায় অস্থির হইয়া, গুর্খারা বৃক্ষপত্র ও তৃণাদি খাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ইংরাজদলের মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। দুঃখ, আক্ষেপ, পরিতাপ, অবাধ্যতা প্রভৃতির কথা আর লিখিব না। পরিশেষে তাহারা নানা দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহাদের যেদিকে ইচ্ছা যাইতে লাগিল।

শ্রান্তি ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় অনেকের প্রাণ গেল—ব্যাঘ্রাদিতেও কাহাকে বা উদরসাৎ করিল এবং নাগা, কুকি প্রভৃতির সুতীক্ষ্ণ শরেও কয়েক-জনকে যমালয়ে পাঠাইল।

এবার বিবি গ্রিমউড গুর্খা সৈন্যের মত পোষাক পরিয়া, মাথায় বৃহৎ পাকড়ী জড়াইয়া, কাপ্তেন বুচার প্রভৃতির সহিত চলিতে লাগি-লেন। একবার কয়েকজন মণিপুরী প্রজা তাঁহাদের দলকে আক্রমণ করিয়াছিল। কাপ্তেন বুচার তখন বিবিকে শুইতে বলিলেন এবং একজন গুর্খা সৈনিকের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া তাহাদের পাঁচ-জনকে হত ও আহত করিলেন। তাহাদের নিকট বন্দুক ছিল না—কাজেই অবশিষ্টেরা পলায়ন করিল। বিবি গ্রিমউড ইংরাজ পুরুষ-গণের দুশ্চিন্তানাশিনী ও আশ্বাসদায়িনী হইয়া অজানিত ও জঙ্গলমধ্যস্থ পথ দিয়া লইয়া চলিলেন। সকলেরই মহা কষ্ট—কিন্তু তত্রাচ মিঃ উড্‌স প্রভৃতি খুব রসিকতা করিতে করিতে চলিয়াছিলেন।

চলিতে চলিতে একস্থানে তাঁহারা দূর হইতে কতকগুলি লোক দেখিতে পাইলেন। ক্রমে প্রতীয়মান হইল যে, সশস্ত্র সৈন্যগণ তাঁহা-

দেরই দিকে আসিতেছে। তাঁহাদের বা অধীনস্থ সিপাহীদের আর এমন শক্তি নাই যে, প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যমালয়ে যাওয়া অপেক্ষা আত্মঘাতী হওয়া ভাল—আবার বিলাতী বিবি মণিপুরীদের হস্তে পড়িলে, তাহারা তাঁহার কি দুর্গতি করিবে!—কাপ্তেন বুচার এইরূপ ভাবিয়া বিবির নিকটে গিয়া বলিলেন "আমার হাতে যে দুইনল বন্দুকটি দেখিতেছেন, ইহাতে দুইটি গুলি পোরা আছে—এই যে সকল সৈন্য আসিতেছে, তাহারা যদি আমাদের শত্রু হয়, তবে একটিতে আমি আপনার প্রাণ নাশ করিয়া অপরটি দ্বারা নিজের জীবন শেষ করিব।" এই কথার পরে, বোধ হয় তাঁহারা উভয়েই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। যাহা হউক অবিলম্বেই তাঁহাদের সকল দুর্ভাবনা ঘুচিল—কাপ্তেন কাউলি সদলে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কাউলি পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে ২০০ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে মণিপুর রাজধানীতে যাইতেছিলেন। তথায় যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কোন সংবাদই তিনি পান নাই। সৌভাগ্যক্রমে, পথিমধ্যে স্বপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, তিনি মণিপুরেই যাইতেন। সেখানে তাঁহার দলের কি দশা হইত, কে বলিতে পারে? যাহা হ এখন প্রাণ বাঁচাইবার আশা হওয়াতে, সকলে মিলিয়া দ্রুতপদে এ করিলেন। তৎপরে আর কেহই কোনরূপ বৈরিতাচরণ না তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে কাছাড় পৌঁছিলেন।

জমাদার বীরবল নাগরকোটি কতকগুলি গুর্খা সৈন্য সমভিব সাহেবদের দল ছাড়িয়া লাংথোবালে গিয়া উপস্থিত হয় এবং হইতে অমিত সাহসে কোন কোন স্থানের প্রজাদের সহিত যুদ্ধ ব করিতে—কয়েকটি মণিপুরী থানায় আগুন লাগাইয়া দিয়া টামুথে

পৌঁছায়। কোন কোন থানার লোকেরা (দেশ ছাড়া করিয়া দিবার জন্য) তাহার দলের উপর গুলিও চালাইয়াছিল। কিন্তু মহারাজার কোন সৈন্যাদিই, তাহাদের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করে নাই। তথাচ প্রজাদের সহিত যুদ্ধেই জমাদারের পক্ষীয় কয়েকজন লোক হতাহত ও বন্দীকৃত হয়। বীর বীরবলের সহিত ৩৪ জন লোক টামুতে পৌঁছিয়াছিল।

ইংরাজদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কয়েকজন সিপাহী—অশেষ কষ্টভোগ করিয়া—পরিশেষে উত্তর দিকে কোহিমা দুর্গেও উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ অসহ্য জঠর-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে সৈনিকাদিরা যে যে দিকে পারিয়াছিল, সে সেই দিকেই পলাইয়াছিল। তন্মধ্যে নানারূপে কতকগুলির মৃত্যু ঘটে—অনেকেই, বন্দীকৃত হইয়া মণিপুরে প্রেরিত হয়—অবশিষ্টেরা নানাদিকে ইংরাজ রাজত্বে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

উইলিয়ম্‌স সাহেব মণিপুরী সেঙ্গমাই থানার তার আফিসেই ছিলেন। যুদ্ধের পরদিন, থানার হাওলদার (ইন্‌স্পেক্টর) আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মণিপুরে বিষম বিভ্রাট—সাহেব ও সৈনিকগণ হয় তো হত, নয় তো পলাতক হইয়াছেন। আপনি মণিপুর যাইবেন কি কোহিমায় পলাইবেন? তিনি এবং অনুচরাদি সকলে মণিপুরের দিকেই চলিলেন। নাগা প্রভৃতিদের আক্রমণ হইতে জীবন বাঁচাইবার জন্য উইলিয়ম্‌সকে ঘাসের বনে, জঙ্গলে ও বৃক্ষকোটরে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। শেষে তিনি বন্দী হইয়া মণিপুরে প্রেরিত হন। মেল্‌ভিল ও ব্রিয়েন সাহেবদিগকেও (টামুর পথে স্থানান্তরে) বন্দী হইতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই মেলভিলের মৃত্যু ঘটে।

কাছাড়, কোহিমা ও টামু প্রভৃতি নানা স্থানেই ইংরাজ কর্ম্মচারীরা মণিপুরের মহা বিপদের সংবাদ পাইলেন। বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে রাজধানীতে সম্মতি আইন লইয়া মহা ব্যস্ত ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মধ্যে কুইন্টনকে সসৈন্যে মণিপুর যাইবার হুকুম এবং সম্মতি আইনে সম্মতি দিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সিমলা শৈলে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছেও সেই কুসংবাদ তার যোগে প্রেরিত হইল। ফলতঃ চারিদিকেই হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কেহই সঠিকরূপে জানেন না যে, কুইন্টন প্রভৃতির কি দশা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে মণিপুরীরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ দৃঢ় ধারণা তখন সকলেরই। এই জন্য কাছাড়, কোহিমা, টামু প্রভৃতি স্থানে যে সকল সৈন্য, সে সময় ছিল, অথবা যতগুলি অতি শীঘ্র সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাদিগকে কুইন্টন প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে মণিপুর পাঠাইবার পরামর্শ হইতে লাগিল। টামু ছাউনির লেঃ গ্রাণ্ট এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন "যত সৈন্য লইয়া যত শীঘ্র পার, মণিপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, ইংরাজ পক্ষের সাহায্য করিবে।" তদনুসারে তিনি ২৮শে মার্চ্চ তারিখে ৪০ জন পঞ্জাবী মুসলমান ও ৪০ জন গুর্খা সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে টোটা লইয়া টামু হইতে রওনা হন। তাঁহার দলের সহিত কতকগুলি খাম্পিয়া কুলী, কয়টি টাটু ঘোড়া ও আসবাব পত্র বহিবার জন্য তিনটি হস্তী ছিল।

অন্যান্য স্থান হইতেও সামরিক কর্ম্মচারীগণ সসৈন্যে অভিযানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জনশ্রুতির দ্বারা কুইন্টন প্রভৃতির হত্যার কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল। শেষে রসিক বাবুর প্রেরিত টেলিগ্রামে উহাতে আর সন্দেহমাত্রই রহিল না। এবং মণি-

পুরীদের বল বিক্রমের কথা শুনিয়াও কর্তৃপক্ষের বিশেষ ধারণা জন্মিল যে, অল্প সৈন্য পাঠান নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। মণিপুরের চতুর্দ্দিকে ইংরাজাধিকারের কোন স্থানেই প্রচুর সৈন্য না থাকায়, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অন্যাব্য ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিলেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে সৈন্যসংগ্রহের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু লেঃ গ্রাণ্ট টামু হইতে মণিপুরাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন; তাঁহাকে ফিরাইবার আর কোন উপায় কেহ করিলেন না।

এদিকে কুইণ্টন প্রভৃতির মৃত্যু সংবাদ যথারীতি শোক দুঃখের সহিত সরকারী গেজেটে প্রকাশ পাইল এবং লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাদুর ঘোষণা প্রচার করিলেন যে "মণিপুরীরা যেরূপ ভয়ানক দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিফল দিতে ও উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে গভর্ণমেণ্ট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।"

সুতরাং মণিপুরের সর্ব্বনাশ জন্য বিরাট আয়োজনই হইতে লাগিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কুলী বলদাদি ও নানা দিক্ হইতে বাহিনী শ্রেণী আসিতে লাগিল—আসাম ও উত্তর ব্রহ্ম, উভয় রাজ্যপথই তোলপাড় করিয়া তিন বিভাগে বৃহৎ যোদ্ধৃদল মণিপুরাভিমুখে ছুটিল।

ওদিকে মণিপুরে কি হইতেছে, তাহাও বলা আবশ্যক। প্রধানতঃ টিকেন্দ্রজিৎকে লইয়াই তখন মণিপুর। সুতরাং তাঁহার বৃত্তান্ত হইতেই আরম্ভ করিতেছি। হত্যার নিশাতে প্রথমে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। তৎপরে যাহা করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার মানিত পঞ্চজন সাক্ষীর মুখে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম এই;—"থঙ্গাল জেনারেলকে সাহেব-হত্যায় নিষেধ করিবার পর, যুবরাজ নিদ্রিত হন। কতক্ষণ পরে, কামান বন্দুকের শব্দে সহসা তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল এবং তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"কে আবার গোলাগুলি চালাইতেছে?—বন্ধ কর।" যখন তিনি শুনিলেন যে, ইংরাজদিগকে হত্যা করা হইয়াছে —ব্রিটিশ রেসিডেন্সি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছে, তখন তিনি চিন্তায় আকুল হইলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন ও বক্ষের উপরে মস্তক অবনত হইয়া পড়িল।

ফলতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি দারুণ ব্রহ্মশাপ হইলে চন্দ্রবংশ যেরূপ বিষম ভীত ও চিন্তাভিভূত হইয়াছিলেন, মণিপুর রাজধানীতে ইংরাজ হত্যার পরে, মহারাজ কুলচন্দ্র ও যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির মানসিক ভাব অবিকল সেই রূপই দাঁড়াইল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—সকলেই চিন্তাকুল—সকলেই প্রায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন। আহা! সেই ভয়ঙ্করী রজনীতে মণিপুর রাজপুরীতে যে বিষাদের কালিমা-ময়ী ছায়া পড়িয়াছিল, আর তাহা ঘুচিল না। সূর্য্যদেব উদিত হইয়া রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়নিহিত দারুণ দুশ্চিন্তার ও হতাশার তিমির আর কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না। সেই হইতেই মণিপুর রাজ্য অশান্তি-সাগরে ডুবিয়া গেল।

কেবল থঙ্গাল জেনারেলই সেরূপ ভীত হয়েন নাই। শুনা যায় যে, কুইণ্টন প্রভৃতি যুদ্ধে হত হইয়াছেন, এই মিথ্যা কথা তাঁহারই বিশেষ জিদে মহারাজের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে লেখান হইয়াছিল। আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতেও তিনি মহারাজ প্রভৃতিকে বারম্বার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে মন্ত্রণায় তাঁহারা উত্তেজিত হয়েন নাই।

মণিপুরীরা ২৫শে মার্চ তারিখে ব্যবসায়ী জানকী বাবুকে বন্দী করিয়া পদে শৃঙ্খল দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে; পরদিন টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহাকে মুক্তি দেন। এই দিনে রাজকেরাণী বামন বাবুর সহিত যুবরাজের অনেক কথা হয়। যুবরাজ বলেন "ব্যাপার যেরূপ

গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন কি করা উচিত? বামন বাবু উত্তরে বলেন "গোবিন্দজী রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যের আর সাধ্য নাই।"* যুবরাজ শেষে বলিলেন "সকল কথা খুলিয়া আমি লাট সাহেবকে পত্র লিখিব।" পরদিন পলিটিকেল কেরাণী রসিকবাবু, তাঁহার ভ্রাতা, ডাক্তার লক্ষ্মণ প্রসাদের ভ্রাতা এবং জনৈক ডাক-হরকরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য, ২০ জন সৈনিক রাজদরবার হইতে এরিংবুমে প্রেরিত হইয়াছিল।

২৭শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে যুবরাজ, রসিক বাবু ও জানকী বাবু প্রভৃতি সমস্ত বাঙ্গালীগণকে নিজের প্রাসাদে ডাকাইলেন এবং মিষ্ট বাক্যে ও সদ্ব্যবহারে সকলকেই পরিতুষ্ট করিলেন। তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, দেবমন্দির প্রভৃতি কিরূপ ভঙ্গ হইয়াছে, দেখাইলেন। পরিশেষে মন্ত্রী অঙ্গেয় মিঙ্গতো, আয়া পারেল, থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে জেলখানায় লইয়া গেলেন। সেখানে তখন প্রায় ২০০ শত ব্রিটিশ প্রজা বন্দীভাবে অবস্থিত। এবং সে সময় তথায় দলে দলে মণিপুরী প্রজারাও গতিবিধি করিতেছিল। যুবরাজের আদেশে, রসিক বাবু প্রভৃতি সমস্ত কয়েদীদের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে টিকেন্দ্র-জিৎ বলিলেন যে, "আর কাহাকেও বন্দী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই—যাহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারে।" ইহার কয় দিন পরে তিনি অসামান্য বদান্যতায়, বস্ত্র, খাদ্য, পাথেয় এবং নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দিতে প্রয়োজন মত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, সকল-

---

* গোবিন্দজী রাজ বংশের বাস্তু বিগ্রহ। বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দিরটি যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে তাঁহাকে গোবিন্দজীর মন্দিরেই রাখা হয়।

কেই বিদায় করিয়াছিলেন। যুবরাজ বন্দীদিগকে প্রথম দেখিবার পর হইতে কাহারও আর কোনরূপ কষ্ট হয় নাই।

কেবল জানকী বাবু, বামন বাবু, রসিক বাবু সেখানে রহিলেন। শেষোক্ত দুই জনের দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে পত্র লেখান হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে কোনরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। যুবরাজের ভদ্রতা ও শীলতায় বাধ্য হইয়া, তাঁহারা সেখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (২৫ ও ২৭ নং দলীলে সে সময়ের লিখিত ২ খানি পত্রাংশ আছে।)

ওদিকে টামু হইতে ৮০ জন সৈন্য সমভিব্যাহারে ২৮ শে মার্চ্চ তারিখে লেঃ গ্রাণ্টের রওনা হইবার কথা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেরূপে যে পুনরায় কোন ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যদল তত শীঘ্র আসিবে, তাহা মণিপুরীরা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। গ্রাণ্টের দলের সহিত যুদ্ধ করিবার কোন আয়োজনও কেহই করে নাই। অধিকন্তু ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিবার কোনরূপ আদেশও থানা ঘাঁটি প্রভৃতির অধ্যক্ষগণকে রাজদরবার হইতে দেওয়া হয় নাই। তথাচ প্রজারা এবং বহু স্থানের মণিপুরী সামরিক কর্ম্মচারীরা সসৈন্যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া গ্রাণ্টের প্রতিরোধ করিয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে কাহাউ চীনেরা তাঁহার দলের উপর গুলি চালায়, তৎপরে সামরিক পরিচ্ছদ-ধারী মণিপুরী সিপাহী দু-পাঁচ জন কোথাও বা কিছু অধিক সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। টিংলিবান নামক স্থানে একত্রে ন্যূনাধিক ১০০ মণিপুরী সিপাহী তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল; কিন্তু ৫০।৬০টি আওয়াজ করিয়াই তাহারা চলিয়া যায়।

কিয়দ্দূর পরেই দেখা যায় যে, বড় বড় গাছ কাটিয়া, মণিপুরীরা উত্তর পার্শ্বের পর্ব্বত মধ্যস্থ পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং শুনাও যায় যে,

দুই দিকের পর্ব্বত হইতেও মণিপুরীরা গুলি চালাইয়াছিল; কিন্তু গ্রাণ্টের দলের তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় নাই। বরং গ্রাণ্টের কয়েকজন সৈনিক তাহাদের দিকে বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে পর্ব্বতোপরে যাওয়াতে তাহারা কয়েকটা বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি ফেলিয়া পলায়ন করে। পরে পালেল নামক স্থানের ছাউনিতে ২০০ মণিপুরী তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হওয়াতে গ্রাণ্ট সসৈন্যে প্রায় দেড় ক্রোশ পথ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হন এবং ৩ জনকে বন্দী করেন। উক্ত তিন জনের মধ্যে ঐ পালেলস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ্যের একজন পাচক ছিল। সে গ্রাণ্ট সাহেবকে বলিল, "আমার মনিব আজ মহারাজার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, মণিপুরে ৯ জন সাহেব হত হইয়াছেন" ইত্যাদি। পাঠক, বুঝিতেই পারিতেছেন, ঐ সকল কথা বাজে গুজব মাত্র—যেহেতু নিজের কর্ম্মচারীকে তেমন অসত্য সংবাদ দিবার কোন প্রয়োজনই মহারাজ কুলচন্দ্রের থাকিতে পারে না।

লেঃ গ্রাণ্ট, পাচকের সেই কথা শুনিয়া একটু ভাবিত হইলেন, কিন্তু দমিলেন না। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, মণিপুরে যদি যথার্থই কোন ভয়ানক দুর্দ্দৈব ঘটিত, তবে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ টামু হইতে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে অবশ্যই ফিরাইতেন। ফলতঃ ইংরাজগণের সে সময়ের কার্য্যের বিশৃঙ্খলতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে, গ্রাণ্টকে ফিরাইবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। গ্রাণ্ট ঐরূপ বিশ্বাসে, সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে তিনিই সে সময় নিজ-বীরত্বে ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কর্তৃপক্ষগণের কিছুমাত্রই সুখ্যাতি নাই এবং তাঁহাদের কুবন্দোবস্তের দোষ কিছুতেই কাটিতেছে না।

বহু বিঘ্ন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম এবং বিবিধ কষ্ট সহ্

করিয়া শেষে গ্রাণ্ট সাহেব সদলে থোবালে আসিয়া তত্রত্য মণিপুরী দুর্গ অধিকার করিলেন। রাজধানীর দক্ষিণপূর্ব্ব ৭ ক্রোশ দূরে, টামুর পথে, এই দুর্গ অবস্থিত।

তার-বিভাগের কর্ম্মচারী উইলিয়ম্‌স সাহেব বন্দী হইয়া ১৫ই চৈত্র মণিপুরের কারাগারে প্রেরিত হন। ২০শে চৈত্র (২রা এপ্রেল) টিকেন্দ্রজিৎ তাহা শুনিতে পাইয়া কারাগার হইতে তাঁহাকে আনাইলেন। তাঁহার দেহে অতি সামান্য আচ্ছাদনই ছিল; যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি দিলেন এবং তাঁহার বন্দী হওনের কথা পূর্ব্বে জানিতে না পারাতে তাঁহাকে তত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন।

পরদিন টিকেন্দ্র, উইলিয়ম্‌সের সঙ্গে রক্ষক দিয়া থোবালে পাঠান। গ্রাণ্ট আপনার নাম ভাঁড়াইয়া উইলিয়ম্‌সের নিকট, কর্ণেল হাউলেট বলিয়া পরিচয় দেন। একজন বীর কর্ণেল কর্তৃক সে সৈন্য পরিচালিত, এই ভাণে মণিপুরীদিগকে ভীত করাই সেইরূপ পরিচয় দানের উদ্দেশ্য। উইলিয়ম্‌স, যুবরাজের আদেশমত বলিলেন, "আপনি সদলে দুর্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাউন।" গ্রাণ্ট সাহেব নানা ওজর আপত্তি তুলিয়া গয়ংগচ্ছ করিতে লাগিলেন। উইলিয়ম্‌সকে যুবরাজ শাসাইয়াছিলেন, "যদি পলাইবার চেষ্টা পাও, বিপদ ঘটিবে।" হাউলেট (গ্রাণ্ট) যে তথায় প্রাণ বা স্বাধীনতা বাঁচাইয়া তিষ্ঠিতে পারিবেন, উইলিয়ম্‌সের সে বিশ্বাস ছিল না। সে ধারণা হইলে, মণিপুরী রক্ষকগণকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি নিশ্চয়ই গ্রাণ্টের দলেই মিশিতেন। তিনি যুবরাজের নিকট ফিরিয়া যান, পরে সেই সদাশয় বীরের কৃপায় মুক্তি পাইয়া কোহিমার দিকে প্রস্থান করেন।

বহুসংখ্যক মণিপুরীর সহিত গ্রাণ্টের উপর্য্যুপরি বারত্রয় সংগ্রাম হয়। মণিপুরীরা নাকি একবার কয়টি কামান আনিয়া গোলাও চালাইয়াছিল। কিন্তু মহাবীর গ্রাণ্ট অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন—সেই অল্প সৈন্য লইয়াই প্রতিবারই বহুসংখ্যক বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রণনৈপুণ্য, বুদ্ধিবল ও সৈন্য-চালন-যোগ্যতা তাঁহার বয়স বিবেচনায় অসামান্য। যদিও যাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা কোন যোগ্য সেনানায়ক দ্বারা চালিত হয় নাই, তথাপি সংখ্যায় তো তাহারা বহু গুণে বেশী ছিল; সুতরাং থোবাল-বীর বলিয়া তাঁহার নাম সমাদৃত হওয়া উচিত। তিনি স্বীয় পরাক্রমে অবরোধ-মুক্ত হইয়া টামুর দিকে চলিয়া গেলেন। পথে পালেল নামক স্থানে মণিপুরীদের সহিত আর একবার সংঘর্ষ ঘটে। উপযুক্ত সময়ে কতকগুলি সৈনিক-শিরে কর্ণেল প্রেসগ্রেভ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াতে বিপক্ষ-পক্ষ পরাস্ত হয়।

কিন্তু এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, মহারাজ কুলচন্দ্র, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ, বা সেনাপতি কুমার অঙ্গেয় সেনা প্রভৃতি কেহই গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে যান নাই বা সৈন্যাদি প্রেরণ বা আক্রমণের আদেশ মাত্রও দেন নাই। তখন রাজদরবারের ভয়ানক মত-বিরোধ—নানা মন্ত্রীর নানা পরামর্শ—বিশেষতঃ থঙ্গালের সহিত তাঁহাদের মনের সম্পূর্ণ অনৈক্য ঘটিয়াছিল। সুতরাং কে যে ঐ আক্রমণ জন্য দায়ী, অথবা মণিপুরীরা আপনারাই রণোন্মত্ত, সে গোলযোগে তাহা নিশ্চয় হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু রাজা ও যুবরাজ দিগকেই অবশ্য দোষী ভাবিয়া থাকিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইংরাজের অভিযান ও মণিপুরের দুরবস্থা।

সংসারের এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম যে, সুযশ বা সুসংবাদ ব্যাপ্ত হইতে বহু বিলম্ব হয়—হয় তো তাহা চাপাই পড়িয়া যায়। কিন্তু অপযশ বা কুসংবাদ চারিদিকে তীরবেগে ছুটিতে থাকে। এই জন্যই বুঝি মণিপুরের মহা বিভ্রাটের সংবাদ অবিলম্বে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল। কাছাড়ে ৩০।৩৫ হাজার মণিপুরী আছে—স্বদেশের বিপদের কথা শুনিয়া, তাহাদের অনেকেই সশস্ত্র দলবদ্ধ হইয়া মণিপুর যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। তাহাদের একজন ব্রিটিশ-হস্তে হত ও ১৫ জন বন্দীকৃত হইল। শিলচর, শ্রীহট্ট, ঢাকা, শিলং গোলাঘাট প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী মণিপুরীরাও বিচলিত হইয়া উঠে। ইংরাজ-রাজ নানা কৌশলে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আবার মণিপুরের চতুঃসীমাবর্ত্তী জাতিরাও গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছিল। কাছাড়-সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য লোক সমূহ, ব্রহ্মের দিকে (টামুর পথে) দুরন্ত চীনেরা ও হাকা, চাষাদ, সুতী প্রভৃতি জাতিরাও অল্প বিস্তর উত্তেজিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে, ইংরাজদের সহিত কয়েকবার ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিল। নাগারা কখনই মণিপুরের মিত্র নহে, কিন্তু ইংরাজদের সহিতও তাহাদের সদ্ভাব নাই। তাহারা এবং ঐ অঞ্চলের প্রায় সকল জাতিই ইংরাজদিগকে পরম শত্রু বলিয়া জানে। অধিকন্ত উত্তরে ভুটিয়া জাতিরাও ইংরাজের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত

হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই সকলেরই সংবাদ রাখিতেছিলেন এবং চারিদিকে অতি সাবধানে, সন্তর্পণে, ভীষণ সমরায়োজন করিতেছিলেন।

কাছাড়, কোহিমা ও টামু, একবারে এই তিন দিক হইতেই তিন ভাগে সামরিক অভিযানের আয়োজন হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ-সৈন্য ষ্টীমারে গোয়ালন্দ এবং তথা হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ বাহিয়া নিগ্রিটিং নামক স্থান দিয়া ক্রমে কোহিমায় গিয়া পৌঁছিল। কোহিমা হইতে মণিপুর রাজধানী ১০৫ মাইল। টামু হইতে মণিপুর ৫০।৬০ মাইল। কিন্তু এই দুইটি পথই দুর্গম—পর্ব্বতারণ্যের মধ্য দিয়া, কোথাও বা অতিকষ্টে গিরিশ্রেণীর পার্শ্ব বহিয়া ও শিরোদেশের উপর দিয়া যাইতে হয়। কাছাড়ের পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম হইলেও নিতান্ত সহজ নহে। এবার মহা আয়োজন—তিন দিক দিয়া ৭।৮ হাজার যোদ্ধা ও ১৫।১৬ হাজার শিবিরানুচর চলিল। প্রত্যেক দলের সহিত ২।৪ টা করিয়া মোট ১০টা কামানও ছিল। তিন পথেই রুগ্ন-বাসাদি আড্ডা প্রস্তুত হইয়াছিল। বিলাতফেরত ২ জন বাঙ্গালী ডাক্তার বাদে, এ অভিযানে একটু নূতনত্ব এই ছিল যে, ৪৮ জন সখের সৈনিক মহাশয়েরা যুদ্ধের সখ মিটাইবার উদ্দেশে কলিকাতা হইতে কাছাড়ের পথরক্ষকরূপে গিয়াছিলেন।

ইংরাজের ভীষণ সমরায়োজনের কথা মণিপুর ময় রাষ্ট্র হইল। তথায় গুজব উঠিল যে, মণিপুর আক্রমণার্থ ২৫।৩০ হাজার সৈন্য আসিতেছে। তদ্বিরুদ্ধে সুসজ্জিত হইবার জন্য থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতি মহারাজ কুলচন্দ্রকে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সে কথা শুনিলেন না। অধিকন্তু, দলে দলে মণিপুরী প্রজা সকল আসিয়া যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে যুদ্ধের আয়োজনার্থ বিবিধ প্রকারে

উত্তেজনা করিল। ইংরাজ-বিদ্বেষী নানা জাতীয় সর্দারেরাও, তাঁহার নিকট আপনা আপনি আসিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে সাহার্য্যের অঙ্গীকার করিতে লাগিল। থঙ্গাল জেনারেলও তাঁহাকে অশেষ প্রকার বুঝাইলেন। নব-জিত উত্তর ব্রহ্ম, শান প্রদেশ প্রভৃতির অধিবাসীরা যে ইংরাজদিগকে কত ঘৃণা করে—কুকী প্রভৃতিরা যে মণিপুর রাজ-বংশকে কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাহাও তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন। চেষ্টা করিলে যে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ও ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রদেশের যাবতীয় অধিবাসিগণই ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে পারে, একথাও বলিয়া এক বৃহৎ বাহিনী সংগঠনের জন্য অনুমতি ও সাহায্য চাহিলেন। অন্যান্য অনেকেই এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিলে, ন্যূনাধিক এক লক্ষ সৈন্য (যেরূপ অস্ত্র শস্ত্রে ভূষিতই হউক) ইংরাজের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এরূপ কোন প্রস্তাবেই মহারাজ ও কুমার অঙ্গেয় সিংহও মত দিলেন না। তখন রাজ্য মধ্যে দুইটি দল হইয়া দাঁড়াইল। কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ বাতুল হইয়াছেন ভাবিয়া, মণিপুরী কয়েকজন মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজ নিজ বিবেচনা ও ইচ্ছামত স্থানে স্থানে ইংরাজের প্রতিরোধক বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। মহারাজ প্রভৃতিকে হত্যা করিবার পরামর্শও কোথাও কোথাও হইয়াছিল। রাজ্যময় যেন অরাজক হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রকৃত নেতা অভাবে, কোন দলেরই কার্য্যপদ্ধতি সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইল না। তখন কোন সম্ভ্রান্ত উপযুক্ত নায়ক ইংরাজের বিরুদ্ধে বদ্ধ-পরিকর হইয়া দাঁড়াইলে, সহজে মণিপুর সমর শেষ হইত না এবং সেই মহামারী ব্যাপার যে কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইত ও কোথাগিয়া কি ভাবে দাঁড়াইত, তাহার কিছুই অনুমান করা যায় না।

মণিপুর সমরের কর্তৃত্ব ভার মেজর (পরে জেনারেল পদে উন্নীত) কলেটের উপর প্রদত্ত হয়। মিঃ মেকেব পলিটিক্যেল এজেন্ট হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। কলেট সাহেব ২০শে এপ্রেল তারিখে সদলে কোহিমা হইতে যাত্রা করেন।

সেনাপতি মণিপুর রাজ্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই দূতদ্বারা মহারাজ কুলচন্দ্রকে যে পত্র খানি পাঠান, তাহার মর্ম্ম এই—"এখনও যদি দুর্ম্মতি ছাড়িয়া থাকে, তবে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। আমাদের শরণাগত হইলে, আপনার দোষের বিচার হইবে, তাহাতে আপনার প্রাণ রক্ষা হইবে কি না জানি না। কিন্তু প্রতিকূলতা করিলে, নিশ্চিতই আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।"

কলেটের দলবলকে পথিমধ্যে কোথাও কাহারও সহিত কোনরূপ যুদ্ধ করিতে হয় নাই। মণিপুরী থানা, ঘাঁটী ও দুর্গগুলি শূন্য পড়িয়াছিল। কেহই কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা পর্য্যন্তও করে নাই। সৈন্যগণ এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় ব্রিটিশ রাজত্বের মত নিরাপদে চলিতেছিল। কেবল চতুর্দ্দিক জনশূন্য দেখিয়াই পররাজ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু মণিপুরীদের শত্রুতা না থাকিলেও বৈশাখের দারুণ রৌদ্রে সৈন্য সামন্তগণের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ভীষণ ওলাউঠা দেখা দিয়া অনেককে শমন সদনে লইয়া গেল। পরিশেষে তাহাদের কষ্টের মাত্রা পূর্ণ কবিবার জন্য মূষল ধারে বর্ষা আরম্ভ হইল। অনেক স্থানে এক হাঁটু জল-কাদার উপর দিয়া, সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। তাহাদের সহিত তাম্বু না থাকায় এবং আশ্রয়ের স্থানাভাবে তাহাদিগকে নাস্তা-নাবুদ হইতে হইয়াছিল। সৈন্যগণকে রাত্রে অনাবৃত ক্ষেত্র বা বন জঙ্গলের মধ্যে কর্দ্দমাক্ত ও সিক্ত ঘাসের

উপর নিদ্রা যাইতে হইত। এইরূপে জ্বর ও পুনর্ব্বার ওলাউঠা হওয়াতে অনেকে পঞ্চত্ব পায়।

রাজধানী প্রবেশের পূর্ব্বে জেনারেল কলেট মহারাজ কুলচন্দ্রের নিকট হইতে স্বীয় পত্রের উত্তর পান, তাহার ভাব এই,—"ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না এবং এখনও নাই। আর, আপনাদের গতিরোধ করিতে পারি, এমন শক্তিও আমার নাই। ইংরাজরাজের সহিত পূর্ব্বাপর আমাদের মিত্রতা ও সদ্ভাব ছিল। অকস্মাৎ তাহা নষ্ট হওয়ায় আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছি। এই সকল কারণে আমি এখন রাজধানী ছাড়িয়া চলিলাম। পরে যদি সন্ধি স্থাপনের সুবিধা দেখি, তবেই আবার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

শিলচরের সৈন্যদল লিমাটল পর্ব্বত-শ্রেণীর দুর্গম উপত্যকা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া, ২৩শে এপ্রেল দিবসে নারায়ণগণ গ্রামে উপনীত হয়। সেই গ্রামটি বিষেণপুর হইতে দুই ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। সেই-খানে মণিপুরীদের সহিত, ইংরাজ পক্ষের একটি সামান্য সংঘর্ষ ঘটে। তাহাতে ইংরাজ-কামানের ভীষণ গোলা উদ্গীরণে মণিপুরীরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে এবং তাহাদের দলপতি আহত ও বন্দীকৃত হয়। পরে বিনা বাধায় ইংরাজ সৈন্যদল রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হয়। কিন্তু এই দলের সৈন্যগণও বর্ষায় ও পীড়ায় কষ্ট পায়। সথের সৈনিকদলের অর্দ্ধেক রুগ্ন হইয়া ফিরিতে বাধ্য হয়। তাহাদের বীরত্ব এই পর্য্যন্ত।

টামুর সৈন্যদল ২৫শে মার্চ্চ তারিখে পেলালে পৌঁছায়। এখানে মণিপুরীদের সহিত তাহাদের তুমুল যুদ্ধ বাধে। মণিপুরীরা দুইজন দলপতি দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু তাহাদের নিকট একটিও কামান বা বন্দুকাদি ছিল না। তাহাদের অধিকাংশই বর্শা বা ঢাল-তরবারিযোগে

যুদ্ধ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ সৈন্য আধুনিক ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত এবং কামান বন্দুকাদি সর্ব্বাস্ত্রেই সজ্জিত—সে সব আবার অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। তথাচ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, মণিপুরীদের বল, বিক্রম, সাহস, সহিষ্ণুতা ও সমর নৈপুণ্য দেখিয়া ইংরাজেরাও ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে কোন্ পক্ষে কত সৈন্য ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। ইংরাজ পক্ষের কেহ কেহ বলেন, অন্ততঃ তিন হাজার মণিপুরী একত্রিত হইয়াছিল—আবার কেহ বা নির্ণয় করেন যে, বার শতের অধিক হইবে না। ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা, মণিপুরীরা বলেন যে, প্রায় মণিপুরীদের সমানই ছিল। সেই ভীষণ সমরে, ইংরাজের কামানের গোলায় ও বন্দুকের গুলিতে বিস্তর মণিপুরী হতাহত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহারা প্রকৃত বীরের মত, যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুকে মারিতে মারিতে মরিয়াছিল এবং আঘাত করিতে করিতেই আহত বা ধরাশায়ী হইয়াছিল। কেবল বন্দুক ও কামানের ভয়ানক অগ্নিবর্ষণে একবার মাত্র বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু পরক্ষণেই উভয় দলে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে মণিপুরীদেরই অধিক পারদর্শিতা দেখাইবারই কথা এবং ইংরাজ পক্ষের বিস্তর সৈন্য হত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ইংরাজ পক্ষের ক্ষতি কি হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে মণিপুরীদের ১২৮টি মৃত দেহ যুদ্ধক্ষেত্রেই গণিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে ২ জন দলপতিরই শব দেখা গিয়াছিল। পক্ষান্তরে ইংরাজী সংবাদ পত্রাদিতেই প্রকাশ যে, পেলালের যুদ্ধটা বড় গুরুতররূপই দাঁড়াইয়াছিল। সে যাহাই হউক, ৬।৭ জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ-কর্ম্মচারী এবং দেশীয় ২।৩ জন সুবেদারও তাহাতে কঠিনরূপেই আহত হইয়াছিল

—খোবালের বীর গ্রাণ্টও সেই বিষম যুদ্ধে গলদেশে আঘাত পাইয়াছিলেন।

পেলালের এই যুদ্ধে মণিপুরীরা হত, আহত, বন্দীকৃত ও ছত্রভঙ্গ হইবার পর, আর কেহই টামুর পথে ইংরাজ সৈন্যের প্রতিকূলতা করে নাই। অতএব সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে মণিপুর রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল।

১৩ই বৈশাখ তারিখে, মহারাজ, যুবরাজ, কুমার অঙ্গেয় সিংহ, কুমার জিল্লাগম্বা ও পাত্র মিত্র সকলে মণিপুর রাজধানী হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন; এই কথা শুনিয়া হয়তো অনেকে টিকেন্দ্রজিৎকে ভীরু কাপুরুষ ইত্যাদি বলিবেন। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করিলে, মণিপুর রাজ্যকে শোণিতময় করিতে ও ইংরাজকেও মহা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত সেরূপ যুদ্ধ করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক ছিলেন না। সেই জন্যই কোনরূপ অয়োজনই করেন নাই। সেই জন্যই মণিপুর রাজ্য (এক প্রকার) বিনা যুদ্ধেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল।

মহারাজ প্রভৃতি প্রস্থানের পরেই, নগর উপনগর ও মণিপুরের চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী প্রজারাও সকলে স্ব স্ব আলয় ছাড়িয়া কেবল গবাদি ও সম্ভবমত মূল্যবান্ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া দূর-দূরান্তরে, বনে, জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছিল। সেকালে বর্গীর দৌরাত্ম ভয়ে লোকে যেমন জিনিষ-পত্র, ধন-দৌলত সমস্ত ফেলিয়া, কেবল নিজের প্রাণ ও সন্তান-সন্ততি লইয়াই পলায়ন করিত, মণিপুরের রাজপরিবারেরাও সকলে ঠিক সেইরূপই পলাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্থানের পর দুষ্ট বদমাইস লোকেরা মূল্যবান দ্রব্যাদি যথাসাধ্য লুণ্ঠন করিয়া, রাজপুরীর বহুস্থানে অগ্নি লাগাইয়া দেয়।

১৫ই বৈশাখ তারিখে, ইংরাজ সৈন্যগণ তিন দিক হইতেই যুগপৎ মণিপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু ২।৩ ক্রোশের মধ্যে কোন দিকেই কোন নরনারীর অস্তিত্বের চিহ্ন-লেশ মাত্রই দেখিতে পাইলেন না। বাড়ী, ঘর সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোথাও একজনও লোক নাই। চারিদিকেই নিস্তব্ধতার রাজ্য পরিব্যাপ্ত। কেবল ইংরাজ সেনার কোলাহল ও অস্ত্র শস্ত্রের ঝঞ্চনা ও সেনানীগণের অশ্বের পদ-ধ্বনি প্রভৃতিই, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

কাছাড় সৈন্যদলের অগ্রণী-রক্ষকগণ ১৫ই বৈশাখ প্রাতঃকালে ৭টার সময় সর্ব্বাগ্রে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হয়। তৎপরে সেই দলের সৈন্য গণ সমাগত হইলে, সকলে নগরের দিকে বন্দুক চালাইতে থাকে। কিন্তু কেহই কোনরূপ প্রতিকূলতা না করাতে, সকলে সবিস্ময়ে ক্রমে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরে কোহিমা ও টামুর সৈন্যদলও রাজধানীতে পৌঁছিল। এবং সেই দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তিনটি সৈন্যদলই মণিপুর রাজধানীতে একত্রিত হইল। হায়! সেই মুহূর্ত্তেই মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা দেবী ইংরাজের হস্তে বন্দিনী হইলেন।

ইংরাজ-সেনা বীরদর্পে মণিপুর নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু যে মণি-পুর কেবল একমাস পূর্ব্বে শান্তি সুখে স্বস্তিসম্পদে হাস্য করিতেছিল, আজি সেই মণিপুর শ্মশান তুল্য শূন্য হইয়াছে। মহারাজ, যুবরাজ প্রভৃতি, রাজপাট ছাড়িয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আর রাজ-মহিষী ও রাজকুমারী প্রভৃতি পুরন্ধ্রীমহিলারা—হায়! তাঁহারা সকলে অনাথিনী দুঃখিনী বেশে প্রাণের দায়ে কোথায় বিচরণ করিতে-ছেন। সেই শান্তিপ্রিয়, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাবৃন্দই বা কোথায়। অজানিত দেশে, বনে, জঙ্গলে, কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে— অনাহারে, অনিদ্রায়, কে কোথায় কি ভাবে আছে, তাহার কিছুই

স্থিরতা নাই। হায়! বিধাতঃ! কোন্ মহাপাপে মণিপুরের এ দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিল।

মণিপুরে প্রবিষ্ট হইবার পরেই ইংরাজ অগ্রে রেসিডেন্সির দিকে গেলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, ভগ্ন ইষ্টকাদি ও ভস্মস্তূপ মাত্র তাহার পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। অদূরে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত যে, রম্য উপবন ছিল, তাহাও নিতান্ত শ্রীহীন হইয়াছে। আবার রেসিডেন্সি প্রাঙ্গণে ও উদ্যানের মধ্যে যে কয়টি মৃত ইংরাজের সমাধি ছিল, সে সমস্তই অপবিত্র হস্তে উৎখাত হইয়া গিয়াছে। এ সব দেখিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বিগুণিত হইল।

জেনারেল কলেট প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা অবাধে মনের সুখে, রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। অধস্তন কর্ম্ম-চারীদের জন্যও ভাল ভাল গৃহাদি নির্দ্দিষ্ট হইল। সাধারণ সৈনিকাদি মণিপুরীদের পরিত্যক্ত বা নব প্রস্তুতীকৃত গৃহাবলীতে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে সদলে নির্ব্বিবাদে আনন্দের কোলাহলে ইংরাজ বিরাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নগর জনশূন্য, সুতরাং সন্ধানাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বড়ই অসুবিধা ঘটিল। বিশেষতঃ প্রতি-দ্বন্দ্বী নাই, সুতরাং যুদ্ধ বিষয়ে সৈনিকগণের মনের সাধ মনেই রহিল —এতটা যে আয়োজন, বীরদর্প ও আস্ফালন তাহার স্বার্থকতা পক্ষে উপযুক্ত পাত্রই অপ্রাপ্য, সুতরাং সে নৈরাশ্য দুঃখের জন্য তাহারা মনে মনে মণিপুরীদিগকেই দায়ী করিয়া তাহাদের প্রতি রাগে ফুলিতে লাগিল।

তাঁহারা সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ২০টি মনুষ্য বাহির করিলেন। তাহাদের কয়েক জন বৃদ্ধ ও রুগ্ন—সকলেই জীবনাশা

পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট বিশেষ কোন সন্ধান-প্রাপ্তির আশা বৃথা। অতএব সেনানীরা চারিদিকে বার্ত্তা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ভেদনীতির কৌশলে, অর্থ-লোভ ও উন্নতির আশায় ভুলিয়া কতকগুলি মণিপুরী প্রজা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিল। একস্থানে কতকগুলি নরমুণ্ড একটি খাদ হইতে বাহির করা হইল। স্থানান্তরে আবার কয়টি মস্তকহীন, গলিত-মাংস নরকঙ্কাল মৃত্তিকা মধ্যে পাওয়া গেল। সেইগুলিই কুইণ্টন প্রভৃতির মৃত দেহ বিবেচনায় যথারীতি প্রেতকৃত্য ও সমাধিকৃত হইল। ইংরাজেরা রাগে ও দুঃখে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন।

অবিলম্বেই জেনারেল কলেট রাজ্যময় এই মর্ম্মের ঘোষণা প্রচার করিলেন—"মহারাজ কুলচন্দ্রের রাজত্বকাল ফুরাইয়াছে। এখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের রাজস্থানীয়। যে কেহ, ইংরাজের কোনরূপ প্রতিকূলতা বা কুলচন্দ্র, টিকেন্দ্রজিৎ বা থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতির পোষকতা করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আর যে ব্যক্তি মহারাজ, যুবরাজ প্রভৃতিকে ধরিয়া দিতে পারিবে, সে নিম্নলিখিত হারে পুরস্কার পাইবে। মহারাজ ও যুবরাজ, প্রত্যেকের জন্য ৫ হাজার টাকা করিয়া; থঙ্গাল জেনারেলের জন্য ২ হাজার; সুবেদার নিরঞ্জন সিংহ, কজেয় মণিপুরী প্রভৃতি অপর সকলের জন্য ১ হাজার টাকা হিসাবে।"

ইংরাজের অর্থবল লোকবল কিছুরই অভাব নাই। চারি দিকে চর প্রেরিত হইল। নাগা, চীন, শান, কুকি প্রভৃতি সকল জাতিদের দেশেই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। সংবাদ আসিল যে, মহারাজ ও যুবরাজ চাযাদ দেশে গিয়াছেন। অমনি কাপ্তেন ডন বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন।

তখনও মণিপুরে প্রজারা অধিক সংখ্যায় প্রত্যাগত হয় নাই। দোকানপাট সমস্তই প্রায় বন্ধ।

সাধারণ প্রজাগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য জেনারেল কলেট পুনরায় এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন,—"আমরা সকলকেই অভয় দিতেছি—সকলে আসিয়া স্ব স্ব গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করুক। কেবল যাহারা গ্রিমউড প্রভৃতির হত্যায়, রেসিডেন্সি দাহ ও লুণ্ঠনে বা ইংরাজের সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করণ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদিগেরই অপরাধের বিচার ও যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান হইবে। ইংরাজের দ্বারা অন্য কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।" এই ঘোষণার ফলে এবং ইংরাজের অনুগত মণিপুরীদের প্রবোধে ক্রমে ক্রমে প্রজারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিতে লাগিল! ক্রমে সকল প্রকার অনুসন্ধানেরই সুবিধা হইল। মহারাজ শূরচন্দ্রের এক রাণী, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র সমভি-ব্যাহারে অন্যান্য সকলের সহিত রাজপুরী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা আশ্বাস দিয়া তাঁহাদিগকে আনাইলেন।

নবাধিকৃত রাজ্যে যেমন করিতে হয়, যেমন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তে চলিতে হয়, ইংরাজেরা ঠিক সেইরূপই করিতেছিলেন। তাঁহারা ভয় মৈত্রতা উভয়ই দেখাইয়া স্বীয় অধিকার দৃঢ়ীকরণে তৎপর হইলেন। মণিপুর রাজ্যে আবার ঘোষণা প্রচারিত হইল;—"কেহই আর নিজের অধিকারে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি রাখিতে পাইবে না। যাহার যাহা আছে, সমস্তই ৭ দিনের মধ্যে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। ৭ দিনের পর যদি কোন ব্যক্তির নিকট কোনরূপ অস্ত্র শস্ত্র দেখা যায়, তবে তাহার ফাঁসি অথবা চিরনির্ব্বাসন দণ্ড হইবে।"

এইরূপে মণিপুর রাজ্য ইংরাজের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়া পড়িল। পরিক্ষিতের ভয়ানক সর্পযজ্ঞে মুনিমন্ত্র-বলে দশদিক হইতে ত্রিভুবনস্থ

নাগ সকল যেমন আকর্ষিত হইয়া করাল অগ্নিকুণ্ডে আসিয়া পড়িয়াছিল, ইংরাজের ধনবল, বাহুবল, লোকবল ও মন্ত্রণা-কৌশল-বল্লে মণিপুরের মহারাজা প্রভৃতি সকলেই তেমনি আহুতি-স্বরূপে আসিতে বাধ্য হইলেন।

সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্ব বিপদের মূল থঙ্গাল জেনারেল ফাঁদে পড়িলেন—বন্দী হইলেন। মহারাজ কুলচন্দ্র রাজভক্ত কুকিদের দেশে গিয়াছিলেন; সে স্থানেও নিস্তার পাইলেন না। সকলেরই শত্রু আছে, বিশেষ অর্থলোভে মিত্রও শত্রুবৎ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না—হায় অর্থ এমনই অনর্থ-হেতু! মহারাজ একদা শ্রান্তিবশতঃ অশ্ব ছাড়িয়া শিবিকা মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অবিলম্বেই কয়জন বিশ্বাসঘাতক মণিপুরী ইংরাজহস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিল। ক্রমে সুবেদার নিরঞ্জন সিংহ ও কজেয় সিংহ প্রভৃতিও বন্দীকৃত এবং অবশেষে কুমার অঙ্গেয় সিংহ ও জিল্লাগম্বা ও পাত্রমিত্র সকলেই মণিপুরে আনীত হইলেন। মহারাজ নিজের রাজধানীতে নিজ-পুরী মধ্যেই বন্দী দশায় রহিলেন। কেবল টিকেন্দ্রজিতের সঠিক সন্ধান এ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইংরাজ আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকেও অবিলম্বে হস্তগত করিতে পারিবেন। মহারাজ প্রভৃতির বিচারের আয়োজন ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং স্থির হইল যে, যুবরাজ ধরা পড়িলেই বিচার আরম্ভ হইবে।

পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ কোন দূরপ্রদেশেই প্রস্থান করেন নাই। তিনি রাজধানীর অদূরে থাকিয়া, ইংরাজের সমস্ত কার্য্যেরই সন্ধান লইতেছিলেন। পরিশেষে ইংরাজ সৈন্যশিবিরের নিকটবর্ত্তী আতঙ্গজান নামক পল্লীর মধ্যে মণিপুরী মাজিষ্ট্রেট বলরাম সিংহের বাড়ীতে আশ্রয় লয়েন। সে সময় তাঁহার

শরীর অসুস্থ ছিল। বস্তুতঃই টিকেন্দ্রজিতের শরীর কুইণ্টনের মণিপুর প্রবেশের পূর্ব্ব হইতেই এক দিনের জন্যও স্বচ্ছন্দ ছিল না। যুবরাজকে যে বলরাম সিংহ বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। এখানে তাঁহার এক বিমাতা ও সেই বিমাতার পিতা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়েন। দু-দিন থাকিয়াই টিকেন্দ্রজিৎ বলরামকে বলিলেন—"তুমি ইংরাজকে গিয়া সংবাদ দাও যে, আমি এখানে আছি।" বলরাম নিষেধ করিলেন এবং জীবন রক্ষার নানারূপ সুপরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুবরাজ কিছুতেই শুনিলেন না; সংবাদ দিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আহা! সেই চির-স্বাধীনবিহারী স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী সিংহ কি দীর্ঘকাল গুপ্তভাবে গুহা-নিহিত থাকিতে পারে? যুবরাজের অবশ্য বিশেষ কষ্টই হইতেছিল। অগত্যা বলরাম (অনিচ্ছাতেই) দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সুবেদার কালেন্দ্র সিংহকে সংবাদ দিলেন। কালেন্দ্র মহা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল। যুবরাজ তখন বলিলেন "আজি আমার জন্মদিন এবং দিনও নিতান্ত মন্দ, আমি আজি যাইব না—" কালেন্দ্র যুবরাজের হাত ধরিয়া বলপ্রকাশ করিল। যুবরাজ তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দৌড়িলেন। কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ অধিক দূর যাইতে না যাইতেই কালেন্দ্র তাঁহাকে পুনরায় ধরিল। যুবরাজ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পাঠক! টিকেন্দ্রজিতের ব্যবহারে তাঁহার তৎকালিক মানসিক অবস্থা বুঝিবেন। যুবরাজ আনীত হইলে ইংরাজদলের মধ্যে মহা আনন্দ ও উৎসাহ দৃষ্ট হইল। যুবরাজ এইরূপে বন্দীকৃত হইয়া প্রাসাদে রক্ষিত হইলেন। তাঁহার প্রতি কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইল। অনতিবিলম্বেই ইংরাজ মণিপুরে প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্য ও সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন এবং মহারাজ প্রভৃতির বিচাররূপ মহাযজ্ঞ

টিকেন্দ্রজিৎ বন্দী।

১৮৮ পৃষ্ঠা।

ষোড়শোপচারে আরম্ভ হইয়া মণিপুর নগরকে বিকম্পিত করিয়া তুলিল।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

বিচার।

মণিপুরের মহারাজা, যুবরাজ ও অন্যান্য সকলের যেরূপ আদালতে, যেরূপ বিচারকের দ্বারা, যেরূপ পদ্ধতিতে বিচার হইয়াছিল এবং সেই বিচারে যেরূপ প্রমাণে, যাহার বিরুদ্ধে, যেরূপ অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া যে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ২১।২২।২৩।২৪।৩৫।৩৬ নং দলীলে বিশেষরূপ প্রকাশ আছে। আমরা এস্থলে কেবল টিকেন্দ্রজিতের বিচার সম্বন্ধে কতক কথা বলিব।

টিকেন্দ্রজিতের বিচার—১৮৯১ সালের ১লা জুনে আরম্ভ হইয়া ৮ই তারিখে সমাপ্ত হয়। ১০ই জুনে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত আদালত (বা বিচার-সভা) রায় প্রকাশ করেন। পরদিন দণ্ডাজ্ঞা হয়—"ফাঁসি।"

অভিযোক্তা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যে ১৫ জন সাক্ষীর এজেহার হয়, তন্মধ্যে পলিটিকেল এজেণ্টের হেড কেরাণী বাবু রসিকলাল কুণ্ডু ও মহারাজের তখনকার কেরাণী বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়, এই দুই জন বাঙ্গালী; চিফ কমিশনারের সঙ্গী ইংরাজ-সৈনিক-কর্ম্মচারী দুইজন ও সিপাহী একজন। তদ্ব্যতীত বাকী ১০ জন মণিপুরী। টিকেন্দ্র-জিতের পক্ষ হইতে যে পাঁচ জন সাক্ষ্য দেয়, সে পাঁচ জনই মণিপুরী।

ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করা সম্বন্ধে যে সকল কথা তিনি নিজে বা তাঁহার পক্ষের ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন, তাহা ২২।২৭।৩৪ নং দলীল এবং ৩৫ নং দলীলের ১৭ দফা হইতে অবশিষ্টাংশ দেখিলেই বুঝা যাইবে। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও ইংরাজ-হত্যার সাহায্যকারী স্থির করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রাণ-দণ্ড করিয়াছেন।

তিনি যে স্বহস্তে হত্যা করেন, কি হত্যার হুকুম দেন, কি বধ্যভূমে উপস্থিত থাকেন, এমন অভিপ্রায় মণিপুরে নব-প্রতিষ্ঠিত বিশেষ বিচারালয় প্রকাশ করেন নাই; গভর্ণমেণ্টও তাহা বলেন না। আনুষঙ্গিক প্রমাণানুসারেই তাঁহাকে দোষী বিবেচনা করিয়াছেন।

বিশেষ আদালতের রায় বা মীমাংসা-পত্রে যে কয়টি হেতুবাদে টিকেন্দ্রজিৎকে বিচারকেরা হত্যার সহায়তাকারী সাব্যস্ত করিয়াছেন, নিম্নে আমরা একে একে সেই কয়টির আলোচনা করিতেছি—তাহাতে সমস্তই প্রকাশ পাইবে। ইহাতে ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্যের কিয়দংশের সহিত আমাদের নিজের বক্তব্যের মিশ্রণ আছে।

(দোষের হেতুবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

১। যুবরাজ ইংরাজ-কর্ম্মচারীগণকে নিজে কেন সঙ্গে করিয়া রেসিডেন্সিতে নিরাপদে পৌছাইয়া দিলেন না?

উঃ। মণিপুরের রাজবংশীয় পদ-মর্য্যাদা ও রীত্যনুসারে তাঁহার পক্ষে তাহা করা কি সঙ্গত? বিশেষতঃ, সাহেবদের বিষম অন্যায় ব্যবহারে সংঘটিত অভাবনীয় দুর্ঘটনায় রুগ্নদেহ টিকেন্দ্রজিতের শরীর ও মনের অবস্থা তখন যেরূপ তাহাতেই তিনি তেমনটি করিতে পারেন নাই। তথাচ রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী অঙ্গেয় মিংতোকে তিনি সাহেবদের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন।

২। তিনি কেন তাঁহাকে তোপখানা বা রাজপুরীর অন্য কোন নিরাপদ স্থানে রাখিলেন না? এবং থঙ্গালের আদেশ পালন না করিতে রক্ষিগণকে কোন বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিলেন না?

উঃ। সেই দরবার-হল ভিন্ন অন্য কোন সুবিধাজনক স্থান রাজবাটীতে কুত্রাপি নাই, যথায় সাহেবেরা সুখে থাকিতে পারিতেন। রাজবাটী হিন্দুর বাসভবন, হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়কে সকল স্থানে বা সকল ঘরে প্রবেশ করিতে দিতে পারেন না। আবার, অন্য গৃহে রাখিলেও যে বিপদ ঘটিত না, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ তখন তাঁহাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয় তো বিপজ্জনক হইত। অপিচ, সাহেবদিগকে সযত্নে রক্ষা করিবার ভার তিনি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গেয় মিংতো মন্ত্রীবরের প্রতি দিয়াছিলেন, আট জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং উসর্ব্বাকে পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছিলেন যে, থঙ্গালের আদেশানুযায়ী কার্য্য কদাচ না করা হয়। টিকেন্দ্রজিতের নিষেধবাণীর বিরুদ্ধকার্য্য হইবার ভয়ও কিছুই ছিল না। ইহাতেও কি তিনি এমন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না যে, সাহেবদের আর কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই? সম্পূর্ণ ভবিষ্যদর্শী না হইলে আর ইহার অপেক্ষা মানুষে কি করিতে পারে?

৩। যুবরাজ যে অসুস্থ ছিলেন, তাহা বিশ্বাস হয় না।

উঃ। এই হেতুবাদের সম্পূর্ণ খণ্ডনার্থ অভিযুক্ত পক্ষ হইতে লণ্ডনস্থ বিবি গ্রিমউডকে যে তারের সংবাদ পাঠান হয়, তিনি ১৮৯১ সালের ২৫শে জুলাই তারযোগে তাহার এই উত্তর দিয়াছিলেন; "২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় মিঃ গ্রিমউড যুবরাজকে অসুস্থ দেখিয়াছিলেন।" আবার গভর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ১নং সাক্ষী বাবু রসিকলাল কুণ্ডু এজেহার দেন যে "ঐ সময়ে আমি মিঃ গ্রিমউডের সঙ্গে ছিলাম। তখন যুবরাজকে দেখিয়াই অসুস্থ বোধ হইয়াছিল।"

অধিকন্তু ইংরাজের মানিত ৬নং সাক্ষী অঙ্গেয় মিংতো বলিয়াছেন যে, "যুদ্ধ বন্ধের পর রাত্রি ৮ টার সময় সাহেবেরা যখন রাজবাটীতে আইসেন, তখন যুবরাজ আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতে বলেন। তখন যুবরাজ তোপখানায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন।" অতএব বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, উত্থান-শক্তি রহিত না হইলেও যুবরাজের দেহ নিশ্চয়ই ভাল ছিল না।

৪। ইংরাজ-হত্যা সম্বন্ধে থঙ্গালের সহিত বাদানুবাদের পরেই, তেমন বিভ্রাট সময়ে, যুবরাজ যে শুইয়া পড়িলেন ও ঘুমাইলেন, ইহা সম্ভবপর নহে।

উঃ। ইহা কি এতই অসম্ভব? একে অসুস্থতা, তাহাতে অকস্মাৎ মহাবিপদ সংঘটনে পূর্ব্ব রাত্রি ও সমস্ত দিনের ভয়ানক শ্রম চিন্তাদিতে অবসন্ন হইয়া পড়া কি স্বাভাবিক নয়? তবে কেন লেঃ চেটাচর্ন সাহেব সেই সব ঘোর বিভ্রাটের মধ্যে সান্ধ্য ভোজনের পর হইতে মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? এ কথা অন্যের নয়, তিনি নিজ মুখে বিশেষ আদালতে সাক্ষ্যস্থলে বলিয়াছিলেন। ইংরাজ পক্ষের যখন ঘোর বিপদের কাল—রেসিডেন্সি মধ্যে হাহাকার—তিনি একজন পদস্থ ইংরাজ—তিনি যদি যৎপরোনাস্তি ক্লান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িতে পারেন, তবে অসুস্থ যুবরাজ যাহার পর নাই পরিশ্রমাদির পর কি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে পারেন না? অন্যান্য সাক্ষীরাও তাঁহাকে সে সময় ঘুমাইতে দেখার কথা বলিয়াছে।

৫। যুবরাজ নিদ্রিত হইলেও থঙ্গালের প্রস্তাবে যে সম্মতি দিয়াছিলেন, সে সময়ের নিদ্রায় তাহাই বরং বুঝাইতেছে।

উঃ। সাধারণ বুদ্ধিতে বরং বিপরীতই বুঝা যায়। থঙ্গালকে বুঝাইয়া পড়াইয়া নিষেধ করিয়া সে বিষয়ে বরং নিরুদ্বেগ হইয়াছেন, সেই নিদ্রায় ইহাই বুঝায়। তিনি যেরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন,

তাহাতে থঙ্গাল আর সাহেব-হত্যায় সাহস করিতে পারিবেন না, তাঁহার মনে এইরূপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। কোন্‌টি স্বাভাবিক, মানব-হৃদয়জ্ঞ মাত্রেই বুঝিয়া দেখুন।

৬। যুবরাজ নিজের কোন বিশেষ অভিপ্রায় সাধনার্থই অঙ্গের মিংডোর উপর ইংরাজকে সযত্নে রক্ষার ভার দিয়াছিলেন।

উঃ। তাঁহাদিগকে আটক রাখিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হইতে নিজের সুবিধা জনক সর্ত্তে সন্ধি করিয়া লওয়া ভিন্ন আর "বিশেষ অভিপ্রায়" তখন কি হইতে পারে? তাঁহাদের রক্ষার কথা বলিয়া পরক্ষণে হত্যা করাতে যে তাঁহার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে, তিনি কি এতই নির্ব্বোধ ছিলেন যে, তাহাও বুঝিতেন না? যদি "কোন বিশেষ অভিপ্রায়" থাকিত, তবে তো হত্যা না করাই সম্ভব। যদি বলেন "আমি হত্যা-সংশ্রবে ছিলাম না, আমি বরং রক্ষার জন্য যত্ন পাইয়াছি" এইটি দেখানই ঐ "বিশেষ অভিপ্রায়।" তাহাও সম্ভব হয় না, কেননা কাহাকে দেখানো? যাঁহাদিগকে দেখাইবেন, তাঁহাদিগকে তখনি তো মারিয়া ফেলিবেন—তাঁহারা তো জীবিত রহিবেন না—আর ফিরিবেন না—সুতরাং ইংরাজের সহিত সন্ধির আশাও থাকিবে না—তবে তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে?

৭। আরুসিংহ ওরফে উসর্ব্বার এজেহারে বুঝা যায় যে, যখন থঙ্গাল জেনারেল প্রথমে বধের আজ্ঞা তাহাকে দেন, সে তখন তেমন রাজনীতি বিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কার্য্য না করিয়া যুবরাজকে গিয়া জানায় এবং যুবরাজ নিষেধ করেন। পরে যখন ইয়েঙ্গ-কর্ব্বার দ্বারা দ্বিতীয় আদেশ তাহার নিকট আইসে, তখন অবশ্যই সে বুঝে যে, অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে যুবরাজ ঐরূপ নিষেধ করিয়া তোপখানায় গিয়া থঙ্গালের সহিত যে পরামর্শ করেন, এই হুকুম তাহারই ফল। সুতরাং স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী হইয়া সে যখন যুবরাজের সম্মতি বুঝিল, তখন তাঁহার সম্মতি অবশ্যই ছিল।

উঃ। কিন্তু উসর্ব্বার এরূপ ধারণা হইবার কোন কারণই ছিল না।

যদি তাহার তেমন অন্যায় ধারণাই হইয়া থাকে, তাহাতেও টিকেন্দ্রজিৎ দায়ী নহেন। যুবরাজ স্বয়ং তাহাকে নিষেধ করেন; প্রথম চাপরাসী ইয়েঙ্গকর্ব্বা আসিয়া তাহাকে এই মাত্র বলে যে "সাহেবদিগকে লামী (ঘাতুকের) হস্তে অর্পণ করিতে থঙ্গাল জেনারেল হুকুম দিলেন।" এ কথায় যুবরাজের মতের আভাস কিছুমাত্র নাই। সে কেন প্রথম বারের মত "যুবরাজের অনুমতি ভিন্ন পারিব না" বলিল না? সে কেন যুবরাজকে এবারেও খুঁজিল না? সে কেন এবারেও "যুবরাজের মত আছে কি না" জিজ্ঞাসা করিল না? এরূপ তর্কের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সেরূপ না করাতে তাহার নিজেরই বুদ্ধিহীনতা ভিন্ন যুবরাজের তিলমাত্রও দোষ প্রকাশ পাইতেছে না। সে কিরূপ ভাবিল বলিয়া যুবরাজকে দোষী বিবেচনা করা কি সুসঙ্গত হয়?

৮। প্রথমবারে থঙ্গাল কেবল সাহেব-হত্যার হুকুম দেন। কিন্তু দ্বিতীয় বারের হুকুমে ঘাতুকের দ্বারা প্রাণদণ্ড করিতে বলেন। ইহাতে বুঝাইতেছে, অবশ্যই থঙ্গাল অপেক্ষা কোন উচ্চতর ব্যক্তি হইতেই সে ব্যবস্থা জন্মিয়াছিল।

উঃ। প্রথমবারের হুকুম যদি তামিল হইত, তবে তাহা ঘাতুকের দ্বারা যে ঘটিত না, তাহা কে বলিল? ১০ নং সাক্ষী ঘাতুক নিজের এজেহারে বলিয়াছে "অন্য দুইজন ঘাতুক আমাকে রাত্রি ৯টার সময় বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনে।" ঘাতুকদিগকে ডাকা হইয়াছিল কেন? সে কি সাহেবদের প্রাণদণ্ড উদ্দেশ্যে নয়? আবার রাত্রি ৯টাতেই তো প্রথম বারের হুকুম হয়। সে হুকুমদাতাও থঙ্গাল, দ্বিতীয় বারের হুকুম দাতাও থঙ্গাল। ঘাতুকের হস্তে সমর্পণার্থ অন্য উচ্চতর ব্যক্তির হুকুম কি আবশ্যক? থঙ্গাল সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না—তিনি গম্ভীর সিংহের সময়াবধি পুরাতন সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী—মণিপুরে তাঁহার প্রতিপত্তি অসম্ভব উচ্চ ছিল—একমাত্র তাঁহার আদেশেই যে পূর্ব্বাপর প্রাণদণ্ড হইত, তাহা ১২ নং সাক্ষীর সাক্ষ্যে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে।

৯। থঙ্গালই যদি এ হুকুমের জন্য দায়ী, তবে হত্যার পরে তাঁহার ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্যের শাস্তি না হইল কেন?

উঃ। উপরেই ব্যক্ত করিয়াছি, থঙ্গাল সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না—শূরচন্দ্রের পিতামহের আমল হইতে ৫০ বৎসরেরও অধিককাল উচ্চ পদে অধিরূঢ়। শূরচন্দ্র ও রাজভ্রাতারা তাঁহাকে "ঠাকুরদাদা" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার শাস্তি বিধান কি সহজ কথা? তবু পর দিন তিনি রাজসভায় আনীত ও তিরস্কৃত হন। তিনি তদুত্তরে এক প্রকার ধমক দিয়াই বলেন "সেজন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না, সাহেবেরা যুদ্ধে হত বলিয়াই রাষ্ট্র করান যাইবে।" হিন্দুর সংসার ও সমাজ যে কিরূপ এবং যিনি কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এমন প্রাচীন গুরুলোক যে কিরূপ মাননীয় ও তাঁহার দোষাবলী যে কতদূর মার্জ্জনীয়, তাহা বিশেষ আদালত অথবা ভারতগভর্ণমেন্টের সুগোচর থাকিলে বোধ হয়, থঙ্গালের শাস্তির কথা উঠিত না। এই সকল সামাজিক তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকাতেই আমাদের রাজপ্রতিনিধিবর্গ হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়া ফেলেন। এত কালেও যে ইংরাজ-রাজপুরুষেরা এ দেশের অবস্থাভিজ্ঞ হইলেন না, তাহা আমাদের দুরদৃষ্ট এবং তাঁহাদের মর্ম্মজ্ঞান হীনতার বিষময় ফল।

সে যাহা হউক, বিশেষ আদালত প্রধানতঃ ঐ কয়টি হেতুবাদ প্রদর্শনের পর শেষে লিখিয়াছেন "অতএব যুবরাজ যে নরহত্যার সহায়তা ও অনুমোদনকারী তাহা আমাদের সকলের মতেই সাব্যস্ত ও তজ্জন্য ফাঁসি দণ্ড ধার্য্য হইল।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বাঙ্গালী বুদ্ধির সমালোচনা-রূপ কষ্টি পাথরে ঐ কয়টি হেতুবাদের কষ যেন মোটেই সোণার কষ

বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না—যেন পীতলের কষ রূপেই দাঁড়াই-তেছে। তাঁহারা যে যে ঘটনাকে ও যে যে ব্যবহারকে অপরাধ সাব্যস্তের পক্ষে অনুকূল বলিয়া ধরিয়াছেন, তত্তাবৎ যে অন্য ভাবেও দাঁড়াইতে পারে, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে উপরে কিছু দেখাইয়াছি। তদ্বাদে তাহার রেওয়া স্বরূপ আরো কিছু বলিতে চাই—অন্ততঃ প্রধান কয়টা কথা সরল ভাবে ধরিলে অপরাধটা যে গরল বর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতাতেই দাঁড়াইতে পারে, তাহা আমরা যেমন বুঝিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকিতে পারি না। এ বিচার যদি নিয়মিত ব্রিটিশ বিচারালয়ে হইত, তবে কি এরূপে (প্রকৃত প্রস্তাবে আইন-সঙ্গত প্রমাণাভাবেও) শুদ্ধ সম্ভাবনার ছিন্ন ভিন্ন সূত্র ধরিয়া ও সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই মীমাংসা ও দণ্ড-বিধান ঘটিত? দেখুন দেখি গল্পটি নিম্নলিখিতরূপে সাজাইলে ঠিক মনে প্রাণে লাগে কি না?

প্রথমে থঙ্গাল নিজের দায়িত্বেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। যুবরাজ তাহা শুনিবামাত্রই নিষেধ করিয়া থঙ্গালের নিকট প্রতিবাদ করিয়াও সেরূপ কার্য্যে শেষে যে কি ভয়ানক বিষময় ফল ফলিবে, তাহাই বুঝা-ইয়া বলেন। উভয়ের বাদানুবাদের পর যুবরাজের শেষ কথায় থঙ্গাল চুপ করিয়া রহিলেন। যুবরাজ নিশ্চিন্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃ ঘুমাইয়া পড়িলেন। থঙ্গাল কিন্তু নিরস্ত হয়েন নাই, দ্বিতীয়বার সাহেব হত্যার হুকুম দিলেন। তখন যুবরাজ যে নিদ্রিত, তাহা স্বয়ং ইংরাজেরই মানিত ১৪ নং সাক্ষী ইয়েঙ্গকর্ব্বা বলিয়াছে। ইহারই দ্বারা দ্বিতীয় আদেশ দেওয়া হয়। তখন সেখানে আর কেহই ছিল না।

কিন্তু বিশেষ আদালত ও গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়াছেন যে, যুবরাজ ঘুমান আর যাই করুন, তাঁহার সম্মতি বা অনুমোদন ভিন্ন

কখনই হত্যাকাণ্ড ঘটিতে পারে নাই। তাঁহাদের এ বিশ্বাসের একটু উপলক্ষও আছে। তাঁহাদের মানিত ১০নং সাক্ষী (ঘাতুক) এজেহার দেয় যে "প্রথমে অপর দুই ঘাতুক আমাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনে। তৎপরে ইয়েঙ্গকর্ব্বা আমাকে ডাকিতে গিয়া বলে যে, যুবরাজ হুকুম দিয়াছেন।" উপলক্ষটুকু তো এই। কিন্তু নিজে ইয়েঙ্গকর্ব্বার এজাহারে তাহা সম্পূর্ণরূপেই খণ্ডিত হইয়াছে। সে বলে "আমি একজন লালুপ্‌চিংবা (অর্থাৎ প্রধান চাপরাসী), আমি ঘাতুককে ডাকিতে যাই নাই—লোকজনকে ডাকা বা পত্রাদি লইয়া যাওয়া লালুপ্‌চিংবার কার্য্যই নহে।" পাঠক মনে রাখিবেন যে, সেও তো একজন ইংরাজেরই মানিত সাক্ষী। বিশেষ, ঘাতুক হইতে সে অনেক উচ্চ পদের লোক। এমন ভদ্র সাক্ষীর কথা ঠেলিয়া ফেলিয়া নীচবৃত্তি-পরায়ণ ঘাতুকের কথা (তাহাও সে বলে, তাহার শুনা কথা) বিশ্বাস করা কি কর্ত্তব্য? অধিকন্তু ৮ নং সাক্ষী উসর্ব্বার কথাও ইয়েঙ্গকর্ব্বার বাক্যের পোষক হইতেছে; উসর্ব্বা বলিয়াছে "ইয়েঙ্গকর্ব্বা আমাকে কহিয়াছিল যে, থঙ্গাল জেনারেলই ঘাতুক-হস্তে সাহেবদিগকে সমর্পণার্থ হুকুম দিয়াছেন।" তদ্ব্যতীত, গভর্ণমেণ্টেরই ১২ নং সাক্ষী সাতোয়াল (অর্থাৎ ঘাতুকের সর্দ্দার) ৬০ বর্ষ-বয়স্ক ত্রিলোক সিংহ আদালতে ঠিক এইরূপ বলিয়াছে;—"কাহার হুকুমে যে সাহেবদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তাহা আমি নিজে কিছুই জানি না। ইয়েঙ্গকর্ব্বা আমাকে বলে যে, থঙ্গাল জেনারেল সেই হুকুম দিয়াছিলেন। তিনিই চিরকাল প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া থাকেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির আমলে তাঁহার হুকুমে অনেক লোকের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতেছি, বিশেষ আদালত ও গভর্ণমেণ্ট, হয় তো এ সব কথা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই কেবল "যুবরাজের আদেশ

ভিন্ন কাহারও কথায় প্রাণদণ্ড অসম্ভব" ইত্যাকারের সন্দেহ ও কল্পনা-তেই সঞ্চালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, থঙ্গাল সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন না, টিকেন্দ্রজিতাদির জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাজ্য মধ্যে তাঁহার আধিপত্য প্রবলরূপেই প্রতিষ্ঠিত। সাহেবদিগের প্রাণদণ্ড করা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা; টিকেন্দ্র বা মহারাজাকে না বলিয়াই তিনি তাহার হুকুম দেন; টিকেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন; অন্য কেহ এরূপ সাহস করিলে তিনি মহা রাগান্ত হইয়া হয়তো তাহাকে অপদস্থ করিতেন। কিন্তু কুরুপাণ্ডব মধ্যে ভীষ্ম যেমন, থঙ্গালও মণিপুরে প্রায় তদ্রূপই (বা কাছাকাছি) পূজ্য ও মাননীয় ছিলেন। সুতরাং ক্রোধান্ধ না হইয়া টিকেন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইতে তাঁহার নিকট দৌড়িলেন; থঙ্গাল তাঁহার বুঝানো কথাতে নিরুত্তর রহিলেন; টিকেন্দ্র ভাবিলেন ঠাকুরদাদা বুঝিলেন ও ক্ষান্ত হইলেন; টিকেন্দ্র পীড়িত, টিকেন্দ্র ক্লান্ত, টিকেন্দ্র আর বসিতে অক্ষম; টিকেন্দ্র (প্রাণদণ্ড রহিত হইল বুঝিয়া) সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া যেমন শুইয়াছেন, অমনি ঘোর শ্রান্তিজনিত অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে থঙ্গাল ভাবিলেন, "টিকেন্দ্র ছেলে মানুষ, এ বিষয় ভাল বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু আমি এমন অত্যাচারী আততায়ীদিগকে হাতে পাইয়া দণ্ড না দিয়া কখনই জীবিত ছাড়িব না।" হয়তো এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া বধের আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় চিরকালই প্রাণদণ্ড হয়. ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের হত্যা গুরুতর ব্যাপার হইলেও আজ্ঞা-পালকেরা ভাবিল, যুবরাজের সম্মতিতেই থঙ্গাল বুঝি দ্বিতীয়বার আজ্ঞা দিলেন, কাজেই তাহারা হুকুম তামিল করিল।

কেমন, পাঠক মহাশয়! আমরা এই যে, (কতক আনুমানিক,

কতক নিশ্চিত) চিত্রে আঁকিলাম, ইহা কি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সত্যরূপে মনে লাগিতেছে না? "টিকেন্দ্রের আজ্ঞা বা অনুমোদন ব্যতীত এ কাজ হইতেই পারে না" এই যে মীমাংসা, ইহা কি এখন নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া হৃদ্বোধ হইতেছে না? কিন্তু হায়! যাঁহাদের হস্তে টিকেন্দ্রের প্রাণ ছিল, তাঁহাদের অন্তর মধ্যে এ প্রণালীর চিন্তা আইসে নাই—তাঁহারা যে কূট তর্কের পথানুসরণ করিয়াছেন, সে পথ হয়তো সামান্য বুদ্ধির পক্ষে সুগম্যই নয়।

আহা! তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন না যে, যখন দায়ে পড়িয়া ইংরাজপক্ষ রেসিডেন্সি ভবনের সর্ব্বোচ্চ স্থান হইতে যুদ্ধ বন্ধের সঙ্কেত স্বরূপ ঘোর রবে শিঙ্গা বাজাইতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের কি প্রাণান্তকর বিপদের সময় এবং টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির পক্ষে তখন ইংরাজ হত্যার কি সুযোগ। টিকেন্দ্র সে সঙ্কেত না শুনিলে কি তাঁহাদের ঘোরতর দুর্দ্দশা ঘটিত না? টিকেন্দ্রের মনে যদি যথার্থই সাহেব-হত্যার বাসনা থাকিত, তবে কি সে সঙ্কেত তিনি মানিতেন? তাহা মান্য করাতে তাঁহার পক্ষীয় লোক কি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই? কতক লোক তজ্জন্য উন্মত্ত প্রায় হইয়া তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত লইতেও চাহিয়াছিল। এ কথা কি সত্য নয়? কজেয় নামক প্রমত্ত মণিপুরী আপন ইচ্ছায় গ্রিমউডকে হত্যা করাতে, থঙ্গাল জেনারেল বিনা পরামর্শে সাহেবদের প্রাণহননের প্রথম হুকুম দেওয়াতে এবং তাঁহাদের সঙ্গে এক শিঙ্গাবাদক হিন্দু সিপাহী লোককে বধ করাতে কি মণিপুরী প্রজা-সাধারণ ও সৈনিক বর্গের ঘোর ক্রোধান্ধতা, প্রতিহিংসার ইচ্ছা ও অদমনীয় উন্মত্ততার বিষয় সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইতেছে না? সাহেবেরা প্রথমে যে কার্য্য করিয়া-ছিলেন, এবং তাহাতে দেশসুদ্ধ লোক যেরূপ বীতশ্রদ্ধ ও ক্রোধ-

ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বীর টিকেন্দ্রজিৎ যতদূর সাধ্য তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন—সাহেবদিগের প্রাণনাশের আশঙ্কা তিনি নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি মতে নিবারণ করিয়া তৎপক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার সে শুভ ইচ্ছা একটিবারও কেহ ভাবিলেন না—উল্টা তাঁহাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ড করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রাণদণ্ড ও নির্ব্বাসন।

গভর্ণরজেনারেল বাহাদুরের পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে মণিপুরের অভিযুক্তগণের সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র তাঁহার নিকট পেশ হইল। তদনন্তর, মহারাজ ও যুবরাজ আপীলও করিলেন। ব্যারিষ্টার ঘোষ মহাশয় স্বীয় মন্তব্য-লিপি মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে অপর সকলেরই নির্দোষিতার যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। (৩৫নং দলীলের ১৭ দফা দেখুন) কিন্তু মহারাজ ও যুবরাজই যখন নিষ্কৃতি পাইলেন না, তখন "অন্য পরে কা কথা!" সকলের দণ্ড সম্বন্ধে ৩৬নং দলীল দ্রষ্টব্য।

আপীল দাখিল ও চূড়ান্ত হুকুম বাহির হওন পর্য্যন্ত তাঁহারা মণিপুরেই বন্দী অবস্থায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। প্রাণ-দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অবশিষ্ট জীবন-কাল-টুকু তাহাদের স্বেচ্ছামত আহারাদি দানের প্রথা সভ্যরাজ্য মাত্রেই আছে। তদনুসারে মণিপুরস্থ ইংরাজ-রাজপুরুষেরা কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্র প্রভৃতিকে সে

বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুগ্রহই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আপনাপন অভ্যাস ও ধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতি-মতে আহারাদি করিতে পাইতেন—শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের জন্য যথা-যোগ্য রাজভোগ্য প্রস্তুত করিত এবং বহু সংখ্যক ভৃত্য তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। প্রাসাদ হইতে আনীত দুগ্ধ-ফেণ-নিভ সুকোমল শয্যায় প্রতি নিশা (নিশাই বা বলি কেন? নিশি-দিবা—হায়! আর কি কাজ ছিল?) তাঁহাদের রাজ-দেহ বিশ্রামলাভ করিত (বিশ্রাম তো অসম্ভব!) অথবা গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে সমর্থ হইত—মনও অদৃষ্টচক্রের ও কালের গতি গণনায় ব্যাপৃত রহিত! টিকেন্দ্রজিৎ স্বীয় প্রাসাদের প্রাঙ্গণস্থিত মন্দিরের মধ্যে এবং কুলচন্দ্র ও অঙ্গেয় সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের মনে নিশ্চয়ই আশা-কুহকিনী এই বলিয়া মরিচিকা মালা দেখাইত যে, মহানুভব প্রশস্ত-চেতা গভর্ণর জেনারেলের ন্যায়ানুরাগ, সুবিচার ও করুণা-গুণে তাঁহারা অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবেন। হা আশা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই—কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

"আশার ছলনা, অসার কলনা!"
"বুঝেও বুঝিনা—চিনেও চিনি না!"
"ছায়াবাজি হ'তে মায়াবিনী!"
"মরীচিকা হ'তে কুহকিনী!"
"ছায়া-বাজি মিছা জানি, ভয় তায় হয় না!"
"মরীচিকা বধে বটে, জ্বালা এত দেয় না!"
"শু সে, মিছা কহে, তবু সাঁচা ভাবি!"
"মনে আঁকে, মনোহর ছবি!"
"গড়ে হৃদি পদ্ম-রবি তারে, যারে হায় পাব না!"

কিন্তু ১৩ই আগষ্ট, ২৯শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার দিবা উদিল—সে

মোহ-ঘোর ভাঙ্গিল! মণিপুরস্থ প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারী তারযোগে লর্ড বাহাদুরের শেষ-আজ্ঞা পাইয়াছিলেন। গুরুবারে সেইগুরু-আজ্ঞা-রূপ অশনি বন্দী রাজ-ভ্রাতাদের শিরে নিক্ষিপ্ত এবং ইংরাজী ও মণিপুরী ভাষায় তাহা ঘোষণা আকারে রাজ্যময় সুপ্রচারিত করিলেন—ঘোষণা ঘোষক দ্বারা সবাদ্য ঢেঁট্‌রাও ফিরাইয়া দিলেন।

সেই মর্ম্মবিদারক ঘোষণা দ্বারা রাজকুলভক্ত প্রজারা জানিল যে, তাহাদের প্রাণ-তুল্য যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের ও জীর্ণ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ থঙ্গাল জেনারেলের সেই দিন অপরাহ্নে প্রাণদণ্ড হইবে; মহারাজা কুলচন্দ্র ও অনুজ অঙ্গেয় সিংহ জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইবেন; তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে; অপর সকলের প্রতি ৩৬নং দলীলানুযায়ী দণ্ডবিধান হইবে। পাছে পুত্রবৎ প্রকৃতি-পুঞ্জ পিতৃবৎ ভূপতি-বংশের সহানুভূতিতে অযথা সঞ্চালিত ও উত্তেজিত হইয়া কোন অহিত ঘটাইয়া তুলে, তন্নিবারণার্থ ঘোষণা-পত্রের শেষাংশে সন্ত্রাসোৎপাদক নিম্নলিখিত-মত বাক্য-বিন্যাস ছিল—যথা;—"ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া ও ইংরাজ-রাজপুরুষগণকে হত্যা করা অপরাধে এই যে সব শাস্তি দেওয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ও তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া মণিপুরী প্রজারা যেন সতর্ক হয়। অদ্য অপরাহ্নে বধ্যভূমে কর্ণেল ইভান্সের আজ্ঞাধীনে ৫০০ বন্দুকধারী গুর্খা যোদ্ধা প্রখর দৃষ্টি সহ প্রহরিতা করিবে—অবশিষ্ট, সমস্ত সৈনিক সুসজ্জিত হইয়া সেনা-নিবাসে অপেক্ষা করিবে—প্রয়োজন হইলেই মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহারা বহির্গত হইবে—বিরুদ্ধাচারী মাত্রেরই প্রাণের মায়া থাকে তো—সাবধান!"

প্রাতঃকাল হইতেই ফাঁসি কাষ্ঠ প্রথিত ও অন্যান্য ব্যবস্থা হইতে লাগিল। যে স্থানে বাল্যকাল হইতে টিকেন্দ্রজিৎ অশ্বপৃষ্ঠে কাজাই

খেলিতেন—যেখানে প্রতিদিন শতশত নরনারী হাটবাজার করিতে আইসে, মণিপুর নগরের সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রকাশ্য ময়দান ভূমে, দুইটি ভয়াবহ ফাঁসি কাষ্ঠ সাম্না-সাম্নি ভাবে স্থাপিত হইল। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ টার সময় ৫০ জন গুর্খা বন্দুকধারী সৈন্য কারাগার হইতে থঙ্গাল জেনারেলকে আনিতে গেল। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় নব্বই বৎসর। সমস্ত কেশ পক্ক-শুভ্র-বর্ণ, চর্ম্ম শিথিল, এবং দেহ জরাগ্রস্ত। বিশেষতঃ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পর হইতে তিনি ক্রমাগতই পীড়িত থাকাতে, তাঁহার দেহ যেন অসাড়, শরীর অস্থি-চর্ম্ম-সার ও হস্তপদ নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। তিনি একবারেই চলৎ-শক্তি রহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে একখানি প্রশস্ত কাষ্ঠ খণ্ডে বসাইয়া কাঁধে করিয়া আনিতে হইয়াছিল। এই ভাবে তাঁহাকে লইয়া, সৈন্যেরা রাজ-প্রাসাদের পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইল।

আরও ৫০ জন গুর্খা সৈনিক টিকেন্দ্রজিৎকে আনিতে গেল। তাঁহার দুইপদে রজ্জুবদ্ধ করা হইল। সেই রজ্জুর দুইপার্শ্বে দুইজন সশস্ত্র বলবান গুর্খা সৈনিক ধরিয়া রহিল। দুর্দ্দান্ত মহিষকে বলিদান সময়ে যে ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সৈন্যগণ তাহাকে সেই ভাবেই লইয়া চলিল। এবং প্রাসাদের পশ্চিম দ্বারে পূর্ব্বোক্ত দলের সহিত একত্রিত হইয়া বধ্যভূমে উপনীত হইল। তথায় পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে ফাঁসিকাষ্ঠ ঘিরিয়া ৫০০ শত সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য চতুষ্কোণাকারে দণ্ডায়মান ছিল এবং মণিপুরস্থিত সমস্ত ইংরাজ-সৈন্যই সৈনিকাবাসে সুসজ্জিত এবং রণোন্মুখী হইয়া সেনাপতির আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ বা যুবরাজ ও থঙ্গাল জেনারেলকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে কোন মণিপুরী প্রজাই সাহসী হয় নাই।

মণিপুর-মহাযজ্ঞের মহা-আহুতি-প্রদান-ব্যাপার দেখিতে, বহু সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিল। চারিদিকের রাস্তা সমূহের বহুদূর পর্য্যন্ত অসংখ্য নরনারী কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মণিপুরী, নাগা, কুকি প্রভৃতি সমস্ত জাতীয় লোকই আসিয়াছিল। টিকেন্দ্রজিৎ যে অসংখ্য লোককে সর্ব্বদা পালন ও যাহাদের বিবিধ প্রকারে উপকার করিতেন, তাহারা সকলে উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্মের মত আর একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য তাঁহার আত্মীয়া ও সাধারণ কুলকামিনীরা, বধ্যস্থলের কিয়দ্দূরে সজল নয়নে দাঁড়াইয়াছিলেন।

যুবরাজ দৃঢ়পদে, নির্ভীকচিত্তে, বক্ষ্যমাণ ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন ভাবে, ফাঁসিমঞ্চের উপর উঠিলেন এবং রজ্জু লাগাইবার জন্য যেন গলাটি বাড়াইয়া দিলেন। আহা! তখনও তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জ্যোতিঃ অস্তমিত হয় নাই! কিন্তু কয়জনে ধরাধরি করিয়া থঙ্গাল জেনারেলকে ফাঁসিমঞ্চের উপর লইয়া গেল। তিনি উত্থান-শক্তিহীন হইয়াছিলেন; এই জন্য একখানি কাষ্ঠের টুলের উপর বসাইয়া তাঁহার গলায় রজ্জু লাগাইয়া দেওয়া হইল। অমনি প্রধান ইংরাজ পুরুষের ইঙ্গিত মাত্রেই একই নিমিষে উভয়েরই আশ্রয় তক্তা যেমন টানিয়া লওয়া হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উভয়েই ঝুলিয়া পড়িলেন—মহা-প্রাণ-যুগল দোদুল্যমান দেহ হইতে অভিমুক্ত হইয়া রাজরাজেশ্বর মহেশ্বরের নিকট রাজদণ্ডের পরিচয়-দান ও পুনর্ব্বিচারভিক্ষার্থ উড়িয়া গেল। চারিদিকে জনতার মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকলের চক্ষের জল বক্ষ ভাসাইয়া ধরণী সিক্ত করিতে লাগিল। যুবরাজের পরিবারস্থ মহিলাগণের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক আকুলিত করিয়া তুলিল। উপকৃত

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিং ও থঙ্গাল জেনারেলের ফাঁসি ।
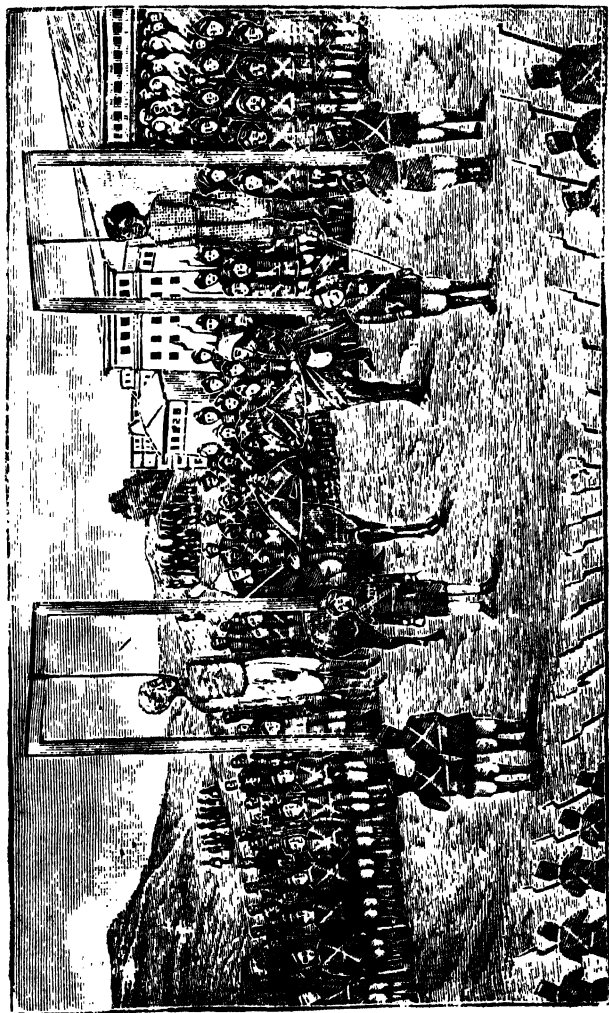
২০৪ পৃষ্ঠা ।

জনেরা বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে কথাটি কহিবার সাহস কাহারও হইল না।

একঘণ্টা পরে ডাক্তার যখন দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, নিশ্চয়ই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তখন শব দুইটি নামাইয়া আত্মীয় স্বজনের হস্তে প্রদত্ত হইল এবং তাঁহারা নদীতীরে লইয়া গিয়া যথারীতি সৎকার করিলেন। বীর টিকেন্দ্রের চিতা দাউ-দাউ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই চিতানলে মণিপুরের স্বাধীনতা ভস্মীভূত হইল।

পরদিন, কলিকাতায় মহারাজ শূরচন্দ্রের নিকট তারে সংবাদ আইসে যে, ম্লেচ্ছের আজ্ঞায় টিকেন্দ্রজিতের অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে; সেক্ষেত্রে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হইবে কি না? মহারাজ সে পক্ষ সম্মতি দেওয়ায় মণিপুর নগরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল।

মহারাজ শূরচন্দ্র তখন কলিকাতা-মাণিকতলা, মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছির বাগানে সহোদরগণের সহিত জীবন্মৃত ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার জন্য মাসিক ২৫০৲ টাকা মাত্র বৃত্তি বরাদ্দ হইয়াছিল। তিনি অতি জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, সদালাপী ও অমায়িক লোক। কিন্তু তখন দারুণ মন কষ্টের জন্য লোকজনের সহিত বেশী দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। হায়! তিনিও দৈহিক স্বাধীনতা হারাইলেন। গভর্ণমেণ্টের হুকুম ব্যতীত তাঁহার এক পাও নড়িবার আর অধিকার ছিল না।

মণিপুরের মহাযজ্ঞে থঙ্গাল জেনারেল ও টিকেন্দ্রজিতের জীবন আহুতি দানের কয়েক দিবস পরে, মহারাজকুলচন্দ্র ও কুমার অঙ্গেয় সেনা প্রভৃতিকে হঠাৎ এক রাত্রিতে মণিপুর হইতে বিদায় করা হয়। সে কার্য্য এমন ভাবে সাধিত হইয়াছিল যে, প্রায় কোন মণিপুরী

প্রজাই জানিতে পারে নাই। আর জানিতে পারিলেই বা কে কি করিত?

মহারাজ কুলচন্দ্র, কুমার অঙ্গেয় সেনা, (সম্প্রতি মন্ত্রী নামে অভিহিত) একজন রাজ-পুরোহিত ব্রাহ্মণ, জনৈক মণিপুরী সেনাপতি এবং অপর দশ ব্যক্তি লইয়া এই হতভাগ্য বন্দী দলটি গঠিত। প্রথমোক্ত তিনজনকে ধুতি, চাদর, কোর্ত্তা, মোজা ও বিনামা ব্যবহারার্থ অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু অপর সকলকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ ও সাধারণ বন্দী-সজ্জায় রাখা হইল। আনিবার সময় ষ্টীমারের অল্পাংশ বাঁশ বাখারি দ্বারা ঘিরিয়া তাহারই মধ্যে মহারাজ সহিত সকলকেই পূরিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রথমোক্ত তিন জন ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণীর শৌচাগারাদি ব্যবহার করিতে পাইতেন। অপর সকলের, ভাগ্যে কুলীদের পাইখানা ভিন্ন গতি ছিল না। পথিমধ্যে যৎকালে দিমাপুর হইতে জলযান যোগে ধরেশ্বরী নদী বাহিয়া তাঁহাদিগকে আনা হইতেছিল, তৎকালে ধরেশ্বরীকে দেখিয়া মহারাজ কুলচন্দ্র যেন বড়ই আকুল হইয়া কিয়ৎক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। পরে স্রোতস্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবের বাক্যাবলী নিঃসরণ করিলেন, "মাগো ধরেশ্বরী! আমাদের বংশের মধ্যে এই অধম সন্তানই আজ এই প্রথম তোমার দর্শন পাইল। কিন্তু জননী গো, কি অবস্থায়? সামান্য পথের ভিখারী হইতেও এ দুর্ভাগার এখন হীন দশা!" পুনর্ব্বার করযুগল সম্পুটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায় মা! তোমাকে দিবার সঙ্গতি এ দীনের আর কিছুই নাই, কিন্তু তুমি করুণার স্রোতবাহিনী, সেই করুণা গুণে এই সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ কর।" সকরুণ স্বরে ইহা বলিতে বলিতে স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে সহস্রাধিক মুদ্রা মূল্যের এক

ছড়া মণিকাঞ্চনময় হার উন্মোচন পূর্ব্বক নদী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন এবং মুদ্রিত নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিলেন। প্রহরীরা বিস্মিত হইয়া তাহা পাইবার লোভে জলে পড়িয়া বিস্তর সন্ধান করিল, পাইল না—দেবোদ্দেশে অর্পিত হার অপবিত্র হস্তে আসিবে কেন?

তাঁহারা রাত্রিকালে গোলাঘাট পৌঁছেন। সে সময় তত্রত্য স্কুলঘর ও ডাক বাঙ্গালাদি খালি ছিল, তথাপি গারদের মধ্যে তাঁহাদের অবস্থান স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত রাত্রি মধ্যে তাঁহাদের আহারাদিরও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে জনৈক দয়ার্দ্র ভদ্র বাঙ্গালী এক গ্লাস দুগ্ধ লইয়া মহারাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া একটি রৌপ্যপাত্রে দুগ্ধটুকু ঢালিয়া সমস্তই পান পূর্ব্বক সেই পাত্রটি সেই বাঙ্গালী মহাশয়কে নির্ব্বন্ধ সহকারে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলেন। এই সময় রাজ-দর্শনাভিলাষে গারদের চারিদিকে প্রায় পঞ্চ সহস্র সংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছিল। গোল শুনিয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া মহারাজাকে বলিলেন "বিস্তর লোক আপনাকে দেখিতে আসিয়াছে; একবার বাহিরে আগমন করিলে ভাল হয়।" মহারাজ সম্মত হইলেন না, ভাব যেন "আমি আর এ মুখ কাহাকেও দেখাইতে চাহি না!" একটি মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসও উদ্গত হইতে দৃষ্ট ও শ্রুত হইল।

উক্ত মহারাজ প্রভৃতি যাবতীয় বন্দীগণ মণিপুর হইতে আনীত হইয়া প্রথমে গোলাঘাটে পরে আসামের অন্তর্গত তেজপুরস্থ প্রধান কারাগারে (Central jail) অবরুদ্ধ রাখা হয়। পরে সন ১২৯৮ সালের ২০শে কার্ত্তিক তথা হইতে ডাক-ষ্টীমারে কলিকাতায় প্রেরিত

হন। সঙ্গে সশস্ত্র দ্বাদশ সংখ্যক সিপাহী, জনৈক লেফ্‌টেন্যাণ্টের অধীনে প্রহরী ছিল। পরে তাঁহাদিগকে কলিকাতা-আলিপুরস্থ জেলে আবদ্ধ রাখিয়া সকলকে আণ্ডামান দ্বীপে পাঠাইবার যোগাড় হইতে লাগিল। ওদিকে কিন্তু এক মহাবাত্যায় আণ্ডামান দ্বীপটি ছিন্ন ভিন্ন ও ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

টিকেন্দ্রজিৎ কাহিণী।

বাঙ্গালা সন ১২৬৫ সালের শেষভাগে টিকেন্দ্রজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। শুনা যায় যে, শৈশবকালে যখন কেবল টিকেন্দ্র হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছিলেন, তখনই কোন স্থানে একত্রে অস্ত্রশস্ত্রের সহিত খেলেনা বা আহার্য্য দ্রব্যাদি থাকিলে তিনি অন্য কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, কেবল অস্ত্রশস্ত্রাদি লইতেই চেষ্টা করিতেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি বালক টিকেন্দ্রকে যথোপযুক্তরূপে অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য অশ্বাধ্যক্ষ বাদাম সিংহ ও অস্ত্রচালন-পারদর্শী এঙ্গকাইবা চাওবাকে এবং বাঙ্গালা ও মণিপুরী ভাষা শিখাইবার জন্য পণ্ডিত ঘনশ্যাম সিংহকে নিযুক্ত করেন। টিকেন্দ্রজিৎ পাঁচ্‌ ছয় বৎসর বয়সেই অশ্বারোহণে বেশ পটু হইয়াছিলেন। এবং ১০।১২ বৎসর বয়সে মণিপুর রাজ্যের মধ্যে অদ্বিতীয় অশ্বারোহী হইয়া উঠিলেন আবার সেই বয়সেই তাঁহার ধনুর্বিদ্যা, তরবারি-সঞ্চালন ও উড্ডিয়মানা পক্ষী প্রভৃতির প্রতি বন্দুকের নিশান-দক্ষতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য

হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তক-লিখিত বিদ্যা উপার্জ্জনে তিনি ততদূর মনোনিবেশ করেন নাই। ১১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার যজ্ঞোপবীত হয় এবং কিছুদিন পর হইতেই তিনি তাৎকালিক পলিটিকেল রেসিডেণ্ট ম্যাকলক সাহেবের নিকট ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা ভাল না লাগাতে অবিলম্বেই পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময় হইতেই তিনি ধনুর্ব্বাণ, তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার এবং অশ্বারোহণে শিকারে বহির্গত হইতে আরম্ভ করিলেন। এখন তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া নানাবিধ পশু, পক্ষী এবং (১৫।১৬বৎসর বয়স হইতে) ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক জন্তু সকলও শিকার করিতে লাগিলেন। টিকেন্দ্রজিত অতি চমৎকার রন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন। শিকার লব্ধ মাংস স্বহস্তে উৎকৃষ্টরূপে পাক করিয়া বন্ধু ও অনুচরগণকে খাওয়াইতেন এবং (প্রায়ই একত্রে বসিয়া) নিজেও খাইতেন। টিকেন্দ্রজিত নিজে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেও শিখিয়াছিলেন। ফলতঃ রাজপুত্র ও গৃহস্থ পুরুষোচিত সকল কার্য্যই তিনি ভাল বাসিতেন। ক্রমে মৎস্যমাংসের উপর তাঁহার এত স্পৃহা বর্দ্ধিত হইল যে, তদ্ভিন্ন আহারই হইত না—আবার কোন দিন কোন বিশেষ কারণে শিকারে যাইতে না পারিলে, তাঁহার শরীর মন ভাল থাকিত না এবং রাত্রেও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত। যে ব্যক্তি অনন্য-কার্য্য হইয়া, সর্ব্বদা শিকারান্বেষণে বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করে, মণিপুরী ভাষায় তাহাকে কৈরংবলে। টিকেন্দ্রজিতের তদ্রূপ স্বভাব দেখিয়া, মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি একদিন তাঁহাকে কৈরং বলিয়া উল্লেখ করেন। তদবধি টিকেন্দ্রজিৎ কৈরং নামেই মণিপুর রাজ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হন। (১১ নং দলীল দেখুন) ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম

কালে, তিনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র-শিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বহস্তে বিস্তর ভল্লুক, সিংহ ও বন্য মহিষাদি এবং ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যাঘ্রের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। বীর টিকেন্দ্রজিতের ব্যাঘ্র-শিকার-পদ্ধতি অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর! বন্দুকের গুলি বা তীরে ব্যাঘ্র মারায় যে কিছুমাত্র বাহাদুরী আছে, তাহা তিনি মনে করিতেন না। ব্যাঘ্রের দৃষ্টি-মার্গবর্ত্তী হইয়াই টিকেন্দ্র হটাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূমিতে পড়িতেন বা সবেগে সশব্দে তাহার নিকট অগ্রসর হইতেন। তাহাতেও ব্যাঘ্র আসিয়া আক্রমণ না করিলে, তাহাকে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা উত্যক্ত ও উত্তেজিত করিতেন। পরে আক্রমণার্থ, ব্যাঘ্র যেমন মহা বিক্রমে লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর পতিত হইত, অমনি সেই পুরুষ-ব্যাঘ্র স্বীয় দৃঢ়-মুষ্টি-বদ্ধ তরবারির একটি প্রচণ্ড আঘাতে, তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে কতবার কত ঘোর বিপদেই পড়িয়া তাঁহার জীবন সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হইতেন না —বিপদকে সতত আহ্বান করিতেন—বিপদে পড়িলে, তাঁহার মনে এক প্রকার বিজাতীয় সুখ ও উৎসাহের সঞ্চার হইত। টিকেন্দ্র যে সকল ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতেন, তাহাদের দেহ প্রায়ই সম্পূর্ণ থাকিত না—অধিকাংশই দ্বিখণ্ডিত, নচেৎ প্রায় বিভক্ত দেখা যাইত।

একবিংশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমে তিনি যেরূপ অসম সাহসিকতা ও শিক্ষাপ্রদ অসামান্য রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শনে ভীষণ নাগা-যুদ্ধে ইংরাজ-দের মান, প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথা স্থানে বর্ণনা করিয়াছি। (ইতিহাসের ৭৯ পৃষ্ঠা হইতে ৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন।)

মণিপুর রাজবংশ পরম বৈষ্ণব। কাজেই টিকেন্দ্রজিতের সেই-রূপ ভয়ানক মাংস-প্রিয়তায় মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি আন্তরিক সন্তুষ্ট

ছিলেন না। টিকেন্দ্রজিতের ২৪বৎসর বয়ঃক্রম কালে (অর্থাৎ সন ১২৮৯ সালে) মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি, একদিন তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার কথা বিশেষ অনুরোধের সহিত বলায়, টিকেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সেই দিন হইতেই একবারে মাংসাহার ও নিরীহ পশু পক্ষীর প্রাণবধ প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে বন্ধু বান্ধবের মনোরঞ্জনার্থ মৃগাদি শিকার ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অপর সকলকে খাওয়াইতেন। কিন্তু তিনি চিরদিনই ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর কালস্বরূপ ছিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন। বহুবিবাহ হিন্দু ও মুসলমান রাজকুলের একপ্রকার চির প্রথা। টিকেন্দ্রজিৎও তদনুসারে ক্রমে ক্রমে আটটি দার-পরিগ্রহ করিলেন। প্রাণদণ্ডের সময়, তাঁহার একমাত্র প্রাণপ্রতিম পুত্র চৌবার বয়স ৯ বৎসর মাত্র ছিল। টিকেন্দ্রজিতের মুখের ভঙ্গী ও চক্ষের সুতীক্ষ্ণ চাহনীতে কি এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি ছিল যে, যে কেহ তাঁহাকে দেখিত, তাহারই তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। (আমরা এই পুস্তকে তাঁহার পীড়িত মূর্ত্তি দিয়াছি—তাহাও প্রকৃত প্রতিকৃতি হইয়াছে কিনা, ঠিক বলিতে পারি না।) তাঁহার অসাধারণ দানশক্তি এবং স্বভাবটিও তেমনই সরল ও অমায়িক ছিল। তিনি আত্ম-পর না ভাবিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, অনাথ অনাথা, নিঃসহায় বালক বালিকা বা দায়গ্রস্ত পুরুষ মাত্রকেই সমাদরে শীলতার সহিত দান করিতেন। বিস্তর ব্যক্তি তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত। বৃন্দাবন যাত্রী মণিপুরীদের অধিকাংশই তাঁহার দানের উপর নির্ভর করিত। সৎকার্য্যার্থ দানে টিকেন্দ্র চিরকাল মুক্ত-হস্ত—নীচতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না এবং কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বরই

তিনি ভাল বাসিতেন না। তাঁহার হৃদয় যেমন প্রশান্ত ও প্রশস্ত ছিল, তেমনি তিনি সদালাপী, বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। কিন্তু প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সকলকেই স্পষ্ট কথা বলিতেন। আবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূপ যে বিষম অগ্নি তাঁহার অন্তর মধ্যে নিহিত ছিল, তাহা অন্যায্য-ব্যবহার-রূপ বাতাসে একবার জ্বলিয়া উঠিলে বড়ই বিষম হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্যই টিকেন্দ্রজিৎ সময়ে সময়ে ভয়ানক উদ্ধত প্রকৃতির ন্যায় কার্য্য করিতেন। বহু বীর পুরুষদের ধরণ প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। মণিপুরীরা যেমন তাঁহাকে ভয় করিত, সেইরূপ অধিকাংশ প্রজাই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত। বস্তুতঃ টিকেন্দ্র নিজের কার্য্য-কুশলতা, সজীবতা, সদাশয়তা ও মানসিক তেজস্বিতাগুণে, (রাজা না হইয়াও) মণিপুরে অখণ্ড প্রতাপে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি হইবার পর হইতে তাঁহার বার্ষিক আয় (সর্ব্ব প্রকারে) প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা ছিল। তদ্ভিন্ন অশ্ব ভৃত্যাদি সমস্তই, রাজ-সরকার হইতেই পাইতেন। যুবরাজ হওয়ায় আয় আরও বাড়িয়াছিল। তথাচ অতিরিক্ত দান-শীলতার জন্য তিনি ঋণজালে ভয়ানকরূপে জড়িত হইয়াছিলেন। ফাঁসির সময়, তাঁহার বয়স বত্রিস বৎসরের কিছু বেশী মাত্র হইয়াছিল। হায়! টিকেন্দ্র অনন্তকালের সহিত বিলীন হইলেন—তাঁহার সাধের মণিপুর পড়িয়া রহিল। যে পুত্র চৌবাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, কে আর সেই সহায় সম্পত্তি শূন্য বালককে যত্ন করিবে? যে কুলকামিনীগণকে তিনি সহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন, তাহাদের দশা কি হইবে? বীর, সদাশয়, দাতা, আজন্ম-পরোপকারী টিকেন্দ্রজিতের একমাত্র (পিতৃহীন) পুত্র ও

(অনাথা) মহিষীগণকে কি মণিপুরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে? হায়! হায়! এ কথার উত্তর আমরা দিতে পারিব না। হতবুদ্ধি হইয়া বীর টিকেন্দ্রজিৎ নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার পুত্র ও পত্নিগণেরও মরণই মঙ্গল।

উনবিংশ অধ্যায়

পারণাম ফল।

ইংরাজ রাজের চির-সুহৃদ ও পরম সহায় মহাকীর্ত্তিমান মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্রের রাজ্য গেল এবং তিনি ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া বিনাদোষে এ জন্মের মত রাজবন্দী হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ, থঙ্গাল জেনারেল, কুইণ্টন, গ্রীমউড, স্কীনে, কসিন্স, সিম্‌সন্, ব্রাকেনবরি ও মেলভিলের এবং বিস্তর ভারতবাসীর (মণিপুরী সৈন্যাদি ও গুর্খা সিপাহী প্রভৃতির) প্রাণ গেল। কুলচন্দ্র, অঙ্গেয় সিংহ প্রভৃতির আণ্ডামান দ্বীপে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। তাঁহাদের যাবতীয় সম্পত্তিও গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিলেন। মণিপুর চির-স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া পড়িল। এখন গভর্ণমেণ্ট যত সৈন্য রাখিবেন বা যাহা ইচ্ছা করিবেন, মণিপুর রাজ্যে তাহাই হইবে। যে মহারাজা গম্ভীর সিংহ ১৮৩৩ সালে ইংরাজের সহিত সর্ব্বপ্রথম সন্ধি করিয়াছিলেন, ১৮৯০ সালে ইংরাজের প্রতাপে তাঁহার নাম ডুবিল—তাঁহার বংশধরগণ প্রায় পথের ভিখারী বা বন্দী হইলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বাহালী-সনন্দ-বলে

একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালক অকস্মাৎ মণিপুরের রাজা এবং নগণ্য চৌবী জৈব রাজার বাপ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, সেখানকার রাজা বা রাজার রাজা হইলেন একজন ইংরাজ পুরুষ—যিনি রেসিডেণ্ট রূপে সকলকে সন্ত্রাসিত করিবেন। দুইজন বিলাতী বিবির (মিসেস গ্রিমউড ও মেলভিলের) ভারত-রাজকোষ হইতে, যাবজ্জীবনের জন্য প্রচুর মাসহারা বরাদ্দ হইল। বিধবা হইয়াও তাঁহাদের অর্থকষ্ট হইবে না। তাঁহাদের স্বামীরা সহজ অবস্থায় মরিলে এরূপ সুবিধা হইত কি? বিবি গ্রিমউড মণিপুরী কাণ্ডের নায়িকারূপে জগৎবিখ্যাত হইলেন। মহারাজ শূরচন্দ্র মাসে আড়াই শত টাকা মাত্র বৃত্তি পাইলেন, কিন্তু প্রকাশ যে, গ্রিমউডের বিধবা বিবি মহারাজের অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা মাসহারা পাইলেন। আবার গ্রিমউড পত্নী "গোল্ডেন ক্রস" নামক উপাধিতে ভূষিতা হইলেন। বিলাতে তাঁহার পশার প্রতিপত্তি খুবই বেশী। তখনকার মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু—এখনকার মহারাণী স্বয়ং—তাঁহার জন্য চাঁদা তুলিয়াছিলেন। লেঃ গ্রাণ্ট মেজর পদে উন্নীত ও "ভিক্টোরিয়া ক্রস" নামক মহা মর্য্যাদাযুক্ত উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। মণিপুরে কুইণ্টন প্রভৃতির স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন জন্য চাঁদা উঠিল—তাহাতে লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাদুর স্বয়ং আড়াই শত টাকা দিয়া, অপর সকলের মুক্ত-হস্ত হইবার প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। ভারতের সাধারণ প্রজাগণ ইংরাজ-রাজনীতির আর এক অধ্যায় মুখস্থ করিল। স্বাধীন ও করদ রাজাগণ এমন শিক্ষা পাইলেন যে, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। মণিপুর-বিজেতা বলিয়া লর্ড ল্যান্সডাউনের নাম ভারত-ইতিহাসে লিখিত হইবে। সম্ভবতঃ কাছাড় হইতে মণিপুর এবং তথা হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত রেল

রাস্তা হইবে। মণিপুরের পুরাতন সম্ভ্রান্ত দলের মাথা হেঁট হইল—নূতন দল মাথা তুলিল। কিন্তু পূর্ব্বে ক্ষত্রীয় জাতির প্রাধান্য ছিল, এখন তাহা অনেক পরিমাণে কমিবে—এখন সকলেই প্রায় সমানই হইবে। ইংরাজের অঙ্গুলিহেলনে মণিপুর চালিত ও ভ্রূকুঞ্চনে মণিপুরীরা বিকম্পিত হইবে। এই সমস্ত কথা বাঙ্গালা সন ১২৯৮ সালে লিখিত এবং সেই সময়েরই উপযোগী।

বিংশ অধ্যায়।

মণিপুরের নূতন বন্দোবস্ত।

যে দিন টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়, সেই দিনেই লাট-দরবারে মণিপুরের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যলিপি নির্ণীত ও তৎসংবাদ বিলাতে ষ্টেট-সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়া চূড়ান্তরূপে স্থির হইল;—(১) চূড়াচাঁদ নামক একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালককে গভর্ণমেন্ট' মণিপুরের (মহারাজা নহে) রাজা করিয়া দিলেন। চূড়াচাঁদ গম্ভীর সিংহের সেনাপতি (এবং পরে কিয়ৎকাল মণিপুরের অধিপতি) মহারাজা নরসিংহের একজন প্রপৌত্র। চূড়াচাঁদের পিতার নাম চৌবী জৈম। জৈম আবার নরসিংহের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধর—মণিপুর রাজ্যের একজন নগণ্য লোক মাত্র। জৈমর আরও কয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিল—চূড়াচাঁদ বয়সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। (২) চূড়াচাঁদের নাবালকী অবস্থায়, একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারী মণিপুর রাজ্যে কর্তৃত্ব করিবেন। (৩)

মণিপুরের রাজা ব্রিটিশ-অধিকারে আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ ১১টি তোপধ্বনি হইবে—মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র, শূরচন্দ্র প্রভৃতির সম্মান জন্য অন্য স্বাধীন ভূপতির ন্যায় ১৯টী বা ২১টী তোপধ্বনির নিয়ম ছিল। (৪) রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবেন—বংশহীনতা ভিন্ন রাজার ভ্রাতাকে বা অন্য কাহাকে সেই পদ দেওয়া হইবে না। কিন্তু যিনিই হউন, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি ভিন্ন কেহই রাজা হইতে পারিবেন না। (৫) মণিপুরের রাজাকে নিয়মিতরূপে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইবে—সেই করের প্রকার ও পরিমাণ গভর্ণমেণ্ট পরে স্থির করিয়া দিবেন। (৬) মণিপুর রাজ্যের শান্তি রক্ষার্থে সেখানে ১৩ শত ইংরাজ-সৈন্য থাকিবে।

গভর্ণমেণ্ট সেই পঞ্চম বর্ষীয় বালক চূড়াচাঁদকে এইরূপ মর্ম্মে সনন্দ দিয়াছিলেন;—"মণিপুরাধিবাসী চৌবী জৈমর পুত্র চূড়াচাঁদ! এতদ্দ্বারা অবগত হইবে। তোমাকে মণিপুরের রাজা করা গেল। মণিপুর রাজ্যের প্রভুত্ব, রাজ-উপাধি এবং সম্মান, তোমার বংশে পুরুষানুক্রমে চলিবে। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবে—কিন্তু প্রতিবারেই সেই উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোনয়ন ও মঞ্জুর চাহি। ইহার পরে যেরূপ কর ধার্য্য করা হইবে, তুমি ও তোমার উত্তরাধিকারীগণ নিয়মিতরূপে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহা দিবে। তোমাকে ইহাও অবগত করা যাইতেছে যে, এই সনন্দের দ্বারা যে অধিকার প্রদত্ত হইল তাহার স্থায়িত্ব তোমার এবং তোমার উত্তরাধিকারীগণের সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিবে। মণিপুর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত ও শাসন, রাজ্যান্তর্গত পার্ব্বত্যজাতীদের দমন, রাজ্যে সশস্ত্র সৈন্যদল গঠন, রক্ষণ বা সঞ্চালন এবং অন্য যে কোন কার্য্য সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেরূপে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিবেন, তোমাকে ও

তোমার উত্তরাধিকারীগণকে তাহাতে সম্মত ও সম্পূর্ণ বাধ্য থাকিতে হইবে। তুমি নিশ্চিত জানিও যে, যে পর্য্যন্ত তুমি বা তোমার বংশ-ধরগণ এই সনন্দের সর্ত্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিবে, সে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে অনুগ্রহভাজন ও আশ্রিত জ্ঞান করিবেন।”

একবিংশ অধ্যায়।

আন্দোলন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমাদের যথেষ্ট বাক্য ও লিপি-স্বাধীনতা আছে। আবার ইংরাজদের তো কথাই নাই—তাঁহারা ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। মণিপুর ব্যাপার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সংবাদ পত্রে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল—বিলাতের মহাসভা (পার্লিয়ামেণ্ট) তেও সে বিষয়ের কথা বহুবার উঠিয়াছিল। আমরা এস্থলে সেই সকল কথার কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্র।

স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল সংবাদ পত্রই গভর্ণমেণ্টের মণিপুরী নীতি সম্বন্ধে কোন না কোনরূপে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। টিকেন্দ্রজিৎকে দরবারে আহ্বান করিয়া গ্রেপ্তার করিবার অভি-প্রায় যে দারুণ নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেরূপ ছলনা যে ভারতের সর্ব্বপ্রধান-শক্তি, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ রাজের নিতান্ত অনুপযুক্ত, এই ভাবের কথা সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন।

মহারাজ শূরচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য গভর্ণমেণ্ট টিকেন্দ্রজিৎকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অথচ যাঁহার জন্য টিকেন্দ্রের দণ্ড, সেই মহারাজের রাজ্যলাভের সাহায্য, বা তাঁহার কিছুমাত্র উপকার করিতে চাহেন নাই—বরং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন—বলিয়া অনেকে গভর্ণমেণ্টের এই রাজনীতিকে ন্যায়-শূন্য ও ধর্ম্মহীন উল্লেখ করিয়া ভয়ানক দোষ দিয়াছেন। আবার যে বিদ্রোহের জন্য টিকেন্দ্রজিৎকে বিনা বিচারে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য-বোধ হইল, সেই বিদ্রোহের ফল-ভোগী কুলচন্দ্রকে নিজেদের সুবিধাজনক সর্ত্তে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাওয়া যে গভর্ণমেণ্টের ঘোর স্বার্থপরতা ও নিতান্ত মতিভ্রমের কার্য্য, এমন ভাবের কথাও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। তত অল্প সৈন্য লইয়া কুইণ্টনের যাওয়া যে, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাও বলিতে অনেকে ক্রুটি করেন নাই।

অন্য কতকগুলি বড় বড় সম্পাদক যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, মণিপুর চিরকালই স্বাধীন ছিল। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, নরসিংহ, দেবেন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র যিনি যখন নিজের বাহুবলে মণিপুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই 'মহারাজা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র নিজের জীবদ্দশাতেই যখন শূরচন্দ্রকে রাজ্যদান করেন, তখনও গভর্ণমেণ্ট দ্বিরুক্তি করেন নাই। তদনুসারে মণিপুরের আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্যে গভর্ণমেণ্টের এখনও হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ছিল। অনেকে এমন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তর-ব্রহ্ম দখল করিয়া, গভর্ণমেণ্টের মণিপুরেও একাধিপত্য স্থাপন করিবার মতলব কয়বৎসর হইতেই ছিল—তাঁহারা সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন মাত্র। আবার

বিলাতের মিঃ লাবুসার (নিজে ইংরাজ হইয়াও) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ইংরাজেরা যেমন অনধিকার চর্চ্চা পূর্ব্বক, ঘোর স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায়রূপে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন, মণিপুরীরা তাঁহাদের সৈন্য-সামন্তগণকে পরাস্ত ও প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিয়া তাহার উপযুক্ত প্রতিফলই দিয়াছে।"

এখানকার ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিপণ প্রভৃতি বড় বড় রাজনীতিজ্ঞেরাও বিলাতে এই মণিপুরী ব্যাপার লইয়া ভয়ানক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন এবং লর্ড ল্যান্সডাউনের বুদ্ধি বিবেচনার দোষ দিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে একদিন সেইরূপ বাদানুবাদের সময়, ভারতবর্ষের ষ্টেটসেক্রেটারীর সহকারী সারজন গষ্ট, গভর্ণমেণ্টের দোষ কাটাইবার জন্য এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন—"যে দেশেই হউক, যে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একাধিপত্যের অন্তরায় হয় বা যাহার দ্বারা সে পক্ষে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহারা তাহাকেই নির্ব্বাসিত করেন—বা করায়ত্ত করিয়া অন্য কোন কৌশলে হীনপ্রভ করিয়া ফেলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এইরূপে নিউজিলণ্ডের আদিম রাজাকে এবং আফ্রিকার জুলুরাজ্যে রাজা সিটেওয়াকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন। আবার মিশরের জব্বর পাশাকে এইরূপে অবসন্ন এবং (বীর, স্বদেশভক্ত ও সাধারণের প্রিয়) আরাবী পাশাকে লঙ্কাদ্বীপে চির-নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। মণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ যে কিরূপ লোক, তাহাও আমাদের ভাবা উচিত। তিনি তো সামান্য লোক নহেন। টিকেন্দ্রজিৎ বড়ই ক্ষমতাশালী পুরুষ—তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতাও অত্যধিক। যে সদাশয়তা ও বদান্যতাকে প্রাচ্যদেশবাসীরা সর্ব্বপ্রধান

সদ্‌গুণাবলির মধ্যে গণ্য করেন টিকেন্দ্র আবার সেই সব মহদ্‌গুণে বিভূষিত। সেই জন্যই তিনি দেশীয়দের বড়ই অনুরাগভাজন। আমি সর্ব্ব সমক্ষেই স্বীকার করিতেছি যে, ভারত-গভর্ণমেণ্ট (অর্থাৎ পাত্র মিত্র সহ লর্ডল্যান্সডাউন) বিবেচনা করেন যে, টিকেন্দ্রজিতের মত শক্তিমান, উচ্চাশয়, অতি-যোগ্য ও স্বাধীন প্রকৃতির লোককে রাজ কার্য্যের অনুপযুক্ত গণ্য করাই উচিত এবং তাঁহার অপেক্ষা মধ্যবিধ গুণ ও ক্ষমতা-সম্পন্ন লোকের উপর নির্ভর করিলে জগতের মঙ্গল সম্ভাবনা বেশী এবং বিপদের আশঙ্কা কম হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়াই ভারত-গভর্ণমেণ্ট টিকেন্দ্রজিৎকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার মতে তাঁহাদের বিবেচনা (খুব সম্ভবতঃ) ভালই হইয়াছে।”

এই কথা শুনিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সকলে মহালজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। বিপক্ষ ও প্রতিবাদকারিগণ ঘৃণা, ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাসের টিট্‌কারী দিতে লাগিলেন। তখনকার (মহারাণীর ভারত-সচীব, লর্ড ল্যান্সডাউনের উপরিতন কর্ম্মচারী) ষ্টেটসেক্রেটারীর সহকারীর মুখে এই কথা শুনিয়া, লোকে বুঝিল যে, ভিতরের কথা তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। এবং আপামর সাধারণের মনে ধারণা জন্মিল যে, বীর টিকেন্দ্রজিতের ভয়প্রযুক্তই ভারতগভর্ণমেণ্ট দারুণ-কুবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া, মণিপুর সম্বন্ধে অতি দূষনীয় নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিলাতে ও এখানে সার্ জন্ গষ্টের কথা লইয়া, ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। “নর-হত্যাকারী, উদ্ধত-স্বভাব” ইত্যাদিরূপ বলিয়া যে, অনেকে টিকেন্দ্রজিতের নিন্দা করিতে-ছিলেন, তাহাও এই হিড়িকে চাপা পড়িয়া গিয়া, গভর্ণমেণ্টের দোষের কথাই সর্ব্বত্র আলোচিত হইতে লাগিল। পার্লিয়ামেণ্টের

অন্যান্য মহামান্য সভ্যগণ সার্ জন গষ্টের কথার বিস্তর প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তবুও সাধারণের মনের সংস্কার ঘুচিল না।

সংবাদ পত্রে এইরূপও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, কুইন্টনের সহিত পরামর্শ কালে, লর্ড ল্যান্সডাউন নাকি এই ধরণের কথা বলিয়াছিলেন ;—"ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি। আমি মহারাণীর প্রতিনিধি—সেই রাজশক্তির শীর্ষস্থানে থাকিতে—আমাদের মতামত না জানিয়া, আদেশ না লইয়া, টিকেন্দ্রজিৎ একজনকে সরাইয়া আর একজনকে রাজা করিল! তাঁহার এ অপরাধ কোন মতেই মার্জ্জনা করা যাইতে পারে না। অতএব টিকেন্দ্রজিৎকে মণিপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবেই হইবে"—ইত্যাদি। আবার টিকেন্দ্রের স্বাপক্ষে কথাও রটিল যে "তিনি মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই মহারাজা শূরচন্দ্রকে সরাইয়া কুলচন্দ্রকে রাজাসনে বসাইয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার নিজের স্বার্থ কিছুই ছিল না—" ইত্যাদি।

পরিশেষে এলাহাবাদের মর্ণিং পোষ্ট নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে স্পষ্টই লিখিত হইল যে, লর্ড ল্যান্সডাউন বিলাতের ষ্টেটসেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে "যদি তিনি মণিপুরের মহারাজ কুলচন্দ্র, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির শাস্তিদানের বিষয়ে অনুমোদন না করেন, তবে লর্ড ল্যান্সডাউন স্বীয় লাট-গিরি চাকরীতে ইস্তফা দিবেন"—ইত্যাদি। সকলেই এই কথায় চমকাইয়া উঠিল। পরে কতকগুলি কাগজে ইহার প্রতিবাদও বাহির হইল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিজে এ বিষয়ের কোন উত্তরই দিলেন না—মর্ণিং পোষ্টের সম্পাদককে ফৌজদারী-সোপিরোদ্দও করিলেন না। আমরা লাট সাহেবের লিখিত ২টি তারের সংবাদ ৩০ ও ৩২ নং দলীলে দিয়াছি

—অন্য গোপনীয় পত্রাদির কথা কিছুই জানি না। (৩০নং সহিত ৩১নং দলীলও দ্রষ্টব্য।)

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রাজনীতির গূঢ় রহস্য।

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—সকল কালের, সকল দেশের এবং সকল জাতিরই রাজনীতির মূলসূত্র—বীজ মন্ত্রই এই। টিকেন্দ্রজিৎ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বিজয়ী ব্যক্তিই (জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায়) মণিপুর-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এখন গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, মণিপুরের রাজ-উত্তরাধিকারীকে মনোনীত করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি—অতএব অপর সকল রাজ্যই, তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হউক) বাধ্য, এ বিষয়ে ভারতগভর্ণমেণ্টের সহিত আমরা একমত। (দলীল ৩৬—৬ দফা) আসল কথা এই যে, প্রবল প্রতাপই জগতে রাজ্যাধিকারের ও প্রধানতার কারণ—এইরূপই ছিল, আছে এবং চিরকালই থাকিবে। "জোর যার মুলুক তার" প্রবাদটি চিরসত্য।

এ পোড়া সংসারে সর্ব্বপ্রধান শক্তির আধার রাজা বা তদনুরূপ ব্যক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রভুত্ব ব্যতীত মানব সমাজ রক্ষা হয় না। অসৎ লোকদিগকে রাজশক্তি শাসন ও দমন না করিলে, জগৎ এক দিনেই জনশূন্য হইয়া যাইত। যিনিই যখন রাজা হন, তিনিই নিজের সাধ্যমত

আধিপত্য বাড়াইয়া থাকেন। আমাদের শাস্ত্রেও ইহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। মুসলমানগণ এ দেশের রাজা প্রজা সকলেরই প্রতি যথাসাধ্য প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্থলাভিসিক্ত হইয়া, অধিকতর প্রবলতা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে মুসলমান অপেক্ষা ইংরাজ অধিকতর কৌশলী ও রাজ্যশাসন-ব্যাপারে নিপুণ। ইংরাজের আমলে এদেশে রেলপথ, ডাকঘর প্রভৃতি বহু বিস্তৃতরূপে স্থাপিত হইয়া সাধারণের সুবিধা বর্দ্ধন করিয়াছে। ভারতবাসীরা মুসলমান-কালাপেক্ষা ইংরাজের অধীনে কোন কোন বিষয়ে মোটের উপর সুখে, স্বচ্ছন্দে আছে। ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষার মহিমায় ও সংবাদপত্রের বহুল প্রচলনে দেশের ভালমন্দ সকল সংবাদ এখন অবাধে ও অবিলম্বে জনসাধারণের জানিত হইতেছে। আবার সুসভ্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টেরই অনুগ্রহেই, রাজনীতির মত জটিল বিষয়ও আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি।

মহা পণ্ডিত চাণক্যের সংগৃহীত নীতিবাক্যানুযায়ী সকল দেশেই রাজনৈতিক কল্পনা-জল্পনা অপ্রকাশ রাখিবার উপদেশ আছে। তদনুসারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যে বিজিত ভারতে রাজ-কার্য্যের অভিপ্রায়াদি মর্ম্মকথা সংগোপনে রাখিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। খাস বিলাতে—নিজের দেশে—নিজের জাতির মধ্যেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

কিন্তু মণিপুরী ব্যাপারে, সেই গূঢ় বিষয়ের অনেক কথা জানিবার ও বুঝিবার আমাদের অভাবনীয় সুবিধা হইয়াছে। পাঠক! দলীলগুলি সমস্ত পরস্পরের সহিত তুলনা ও মিল করিয়া দেখিলেই বিস্তর শিখিবেন। আমরা দুইটি দৃষ্টান্ত দিব মাত্র;—ষ্টেটসেক্রেটারী মিষ্টকথায় লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্য্যের ভ্রম দেখাইয়াছেন

(দলীল ৩৩নং—৫ ও ১৭ দফা) আবার ভারতগভর্ণমেন্ট গ্রিমউড সাহেবের বড়ই দোষারোপ করিয়াছেন এবং স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, গ্রিমউডের দোষেই শূরচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। (দলীল ১৫) অথচ কোন প্রতিকারই হইল না—বরং শূরচন্দ্রই বন্দী হইলেন!

জগতের যে কোন জাতিরই অতীত ইতিহাস বা বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেরই রাজ্যশাসন পদ্ধতি যেন একই নিয়ম হইতে উদ্ভূত। সকল দেশের সকল রাজা বা রাজশক্তির কার্য্য ও ব্যবস্থা যেন একই ছাঁচে ঢালা। রাজনীতিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে, পার্শী খৃষ্টানে কিছু মাত্রও মতভেদ নাই। রাজনীতিক বিষয়ে সকলেই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, পরার্থলোলুপ, কুটিল, লোভী, সন্দিগ্ধ, সাবধানী ও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর। ইহা ভিন্ন রাজ্য চলে না—সম্রাট-শক্তির প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না। ইহা যতই অপ্রিয় বা দুঃখ জনক হউক—অকাট্য সত্য কথা। অতএব এ সম্বন্ধে ইংরাজ জাতি কোন কারণেই বিশেষরূপে নিন্দনীয় নহেন। ইংরাজ হস্তে মণিপুরের এবং মণিপুরী রাজবংশের ও সেখানকার অন্যান্য ব্যক্তির যে দশা ঘটিয়াছে, রাজনীতিক বিচারে তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে। এ কথা যিনি অস্বীকার করিবেন; তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বর্ত্তমান ভারতে যে সকল প্রকৃত হিন্দু ও মুসলমান আছেন, তাঁহাদের আদিপুরুষেরা কোন দেশের লোক? ভাই হিন্দু! তুমি যে আর্য্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দাও—প্রাচীন আর্য্য জ্ঞানের, আর্য্য শক্তির গৌরব কর, সেই আর্য্যজাতি কোথা হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন? জিজ্ঞাসা করি ভাই! তোমাদের মহাগৌরবান্বিত আর্য্যজাতি কোন্ ধর্ম্মের বলে, কোন ন্যায়ের যুক্তিতে ভারতের আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত ও পাহাড়ে জঙ্গলে বিতাড়িত করিয়া, ভারতের সুবিধা-

জনক ও গৌতমীয় সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন? ভাই মুসলমান! তোমাদিগকেও জিজ্ঞাসা করি যে তোমাদিগের আদি-পুরুষেরা কোন দেশের লোক? আসল কথা এই যে, রাজনীতির মূল মন্ত্র—ছল, বল, কৌশল ও বিজয়। ইহা যখন সকলের পক্ষে সমান —তখন তুমি কাহাকে সাধু—আর কাহাকে অসাধু বলিবে?

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মণিপুরের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ২।১টী কথা।

মণিপুরের ইতিহাসের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের যে সকল কথার উল্লেখ বা আভাস আছে তৎ বা তদনুরূপ বিষয় সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কথা লেখা আবশ্যক হইতেছে।

অধিবাসীদের সংখ্যাদি।—

১৮৮১ সালের লোক সংখ্যার কথা আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ১৮৯১ সালেও আর একবার মণিপুর রাজ্যের লোক গণনা করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহে সেই সকল এবং রাজ্য সংক্রান্ত অন্য অন্য বহু মূল্যবান কাগজ পত্র ও দলিলাদি নষ্ট হইয়া যায়। ইংরাজি ১৯০১ সালে আরও এক বার লোক সংখ্যা গণনা করা হয়। তাহাতে নির্ণীত হয় যে সে সময় মণিপুর রাজ্যে ২৮৪৪৬৫ জন লোকের বসতি ছিল। ইহাতে প্রতি অর্দ্ধ বর্গ ক্রোশে ৩৪ জন লোকের বাস বুঝা যায়। ১৮৮১ সালে লোক সংখ্যা ছিল ২২১০৭০। তবেই দেখা যাইতেছে যে ২০ কুড়ি বৎসরে মণিপুর রাজ্যে ৬৩৩৯৫ জন লোক বাড়িয়াছে—অর্থাৎ

প্রতি শতে বৃদ্ধি প্রায় ২৯ জন লোক। কোন জাতীয় লোক আসিয়া এই সময়ের মধ্যে মণিপুর রাজ্যে নূতন বসবাস না করায় নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে এই সময়ের যে এই বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ঘটিয়াছে এবং সাধারণ মণিপুরী প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতার অকাট্য পরিচয় দিতেছে।

উক্ত আদম সুমারী বা লোক গণনায় জানা গিয়াছে যে মণিপুরের অধিবাসীর মধ্যে প্রতি শতে ৬০ জন হিন্দু ৪ জন মুসলমান এবং ৩৬ জন নাগা, কুকী প্রভৃতি আদিম অধিবাসী যাহারা পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাস করে। মণিপুরী প্রজাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৫ জন লোকের ব্যবহারিক ভাষা মণিপুরী এবং প্রতি শতে প্রায় ২১ জন লোক নাগ ভাষায় ও প্রায় ১৪ জন লোক কুকী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। এই সময়ের গণনায় জানা গিয়াছে যে মণিপুর রাজ্যে প্রায় ১৪৩৭৷ খানি গ্রাম আছে। ১৮৮১ সালে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৯৫৪।—অর্থাৎ ২০ বৎসরের মধ্যে ৫০০ শতের ও অধিক নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে

মণিপুর রাজ্যে কুকীর সংখ্যা প্রায় ৪১০০০, নাগা প্রায় ৫৯০০০, মুসলমান প্রায় ৬০০০ এবং হিন্দু অধিবাসীগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রায় ১৬১০০০, অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ—যাহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ১৫৫০০ হইবে—অবশিষ্টেরা নিম্নশ্রেণীভুক্ত জাতি, বর্ণ শঙ্কর ইত্যাদি—ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। নাগাদের মধ্যে তঙ্খেল শ্রেণীই সমধিক জানিত। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২০০০। প্রজা সমষ্টির মধ্যে প্রায় ৬৮০০০ হাজার লোক মণিপুরের রাজধানী খাস ইম্ফাল নগরের বাসিন্দা।

শেষ লোক সংখ্যায় ব্যবসা অনুসারে অধিবাসীগণের শ্রেণী বিভাগের ফল জানা যায় নাই। ১৮৮১ সালে মণিপুর রাজ্যমধ্যে প্রায় ৬০০০ হাজার সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিল। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৯০০০

স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অতি পূর্ব্বকালে মণিপুর উপত্যকাটী সমস্ত একটী প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল এবং কালক্রমে মাটি ও পাথরে তাহা ভরাট হইয়া মণিপুর উপত্যকা গঠিত হইয়াছে। এখন আর একদল লোক বলিতেছেন যে উক্ত বিশ্বাসটী ভুল। অতএব এইরূপ লেখা ও কথা বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে আমরা শতবার সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি।

মণিপুর রাজ্যে নাগা জাতিদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী এমন আছে যাহারা দুরভিগম্য পাহাড় জঙ্গলে বাস করে এবং নিঃসঙ্কোচে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক কথা।—

লোগাটক হ্রদের আয়তন পূর্ব্বে অনেক বড় ছিল, এখন কিন্তু তাহা দীর্ঘে ৪ ক্রোশ ও প্রস্থে ২॥ ক্রোশের বেশী হইবে না। পলি জমিয়া ইহা ক্রমশঃই খর্ব্বাকৃতি হইতেছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ। মণিপুরের এলাকার মধ্যে বিস্তর ক্ষুদ্র ও মধ্যম প্রকারের হ্রদ, প্রস্রবণ ও নদী থাকায় সেখানকার জলবায়ু অতি মনোহর। সে দেশে গ্রীষ্মকালেও কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ হয় না। রাত্রি ও প্রাতঃকালে সম্বৎসরে আনন্দদায়ক শীতলতা অনুভূত হইয়া থাকে।

রাজধানী ইমফাল নগরে সম্বৎসরে প্রায় ৭০ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য লোকের শস্যোৎপাদনে প্রায় কখনই বিঘ্ন ঘটে না। বৎসরের অধিক সময়েই এখানকার হ্রদ ওনদীগুলি প্রায়ই জলপূর্ণ থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য জল রক্ষণ বা পরিচালনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন এ রাজ্যে নাই। পাহাড়ের উপরে গায়ে বা উপত্যকা প্রদেশে যে সকল [illegible] ইক্ষু [illegible] আবাদি জমি [illegible] প্রয়োজন

মত জল সংগ্রহের জন্য চাষীরা ছোট বড় জলপ্রণালী খনন করিয়া থাকে।

মণিপুর উপত্যকাটী সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১২০০ হাত উচ্চ। এবং সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত প্রায় ৬৫০০ হাজার হাত।

বনজ দ্রব্য।—

মণিপুর এলেকার মধ্যে কোন কোন পর্ব্বত গাত্রে স্বাভাবিক চাএর গাছ বিস্তর জন্মিয়া থাকে। তথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া আসাম প্রভৃতি স্থানের চা-করগণকে বিক্রয়ের দ্বারা পূর্ব্বে বিলক্ষণ লভ্যজনক ব্যবসা চলিত। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ অর্থলোভে অপরিপক্ক কীটদষ্ট বা অন্যরূপে অকর্ম্মণ্য বীজ কয়েক বৎসর বিক্রয় করায় মণিপুরী জঙ্গলী চায়ের বীজের পশার প্রায় নষ্ট হইয়াছে। তথাচ এখনও অল্প বীজ বিক্রয় হইয়া থাকে। এ রাজ্যে রবারের গাছ বিস্তর আছে এবং রবার বিক্রয়ের দ্বারা নাগা কুকী প্রভৃতি জাতিরা পূর্ব্বে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিত; কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া নিতান্ত অবিবেচনার সহিত সেই সকল গাছ কাটিয়া অসঙ্গত পরিমাণে রবারের আটা নির্গত করিয়া বিক্রয় করায় এই ব্যবসাও বন্ধ প্রায়। এখন ইংরাজের অধীন আসাম অঞ্চলের জঙ্গল বিভাগ মণিপুর রাজ্যের বন জঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। মণিপুরের জঙ্গলের আয়ের প্রতি শতে ২৫৲ টাকা উক্ত বিভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন আমরা আশা করিতে পারি যে উক্ত বিভাগের রক্ষণাধীন থাকায় মণিপুরী চায়ের বীজ ও রবারের ব্যবসা পুনরায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবে এবং সাধারণ জঙ্গল হইতে রাজ্যের আয় বিস্তর বৃদ্ধি হইবে।

মণিপুরে আর মহারাজা নাই। এখন মণিপুরাধিপতির উপাধি রাজা। ভারতের সম্রাট ইংরাজের অনুগ্রহে শ্রীলশ্রীযুক্ত চূড়াচাঁদ মহাশয় গত ১৯০৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মণিপুরের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় আজমীরে তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রদত্ত সনন্দের সর্ত্ত অনুসারে তিনি যে সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য তাহাতে আর তাঁহাকে কোন মতেই স্বাধীন রাজা বলা যাইতে পারে না। (২১৬ পৃষ্ঠা দেখুন।)

দলীল।

ইংরাজ-সংগ্রহে মণিপুররাজ্য সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায়, তাহা এই অংশে দেওয়া হইল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, সুশৃঙ্খলে শাসন করিবার জন্য, ভারতবর্ষকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এবং দেশীয় স্বাধীন বা মিত্র রাজ্য সমূহকেও, কোন না কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য, এক এক জন শাসনকর্ত্তা আছেন। যে বিভাগের অন্তবর্ত্তী যে স্বাধীন রাজ্য, সেইখানকার শাসনকর্ত্তা, সেই রাজ্যের সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া থাকেন। ইংরাজের ভারত-শাসন-পদ্ধতি এই। এতদনুসারে, মণিপুর এবং সেখানকার পলিটিকেল এজেণ্ট, আসামের চিফ কমিশনারের অধীন বলিয়া গণ্য। মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্টের সহিত, আসামের চিফ কমিশনারের এবং তাঁহার সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের, পরস্পর যে সকল তারসংবাদ ও পত্র লেখালিখি * হইয়াছে, সে সমস্ত এই পরিচ্ছেদে দেওয়া গেল। অধিকন্তু ইহারই মধ্যে, ইংরাজের সহিত মণিপুররাজের সন্ধি এবং অন্যান্য বিষয়, যাহা ভারতগভর্ণমেণ্ট দলীল স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও আছে।

---

* ভারতগভর্ণমেণ্টের ফরেন সেক্রেটারি, মিলিটারি সেক্রেটারি, বা আসামের চিফ কমিশনরের সেক্রেটারি প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিয়া, আমরা কেবল "গভর্ণমেণ্ট" বা "কমিশনর" লিখিলাম। বেসরকারী ও পরোক্ষ লিখিত পত্রাদিরও পার্থক্য রাখিলাম না। এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে, কোন পত্র বা দরখাস্ত প্রভৃতির অবিকল অনুবাদ আমরা করি নাই—আবশ্যকীয় অংশ গুলির যথার্থ তাৎপর্য্য মাত্র সংগ্রহ দিয়াছি।

এতদ্ভিন্ন, ইহাতে, মণিপুর-বিশেষ-আদালতে যুবরাজ কুলচন্দ্র ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির বিচার, তাঁহাদের দরখাস্ত, হাকিম-গণের রায়, বড়লাট-দরবারে ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের লিখিত, যুবরাজ ও সেনাপতির আপিলের মন্তব্য, লাটসাহেবের শেষ হুকুম, বিলাতের ষ্টেট-সেক্রেটারি ও ভারত-গভর্ণমেণ্টের পরস্পর পত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইল। এ সমস্ত অতিশয় কৌতুক-জনক ও শিক্ষাপ্রদ। রাজনৈতিক তত্ত্ব অবগত হইবার পক্ষে, এ সমস্তই পরম সহায়। এগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে ও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে আমরা সকলকে অনুরোধ করি।

[১]

"১৮৩৩ সাল, ১৮ই এপ্রেল।

ভারতবর্ষের ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট, মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহকে, দুইটি পর্ব্বতশ্রেণী অধিকার করিতে দেওয়ায়, এইরূপ সন্ধি হয়।

হিন্দুস্থানের গবর্ণর জেনারেল এবং সুপ্রিম কাউন্সিল এইরূপ বাক্ত করিলেন :—

বরক নামক নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঁকের মধ্যে, কালনাগা এবং কুনজাই নামক দুইটী পর্ব্বত শ্রেণী আছে। মান্যবর কোম্পানীর তাহাতে যে দাবি দাওয়া আছে, তাহা আমরা ত্যাগ করিব এবং এই পর্ব্বত দুইটি রাজাকে দখল করিতে দিব। অধিকন্তু জিরি নদীর পূর্ব্ব তীর এবং বরক নদীর পশ্চিম বাঁক পর্য্যন্ত, তাঁহার রাজ্যের

সীমা বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে, মণিপুর-রাজাকেও সম্মত হইতে হইবে।

১। চন্দ্রপুর হইতে তাঁহার থানা স্থানান্তরিত করিবার কথা, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ জানান হইয়াছে, তদনুসারে তিনি, তাহা অবিলম্বে জিরি নদীর পূর্ব্বধারে স্থাপিত করিবেন।

২। উভয় দেশের মধ্যে, বাঙ্গালী ও মণিপুরী সওদাগরেরা যেরূপ পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে, তিনি তাহা কোনরূপে বন্ধ করিবেন না। তিনি এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন না এবং কোন পণ্য-দ্রব্যই একচেটিয়া করিবেন না।

৩। কালনাগা এবং মুনজাই পর্ব্বতের অধিবাসী নাগারা, আদা, তুলা, মরিচ, এবং তাহাদের দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য, যেরূপ পূর্ব্বাপর কাছাড় প্রদেশে এবং বাঁশকান্দি ও উদ্ধারবন বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে, সে পক্ষে তিনি কোনরূপে ব্যাঘাত জন্মাইবেন না।

৪। জিরি নদীর পূর্ব্ব কিনারা হইতে আরম্ভ করিয়া, কালনাগা এবং কাউপুমের মধ্য দিয়া, মণিপুর উপত্যকা পর্য্যন্ত যে পথ আছে, তাহা বান্ধান হইবার পর, রাজা সেটিকে এইরূপ মেরামত অবস্থায় রাখিবেন, যাহাতে তাহা দিয়া ভারবাহী বলদগণ শীত ও গ্রীষ্মকালে যাতায়াত করিতে পারে। অধিকন্তু রাস্তা তৈয়ারির সময়, যদি তাহা তদারক করিতে ইংরাজকর্ম্মচারী পাঠান হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে তাঁহারা যেরূপ যুক্তি দিবেন, রাজা তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

৫। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত দেশ ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে, যেরূপ ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা বৃদ্ধি হইলে খুব ভালই হইবে; এবং তাহাতে রাজা এবং তাঁহার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে। অতএব যাহাতে এই সুফল শীঘ্র ফলিতে পারে, তজ্জন্য

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহিলে, রাজা, রাস্তা তৈয়ারির কতক সাহায্য করিতে, নাগা কুলি দিবেন।

৬। ব্রহ্মবাসীদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, দেশরক্ষা অথবা নিংথি অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য, যদি মণিপুরে সৈন্য পাঠান হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহিলে, সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র ও আস্‌বাবপত্র যাইবার জন্য, রাজা, পাহাড়ী মুটে দিবেন।

৭। ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্ব্বাংশে কোন দুর্ঘটনা হইলে, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহেন, তবে মণিপুররাজ, তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশের দ্বারা সাহায্য করিবেন।

৮। তাঁহার কার্য্যের জন্য, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সকল যুদ্ধ-সামগ্রী দিবেন, তাহার জবাবদিহি, রাজাকে করিতে হইবে। এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের গোচরার্থে যাহা খরচ হয়, তাহার বিস্তারিত তালিকা মাসে মাসে মণিপুর-সৈন্য-সংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ কর্ম্মচারীকে তিনি দিবেন।

(মণিপুর সৈন্যের সহিত, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সংশ্রব অনেক দিন ঘুচিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট, এখন আর মণিপুরের সৈন্যগণকে, কোন সামরিক দ্রব্যই সরবরাহ করেন না। সুতরাং বর্ত্তমান কালে, এই সর্ত্তটির সার্থকতা নাই।)

আমার সমক্ষে দস্তখত ও মোহর।

(স্বাক্ষর) এফ, জে, গ্রাণ্ট কমিশনর।

মোহর।

সুপ্রিম কৌন্সিলের প্রেরিত এই কাগজে যাহা লেখা আছে, সে সমস্ত নিয়মেই আমি, মণিপুরের গম্ভীর সিংহ, সম্মত হইলাম।

(যথার্থ অনুবাদ।)

(স্বাক্ষর) জি, গর্ডন, লেপ্টেনেন্ট, ১৮ই এপ্রেল, ১৮৩২ সাল।
গম্ভীর সিংহের সাহায্যকারী সৈন্যদলের এড্‌জুটেণ্ট।"

[২]

"কুবো উপত্যকার জন্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ে মণিপুর-রাজের নিকট ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অঙ্গীকার।"

মহামান্য সকাউন্সিল গভর্ণরজেনারেলের আদেশানুসারে, আমরা (মেজর গ্রাণ্ট এবং কাপ্তেন পেম্বার্টন্) আভা-রাজ-দরবার হইতে প্রেরিত ও ভারপ্রাপ্ত ব্রহ্মকমিশনারদিগকে কুবো উপত্যকা অর্পণ করিয়াছি। এবং নিম্নলিখিত রূপ অঙ্গীকার করিবার ক্ষমতা উক্ত গভর্ণরজেনারেল বাহাদুর আমাদিগকে দিয়াছেন ;—

১। সন ১৮৩৪ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে কুবো উপত্যকা, (ব্রিটিশ ও ব্রহ্মকমিশনারদের পরস্পর দস্তখতযুক্ত নিয়ম-পত্র অনুসারে) হস্তান্তরিত হইয়াছে। সেই তারিখ হইতে সুপ্রিম গভর্ণমেণ্ট মণিপুররাজাকে সিক্কা পাঁচশত টাকা মাসিক বৃত্তি দিতে ইচ্ছুক আছেন।

২। ইহা স্থির রহিল যে, কোনরূপ ভবিষ্যৎ ঘটনা পরম্পরায়, যদি আপাততঃ-হস্তান্তরিত ভূখণ্ড, পুনরায় মণিপুর-অধিকারভুক্ত হয়, তবে সেইরূপ হইবার তারিখ হইতে, এই অঙ্গীকৃত বৃত্তি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিতে পারিবেন।

লাংথোবাল, মণিপুর।
জানুয়ারি ২৫শে, ১৮৩৪ সাল।

(স্বাক্ষর) এফ, জে, গ্রাণ্ট, মেজর,
(,,) আর বইলো পেম্বরটন, কাপ্তেন,
কমিশনারগণ।"

[৩]

পত্র—ভারত-গভর্ণমেণ্ট হইতে—বিলাতের ষ্টেট-সেক্রেটারিকে।

(সে সময় লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। নীচের লিখিত পত্রাংশ, ইনি বিলাতে ভারত-সেক্রেটারির নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহা এবং তদুত্তরে সেক্রেটারি মহোদয় যাহা লিখেন, সেটিকেও মণিপুর কাণ্ডে, গভর্ণমেণ্ট দলীল স্বরূপ গণনা করিয়াছেন।)

পত্র (কিয়দংশ)—নং ১৯৭ আই ১৫ই জানুয়ারি, ১৮৮৪ সাল।

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে—মধ্য ভারতে চিফ কমিশনারকে—

"আপনি লিখিয়াছেন যে, সম্ভব হইলে, প্রত্যেক রাজার অভিষেক, একজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর দ্বারা হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল আপনার সহিত একমত। ইহা কার্য্যে পরিণত করা, সকল সময়ে সুবিধাজনক না হইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ, যে পর্য্যন্ত না দেশীয় রাজ্য মাত্রেরই উত্তরাধিকারিত্ব, কোন না কোন রূপে মঞ্জুর করেন, সে পর্য্যন্ত তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। অতএব বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটিয়াছে, সেইরূপ দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ কর্ত্তৃক, গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত, রাজ্যাভিষেক ও তদানুষঙ্গিক অনুষ্ঠান সকল, কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। ফলতঃ সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এ সকল বিষয়ে, রাজপরিবারের ও রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা এ কার্য্য করিব।

[৪]

পত্র (কিয়দংশ)—নং ১৯ (রাজনৈতিক), ইণ্ডিয়া অফিস, লণ্ডন।

১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮৪ সাল। ষ্টেট-সেক্রেটারি হইতে—
ভারত-গভর্ণমেণ্টকে।

"আপনার সন ১৮৮৪ সালের, ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের, ১৬ নং পত্র এবং তৎসহ প্রেরিত অন্যান্য সমস্ত কাগজ পাইয়াছি।" (অন্যান্য কাগজের মধ্যে উপরের পত্র খানিও ছিল।) * * এ বিষয়ে আপনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।

---

[৫]

এচিসন সাহেব একজন ইংরাজ। তাঁহার সঙ্কলিত, ট্রিটিজ নামক পুস্তকের নিম্নলিখিত অংশও গভর্ণমেণ্ট দলীলরূপে গণ্য করিয়াছেন।

"(মণিপুরের রাজা) চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা, বারম্বার হইতে লাগিল, তাহাতে দেশের শান্তি নষ্ট ও ব্রিটিশ প্রভুত্ব হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হইল। এজন্য গভর্ণমেণ্ট, চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহকে (মণিপুর সিংহাসনে) স্থায়ী রাখিতে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিমাত্রকেই শাস্তি দিতে, বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং এই দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন।"

(১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা।)

[৬]

তারের সংবাদ—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সাল।

আসামের চিফ কমিশনর (শিলচর) হইতে—ভারত-গভর্ণমেণ্টকে (সিমলাতে।)

"মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্টের নিকট হইতে, অদ্য প্রাতে এই সকল তার সংবাদ পাইয়াছি।

"মহারাজার (শূরচন্দ্রের) ভ্রাতাগণ, রাত্রে রাজবাড়ী আক্রমণ করায়, মহারাজা রেসিডেন্সিতে পলাইয়া আসিয়াছেন। এখানে আক্রমণ করিলে, যতক্ষণ সাধ্য, তাঁহাকে রক্ষা করিব। সেনাপতি (টিকেন্দ্রজিৎ) এবং দুই ভ্রাতা, রাজবাটী অধিকার করিয়াছেন। যুবরাজ এবং তিন ভ্রাতা, মহারাজের সহিত রেসিডেন্সিতে আছেন। অন্য লোকজন বাদে কেবল ৬৫ জন বন্দুকধারী সৈন্য আমার নিকট আছে। কি করিব উপদেশ দিবেন। আপাততঃ রেসিডেন্সি আক্রমণের আশঙ্কা করিবেন না। মহারাজা এবং তাঁহার ভ্রাতারা লোক সংগ্রহ করিয়া, সেনাপতিকে আক্রমণের চেষ্টায় আছেন। মহারাজা পলাইয়া আসায়, কোন লোকের প্রাণহানি হয় নাই।

"আমি এখানকার সৈন্যগণের অধিনায়কের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়াছি যে, আবশ্যক হইলে, কোহিমা হইতে একদল সৈন্য পাঠান হইবে এবং পলিটিকেল এজেন্টকে নিম্নলিখিত মত উত্তর দিয়াছি ঃ—

"আপনার তারের সংবাদ পাইলাম। রেসিডেন্সি রক্ষা করিবেন। উভয় দলের মধ্যে আপোস করিবার চেষ্টা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে, সৈন্য পাঠাইবার জন্য কোহিমায় তারে সংবাদ দিবেন। সেখানকার সেনানায়ককে, আপনার নিকট দুই শত

বন্দুকধারী পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। আত্মরক্ষা করিবেন, কিন্তু বিশেষ কারণ না দেখাইয়া এবং আমার আদেশ না লইয়া, অগ্রে কোনরূপ বৈরিতাচরণ করিবেন না।”

[৭]

পত্র—২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০।

মহারাজ শূরচন্দ্র—মণিপুর রেসিডেন্সি হইতে—
সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে (মণিপুর রাজবাটীতে ।
শকাব্দা ১৮১২, ভাদ্র, শুক্ল ৯ই, মঙ্গলবার।

“আমি এতদ্দ্বারা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেনাপতি চন্দ্রজিৎকে সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার । আমার নাই। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, একবার বৃন্দাবন যাইতে আমি নিতান্ত ইচ্ছুক। কিন্তু পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া, হাঁটিয়া এ দেশ পার হইতে এবং সেখানে যাইতে আমি অক্ষম। অতএব ভাই! তুমি আমার (তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্ত, অনুগ্রহ পূর্ব্বক করিয়া দাও। পাকাসেনা, তোমার সহিত বিস্তর কুব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মহারাজা আমাদের পরমারাধ্য-পিতৃদেবের নাম স্মরণ করিয়া তুমি তাহাকে মার্জ্জনা করিবে। তুমি যে ইহা করিবে, এ কথা শুনিতে, আমি নিতান্ত উৎসুক রহিলাম।”

[৮]

পত্র (অবিকল) ২৩শে সেপ্টেম্বর, সন ১৮৯০।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ হইতে—মহারাজা শূরচন্দ্রকে—
(মণিপুর রেসিডেন্সিতে।)

"মহামহিম মহিমাসাগরবর শ্রীযুক্ত শ্রীপঞ্চযুক্ত মণিপুরেশ্বর মহারাজা প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

শ্রীলশ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ মহারাজের চরণে কোটি দণ্ডবৎ পূর্ব্বক মিনতি করিয়া প্রার্থনা এই, শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ মহারাজের প্রেরিত নবমীর কৃপাপত্র প্রাপ্তে, রাজ-আজ্ঞা আদেশ সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। শ্রীযুক্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতার রাজ আজ্ঞা অনুসারে, শ্রীধাম ব্রজ নির্ব্বিঘ্নে পৌছিবার চেষ্টিত হইব। অধীনেরা শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে যাহা অপরাধ করি, তাহা মার্জ্জনা করিবেন। এইবারকার ঘটনাটী বিপরীত অসম্ভব বলিতে হয়।"

[৯]

তারের সংবাদ—২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সাল।

আসাম চিফ কমিশনার (বদরপুর) হইতে—ভারত-গভর্ণমেণ্টকে (সিমলাতে।)

"আপনার ২২শে তারিখের ১১৯৪নং পাইয়াছি *। পলিটিকেল এজেণ্ট এইরূপ তার-সংবাদ দিয়াছেন—'মহারাজা, যুবরাজকে (কুলচন্দ্রকে) রাজা হইতে অনুমতি দিয়া, সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন;

* ইহা যে কি তাহা প্রকাশ নাই।

এবং বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবন যাইবেন। ইহা তাঁহার নিজের ইচ্ছা। রেসিডেন্সিতে থাকিলে, কোন ভয় নাই—আমি তাঁহার জীবনের জন্য দায়ী থাকিতে পারি—একথা বলিয়াছি। কিন্তু রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণের মধ্যে, অস্ত্রধারী লোক জন একত্র করিতে, আমি তাঁহাকে দিই নাই। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, একবার রাজ্য ত্যাগ করিলে, তিনি আর মণিপুর বা কাছাড়ে আসিতে পাইবেন না। কিন্তু তিনি স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না। মহারাজার পথখরচ দিতে ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে সেনাপতি সম্মত। ইহাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। যুবরাজ কোন দলেই যোগ দেন নাই। আপনি অনুমোদন করিলে, তাঁহাকেই মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। অদ্য রাত্রেই মহারাজা রওনা হইবেন। তাঁহার সহিত ৪১ জন বন্দুকধারী দিব। পাক্কাসেনাকেও একত্রে যাইবার জন্য জেদ করিতেছি। তিনিই এই সমস্ত গোলযোগের মূল।”

আমি এইরূপ উত্তর দিয়াছি ঃ—‘আপনার গত কল্যের তার-সংবাদ পাইয়াছি। গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি না পাওয়া পর্য্যন্ত, যুবরাজকে রাজ অছি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তান্ত লিখিবেন এবং মহারাজা ও পাক্কাসেনা রওনা হইলেন কিনা সংবাদ দিবেন।”

---

[১০]

পত্র (কিয়দংশ)—নং২৮৮—২৫শে সেপ্টেম্বর, সন ১৮৯০ সাল।

মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট হইতে—আসামের চিফ কমি-শনারকে। (এই পত্রে গ্রিমউড সাহেব, রাজ-বিপ্লবের বৃত্তান্ত কিরূপ দিয়াছেন দেখুন।)

"দিবা আলোক প্রকাশ হইবামাত্রই, আমি জানিতে পারিলাম যে, সেনাপতি, দোলরাইহানজাবা ও জিল্লাসিংহ রাজবাড়ীতে আছেন এবং চারিটি পাহাড়ী কামান ও বারুদাগার দখল করিয়াছেন। যুবরাজ (কুলচন্দ্র) ঘর ছাড়িয়া, কাছাড়ের রাস্তার দিকে চলিয়া গিয়াছেন; দরবারের মন্ত্রীদের মধ্যে, কেবল আয়াপারেল সেনাপতির সহিত আছেন। থঙ্গাল জেনারেল, তাঁহার পুত্রগণের সহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলে রেসিডেন্সিতে আসিয়াছিলেন।

পর দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে, মহারাজা আমাকে বলিলেন যে, তিনি বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিতে এবং সেই খানেই বসবাস করিতে, দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে এবং তাঁহাকে যেন হাজারিবাগ পাঠান না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে, বহু মিনতির সহিত বলিলেন। আমার বোধ হয়, বড় চৌবার * বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি হাজারিবাগের কথা তুলিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যদি তিনি যথার্থই বৃন্দাবন যাইবার মত স্থির করিয়া থাকেন, তবে আমি সে পক্ষে সকল সুব্যবস্থা করিয়া

* ইতিহাসের মধ্যে পাঠক বড় চৌবার কথা জানিতে পারিবেন।

দিব। কিন্তু তিনি একবার গেলে, এ জীবনে আর কখনও মণিপুর, কাছাড় বা সিলেটে আসিতে পাইবেন না, একথা বিশেষরূপে বুঝাইলাম। আমি ইহাও বলিলাম যে, পাকাসেনাকেও অবশ্যই যাইতে হইবে; অপর সকলে ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত যাইতে বা মণিপুরে থাকিতে পারেন। মহারাজা, তৎপরে যুবরাজকে রাজ্য দিবার কথা, সেনাপতিকে লিখিলেন। আমি যখন রাজবাটীতে গেলাম, তখন মহারাজার ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতারা অত্যন্ত খুসি হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইল। সেনাপতি, মহারাজ এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের কাছাড় পর্য্যন্ত যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এবং যাহারা মণিপুরে থাকিবে, তাহাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। যুবরাজ তখন কাছাড়ের পথে প্রায় ৮ মাইল দূরে ছিলেন, এইরূপ জানা গিয়াছিল। ‡ সেনাপতি তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইবেন, একথাও বলিলেন। যুবরাজ, ইহার দুই তিন ঘণ্টা পরে, আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

মহারাজের দেশত্যাগের কথা রাষ্ট্র হইবামাত্রই, বহু সংখ্যক মণিপুরী তাঁহাকে দেখিবার জন্য, রেসিডেন্সিতে আসিল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে কম বা বেশী টাকা নজর দিল। সকলে যেরূপ কান্দিতে লাগিল, তাহা দেখিলেই মনে হয় যে, মহারাজা লোক-প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার বিদায়ে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭।।০ টার সময়, মহারাজা এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ এখান

‡ যুবরাজ সম্বন্ধে, পলিটিকেল এজেন্টের কথায় মিল নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত ২২শে সেপ্টেম্বরের তার সংবাদ দেখুন।

হইতে রওনা হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কাছাড় পর্য্যন্ত যাইবার জন্য, আমি ৪৪ নং গুর্খা পদাতিক দলের ৩৫ জন বন্দুকধারী দিয়াছি। মহারাজের ত্বরায় এখান হইতে বিদায় হওয়া, খুব ভালই হইয়াছে। রেসিডেন্সিতে তাঁহার থাকা নিতান্ত অসাজন্ত হইয়াছিল। (এ স্থান অপবিত্র বলিয়া) তিনি এখানে কিছুই খাইতেন না। নিকটে যে সকল মণিপুরীদের ঘর আছে, তাহাতেও যাইতে তাঁহার সাহস হইত না। আমি অল্পক্ষণের জন্যও বাড়ীর বাহির হইলে, তিনি অত্যন্ত ভীত হইতেন এবং আমাকে কোথাও না যাইতে অনুনয়-বিনয় করিতেন। তাঁহার এখানে থাকাতে, আমার আনুসঙ্গীক সমস্ত লোকের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। অধিকন্তু তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, ততক্ষণ দুর্ঘটনা এবং লোকের মন বিচলিত হইবার আশঙ্কা, সর্ব্বদাই ছিল। তজ্জন্য আমি অনুমতির অপেক্ষায় কালক্ষেপ না করিয়া, নিজ দায়িত্বে, মহারাজাকে বিদায় দিয়াছি। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মণি-পুরের রাজপরিবর্ত্তন অনেকবার ঘটিয়াছে—এইবারেও সেইরূপ ঘটিল। সৌভাগ্যক্রমে এবার আদৌ রক্তপাত হয় নাই। * * * *

: কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা মহারাজা করেন নাই। কিন্তু দোলারাইহানজাবা * এবং জিল্লাসিংহ বলেন যে, তাঁহাদিগকে দেশান্তরিত করা বা অন্যরূপে শাস্তি দেওয়া হইবে এই আশঙ্কায়, তাঁহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন। মৈ সংযোগে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, জিল্লা সিংহ, মহারাজের খাস মহল হঠাৎ আক্রমণ করেন। অবিরত বন্দুক ও গুলি চলিতে থাকে। তাহাতে কেহ আঘাত প্রাপ্ত না হইলেও, প্রাণ ভয়ে মহারাজা সত্বর পলায়ন করেন। তৎপরে

* পাল্কী, ডুলী, তাঞ্জাম প্রভৃতি তত্ত্বাবধায়ক—কুমার অঙ্গেয় সিংহ।

সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, সকল দ্রব্য অধিকার করিলেন এবং আক্রমণ নিবারণের সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন।”

---

[১১]

পত্রের সারাংশ—১৩ই নবেম্বর—১৮৯০ সাল।

কর্ণেল, সার জেম্‌স, জনষ্টোন (কে, সি, এস, আই,) হইতে—
কর্ণেল জে, সি, আরড্যাগ (সি, বি, আর, ই,) কে।

জনষ্টোন সাহেব গ্রিমউডের পূর্ব্বে, মণিপুরের রাজ্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার নিম্নাংশ, গভর্ণমেণ্ট দলীল স্বরূপ গণ্য করিয়াছেন।

“টাইম্‌শ সংবাদপত্রে, অসম্পূর্ণ তারের সংবাদ ব্যতীত, (মণি-পুর) রাজবিপ্লবের কোন কথাই আমি শুনি নাই। কিন্তু আমি কখনই সন্দেহ করি নাই যে, মহারাজার চতুর্থ পুত্র, বিখ্যাত কু-স্বভাব কইরংই ইহার মুল। শূরচন্দ্র যে পুনরায় রাজ্য পাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন, সে বিষয়েও আমার মনে কখন দ্বিধা ছিল না। আমার বিশ্বাস যে, সন্ত্রাসিত করিয়া, তাঁহাকে দেশত্যাগী করা হইয়াছে। এখন তিনি, তাঁহার প্রভুত্ব রক্ষা বিষয়ে, আমাদের পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত সাহায্য পাইবার দাবি করিতেছেন।”

---

[১২]

পত্র—১৪ই নবেম্বর, ১৮৯০ সাল।

মণিপুরের মহারাজ শূরচন্দ্র সিংহ হইতে—আসামের
চিফ কমিশনারকে।

* * “ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ পলিটিকেল এজেণ্ট,

আমার রাজধানীতে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। যদিও আমি রাজ্যের অধীশ্বর ছিলাম, তথাচ আমার আপদ বিপদে, গভর্ণমেণ্ট আমাকে রক্ষা করিবেঁন ও আশ্রয় দিবেন এ ধারণা আমার মনে সর্ব্বদাই ছিল। ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আমার পিতার প্রভুত্ব রক্ষার সহায়তা—এবং কেহ তাঁহার অধিকারের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান—করিবেন। আমার নিজের পক্ষেও যে সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে, আমার তাহাই দৃঢ় সাহস ছিল। আমি মূহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই যে, আবশ্যক ঘটিলে, গভর্ণমেণ্ট উক্ত শুভজনক রাজনীতির ফল হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন। আমার সময়েই গভর্ণমেণ্ট দুইবার (অর্থাৎ বড় চৌবা এবং যোগেন্দ্র সিংহ বিদ্রোহী হইলে) বলপ্রয়োগ করিয়া, মণিপুরের শান্তি রক্ষা করিয়াছেন। মণিপুরের সেরূপ শান্তি-ভঙ্গের চেষ্টা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য ভাব প্রদর্শন করা হয়, ইহা নিশ্চয়। তাহা যে গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন, আমি কখনও ভাবি নাই।"

[১৩]

পত্র—নং ৩৫১ সি, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯০ সাল।

মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট মিঃ গ্রিমউড সাহেব হইতে— আসামের চিফ কমিশনারকে।

"মহারাজা লোকের অপ্রিয় ছিলেন না। স্বভাবতঃই কতকগুলি লোক তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু সাধারণ লোক তাঁহার বিষয়ে

অধিক আগ্রহবান নহে। পাকাসেনাকে কেহই কিছুমাত্র পছন্দ করিত না। * *

যদিও মহারাজা মণিপুরে ফিরিয়া আসেন, তথাচ আমার বিশ্বাস যে, পুনরায় রাজসিংহাসন পাইবার কোন সম্ভাবনাই তাঁহার নাই। তবে, ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্য করিলে স্বতন্ত্র কথা। আমি মহারাজকে ফিরিতে কখনই পরামর্শ দিই না। কিন্তু যদি তিনি একান্তই এখানে আসেন, তবে বিরুদ্ধাচারী সকলকে ত্রাসিত ও শাসিত রাখিবার জন্য প্রচুর ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সঙ্গে থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রেও আমার মনে হয় যে, যুবরাজ (কুলচন্দ্র) ও সেনাপতি (টিকেন্দ্রজিৎ) আত্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবেন। অতীত ব্যাপার সকল যেরূপ ঘটিয়াছে, তাহাতে আট ভ্রাতা এখানে আর কখনও সুখে ও সদ্ভাবে থাকিতে পারিবেন না ; কাজেই মহারাজের প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপিত হইলে যুব-রাজ ও সেনাপতিকে ভারতবর্ষে+নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। তাঁহারাও ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। * * রাজবাটীর দক্ষিণদিকে বারুদ-খানাটি (ম্যাগেজিন) আক্রমণ নিবারণোপযোগী উৎকৃষ্ট আড্ডা। যদি সেইটিকে সহসা হস্তগত করিয়া আয়ত্তাধীনে রাখা হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমার অধীনস্থ লোকেরা বিশেষ কষ্ট ব্যতীতও প্রাতঃকালে রাজবাটী পুনরধিকার করিতে পারিত। কিন্তু যখন সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতারা যাবতীয় কামান ও যুদ্ধ-সামগ্রী দখল করিয়া বসিয়া-ছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদ আক্রমণের জন্য ৮৫ জন গুর্খা সৈন্য পাঠাইলে

+বোধ হয় ব্রিটিশ ভারত অভিপ্রেত। এই পত্রে এবং মণিপুর সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজে অনেক স্থলে এইরূপ লেখা হইয়াছে, যেন মণিপুর ও ভারতবর্ষ দুইটি স্বতন্ত্র দেশ। কেন এইরূপ হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝি না। পাঠক অবশ্যই জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে মণিপুর একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র।

নিতান্তই বাতুলতার কার্য্য হইত মাত্র। আমি জানিতাম যে, আমাদের (ব্রিটিশ) সৈন্যগণ কহিমা হইতে আসিবে। আমি তাই মহারাজাকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি কহিমা যাইলে ভাল হয়—পথে সৈন্যগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। কিন্তু মহারাজের যে জীবনাশঙ্কা কিছুমাত্র আছে, এমন কথা আমি তাঁহাকে বলি নাই। সেনাপতির রেসিডেন্সি আক্রমণ না করাই সম্ভব, আমি ইহাই ভাবিয়াছিলাম এবং আমি বরাবর মহারাজাকে বলিয়াছিলাম যে, রেসিডেন্সিতে তাঁহার বিপদাশঙ্কা কিছুমাত্রই নাই। আমার নিকট কেবল মাত্র ৮৫ জন বন্দুকধারী সৈন্য ছিল। সেই সৈন্য লইয়া আমি সেনাপতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হই নাই, সেই জন্য যেন আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতেও অসম্মত ছিলাম—মহারাজের পত্রের ভাব এইরূপ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম। * * *

সেইরূপ করা অধিকতর সম্মান-সূচক বলিয়া আমার ধারণা ছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সেই সকল নিয়মে সেনাপতিকে সম্মত করিতে পারিব। আমি বিলক্ষণ জানি যে, মহারাজাও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমি সেই কথা বলিবার পরেই তিন জন মন্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গম্ভীর ভাবে আমার হস্তামর্ষণ করিলেন। তাঁহারা আমার কথায় সম্পূর্ণ মত দিলেন বটে, কিন্তু মহারাজ বলিলেন "না"!

সন্ন্যাসী হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি করিয়াছিলেন। পরিশেষে আমি তাঁহাকে পরদিন প্রাতঃকাল (অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর) পর্য্যন্ত ভাবিয়া, তবে শেষ মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিলাম। তথাচ তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। যে পত্রখানির নকল ইহার সহিত দেওয়া হইল, তাহা মণিপুর দরবার আমাকে পাঠাইয়াছিলেন।

মহারাজ ২৩শে প্রাতে সেনাপতিকে শুদ্ধ সেইরূপ পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু রাজপরিচ্ছদ (যাহা তাঁহার পরিধানে ছিল) এবং রাজ-তরবারিও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আপনার পত্রের তৃতীয় প্যারেগ্রাফে যে পত্রের নকল চাহিয়াছেন, তাহা এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম। মহারাজ শূরচন্দ্রের আসল পত্র যাহা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সেখানিও ফেরত দিলাম।"

---

[১৪]

পত্র—নং ৫২০ পি, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯০ সাল।

আসামের চিফকমিশনার (শিলং) হইতে গভর্ণমেণ্টকে।

"অধিকন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান ঘটনাগুলি কোন প্রজাবিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণ, অথবা শত্রুভাবাপন্ন রাজগণের উন্নতি বা অবনতির ফল নহে। সে সমস্তই একজন (নাম মাত্র) রাজার ভ্রাতৃবিরোধ হইতে উৎপন্ন। * * *

এইরূপে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এবং দেশ ছাড়িয়া গিয়া মহারাজা তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পূর্ব্বকৃত কার্য্য অস্বীকার করিয়া মণিপুর-সিংহাসন পুনর্ব্বার অধিকার করিতে প্রয়াসী। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাকে ব্রিটিশ সৈন্য-সাহায্যে গদির উপর স্থাপিত না রাখেন, তবে আমার বিবেচনায়, মহারাজের প্রস্তাবে মত দেওয়া যাইতে পারে না।"

---

[১৫]

পত্র—নং ২০৩ ই, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯১ সাল।

গভর্ণমেণ্ট হইতে আসামের চিফকমিশনারকে।

"আপনি যখন কহিমা হইতে সৈন্য সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া, উভয় দলের মধ্যস্থতা করিতে মিষ্টার গ্রিমউডকে তার যোগে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন রাজবাটীতে সেনাপতির নিকট গিয়া, বিভ্রাটের কারণ জানিয়া, আপনাকে সংবাদ দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রকাশ হইত যে, মহারাজা সম্পূর্ণরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছেন। এবং পলিটিকেল এজেণ্ট মহারাজার পলায়নে সম্মতি দিয়া ও সেনাপতি (টিকেন্দ্রজিতের) বিদ্রোহের সফলতা স্বীকার করিয়া যে গুরুতর কার্য্য করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাকে সেরূপ করিতে হইত না। সে ক্ষেত্রে সেনাপতিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার সহিত আমরা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে পারিতাম।"

---

[১৬]

পত্র—৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল।

আসামের চিফ-কমিশনার হইতে—ভারত গভর্ণমেণ্টকে।

"মহারাজকে (শূরচন্দ্রকে) পুনঃস্থাপনের বিষয়—ন্যায় বিচারের মূল সূত্রানুসারে এরূপ করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। আমি নিশ্চয়ই জানি যে, মণিপুরের সুশাসন পক্ষে তাহা ফলদায়ক হইবে না। * * * * পুনরায় দেখুন যে, মহারাজের স্বভাব ও পূর্ব্ব কার্য্যাবলীর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহাতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি পুনরায় রাজপদে প্রতি-

ষ্ঠিত হইলে, মণিপুর রাজ্যে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইবে * * * *
মহারাজের প্রত্যাগমনের বিষয়, গভর্ণমেণ্ট পুনরালোচনা করিতে ইচ্ছুক ভাবিয়া, আমি স্বয়ং পর মাসে একবার মণিপুর পরিদর্শনে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মতামত জানিতে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক আছেন, আমার এই বিবেচনা যদি ঠিক হয়, তবে আমি দৃঢ়রূপে তদ্বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছি।"

---

[১৭]

পত্র—১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল।

আসামের চিফ-কমিশনার মিঃ কুইণ্টন হইতে—পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটরীকে। এই চিঠিখানি বেসরকারী—তথাচ ইহাকেও গভর্ণমেণ্ট দলীল স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

"* * এই দুইটির মধ্যে, প্রথমটি সম্বন্ধে—মহারাজের রাজ্যাভিষেকের পর হইতে তাঁহার স্বভাবের দুর্ব্বলতার যেরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিবেচনায়, তাঁহাকে পুনঃস্থাপনের বিরুদ্ধে, আমার মনে যে সকল কারণের উদয় হইয়াছে, সে সমস্তের উল্লেখ আমি ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে করিয়াছি।

* * আমাদের হস্তক্ষেপ করাও সর্ব্বদা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। উল্লিখিত মানসিক তেজ-হীনতার ফলে, মহারাজ, তাঁহার দায়িত্ব-বিহীন পারিষদ মণ্ডলীর হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হইবেন। মণিপুরাধিপতি এখন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, বরং আমাদের এক দিন চুপ করিয়া থাকা চলিতে পারে; কিন্তু আমাদের কর্ত্তৃক স্থাপিত ও রক্ষিত রাজাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে দিতে পলিটিকেল এজেণ্ট

পারিবেন না। [illegible]তে আমার বিশ্বাস যে, অন্তঃশাসনে আমাদের সর্ব্বদা হস্তক্ষেপ করা ব্যতীত, সুশাসন লাভ হইবে না।

* * মহারাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার চেষ্টা ইতিপূর্ব্বেও অনেক বার হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে, বড় চৌবা দুই বার বিদ্রোহী হইয়াছিল। তখন একজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর অধীনে, কাছাড় সীমান্ত পুলিশ কর্ত্তৃক তাহা সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়। ১৮৮৭ সালে, ওয়াংখাইরকপা মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মহারাজের খাস মহলের দিকে সবেগে অগ্রসর হইবার সময়, গুলির আঘাতে মস্তক ভেদ হওয়ায়, তাহার মৃত্যু ঘটে। আবার কতকগুলি নির্ব্বাসিত মণিপুরীর অধিনায়ক হইয়া, যোগীন্দ্র সিংহও, এই বৎসর, মহারাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তন্নিবারণার্থ কাছাড়ের সামরিক পুলিস ও মণিপুর হইতে ব্রিটিশ সৈন্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।"

---

[১৮]

পত্র—নং৩৬০ ই, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট হইতে—আসামের চিফকমিশনারকে।

"পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে আমি যেরূপ বলিয়াছি, তদনুরূপ, সকাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছা যে, সেনাপতিকে মণিপুর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, তাঁহার অন্যায় ব্যবহারের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। আমি জানিতে চাহি যে, আপনি তাঁহাকে কোথায় নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন? একটি গুরুতর কথা এই যে, সেনাপতি মণিপুরী সৈন্যদের কর্ত্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে, বলপূর্ব্বক আপনার বিরুদ্ধাচারী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন। যাহাতে তিনি এরূপে কোন হাঙ্গামা বাধাই-

যার সুবিধা না পান, অথচ তাঁহাকে নির্ব্বাসিতও করা হয়, তৎপক্ষে সুযুক্তি কি ?

ভারত-গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা যে, আপনি স্বয়ং মণিপুরে উপস্থিত হইয়া, আমাদের অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ্যরূপে জানান। কোনরূপ প্রতিরোধের আশঙ্কা না থাকিলেও আপনি প্রচুর সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাইবেন। বর্ত্তমান যুবরাজকে (রাজ-অছিকে) মহারাজা বলিয়া আমাদের স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি কি সর্ত্ত করিয়া লইতে চাহেন. গভর্ণমেণ্টের গোচরার্থে তাহা লিখিবেন।"

---

[১৯]

পত্র—২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল।

চিফকমিশনার হইতে—গভর্ণমেণ্টকে।

"গভর্ণমেণ্টের যে মীমাংসার কথা জানাইতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে আমি মণিপুর যাইতেছি, তাহা এখন অপ্রকাশ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনতিবিলম্বে কি ঘটিবে, তাহা জানিবার জন্য এত অধিক লোক আগ্রহান্বিত আছে যে, আমি মণিপুরে তারে সংবাদ দিলে বা পত্র লিখিলে, গুপ্ত রহস্যের প্রকাশ নিবারণ অসম্ভব হইবে। সেখানকার পলিটিকেল এজেণ্টের সঙ্কেত-সাট-বহি * নাই।"

---

* রাজকীয় গুপ্তকথা প্রকাশ পাইবার ভয়ে সভ্য দেশ মাত্রেরি মন্ত্রীমণ্ডলীতে বিশেষতঃ পররাষ্ট্র-বিভাগে সাঙ্কেতিক চিহ্ন যোগে পত্র ও তারের সংবাদ প্রেরিত হয়।

[২০]

তার-সংবাদ—১৮ই মার্চ্চ, ১৮৯১ সাল।

আসামের চিফ-কমিশনার (ক্যাম্প টৈকরং) হইতে—

কলিকাতা ভারত-গভর্ণমেণ্টকে।

"আপনার গত মাসের, ২১শে তারিখের, ৩৬০ ই নং পত্র পাইয়াছি। আমি ২২শে তারিখের বে-সরকারি পত্রে লিখিত-মত রক্ষক সঙ্গে লইয়া, মণিপুর যাইব। সেখানে রবিবার পৌঁছিবার কথা। পলিটিকেল এজেণ্টকে সকল কথা বলিতে অগ্রে লেপ্‌ টেনাণ্ট গর্ডনকে পাঠাইয়াছি। আপনার পত্রের ৪ দফার অনুসারে আমি পৌঁছিয়াই রাজঅছি (রিজেণ্ট) ও দরবারকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিব; গভর্ণমেণ্টের মীমাংসার কথা ব্যক্ত করিব; সেনাপতিকে (টিকেন্দ্রজিৎকে) গ্রেপ্তার করিব এবং তাঁহাকে বলিব যে, তাঁহার নির্ব্বাসন কালের পরিসমাপ্তি, তাঁহার নিজের ব্যবহার ও দেশের শান্তির উপর নির্ভর করিবে। আমার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত, রক্ষকদের সহিত একটি কামান দিতে মহারাজকে হুকুম দিব। যেন কোন গোলযোগ না হয়, এই জন্য ২৫শে তারিখে সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া আসিব। প্রধান সেনানায়কের ইচ্ছাও এইরূপ। তাঁহাকে—আসাম ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য স্থানে * আটক করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে মাসিক ব্যয় ৫০৲ টাকা হইবে। আপনার পত্রের ৭ দফা—সর্ত্ত, তিন শত সৈন্য থাকিতে দিতে ও পলিটিকেল এজেণ্টের পরামর্শ শুনিতে মহারাজকে (কুলচন্দ্রকে) স্বীকার করিতে হইবে। পত্রের ৮ দফা—মহারাজের (শূরচন্দ্রের) বাসস্থান বৃন্দাবন—বৃত্তি ১০০৲ টাকা।

---

* আসাম কি ভারতবর্ষের মধ্যে নহে? বোধ হয়, ব্রিটিশ ভারত বলাই কমিশনারের অভিপ্রেত।

পাকাসেনাকে কোনমতেই মণিপুরে প্রত্যাগমন করিতে দেওয়া হইবে না; তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিতে মাসে ৪০৲ টাকা খরচ হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলে মণিপুরে থাকিতে পারে। শনিবারের মধ্যে কোন উত্তর না পাইলে, ঐরূপই করিব।

---

[২১]

আবেদন—২৫শে জুলাই, ১৮৯১ সাল।

মণিপুরের মহারাজা (যিনি এখন কয়েদী) কুলচন্দ্রধ্বজ সিংহ হইতে—মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি এবং গভর্ণর-জেনারেলকে।

"আমি সবিনয়ে জানাইতেছি যে, সকাউন্সিল ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেলের আদেশ অনুসারে মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক, যুক্তরাজ্য গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রাণী এবং ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং নরহত্যার সহায়তা করা অপরাধে আমার বিচার হইয়াছে।

বিগত ১৮ই জুন তারিখে মণিপুরের বিশেষ আদালত আমাকে নরহত্যার সহায়তা অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। এই আজ্ঞাপালন আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। নিম্ন-লিখিত হেতুবাদে আমি এখন সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সবিনয়ে আপীল করিতেছি।

১। আমি ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা নহি। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমি এবং মণিপুরের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব রাজাগণ সময়ে সময়ে যে সকল সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছি ও পাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ;

কিন্তু, আমি সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে, সেই মহামান্যা মহারাণীর সহিত কখনই আমার সেরূপ বাধ্যবাধকতা বা অধীনতা সম্বন্ধ ছিল না, যাহা ভঙ্গ করায় আমি রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য এবং ইংলণ্ড ও ভারত-বর্ষের সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে দণ্ডার্হ হইতে পারি।

২। মণিপুর একটি স্বাধীন রাজ্য। তাহা মহারাণী ব্রিটেনেশ্বরীর সহিত মিত্রতা ও সন্ধি সূত্রে বদ্ধ। বিগত [illegible]শে মার্চ্চ তারিখে আমি সেই মণিপুরের একচ্ছত্রী অধিপতি ও শাসন কর্ত্তা ছিলাম। ভারত গভর্ণমেণ্টও আমাকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। অতএব ইংলণ্ডের মহারাণী ও ভারত-সাম্রাজ্ঞীর প্রতি আনুরক্তি-ভঙ্গ বা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আসামী-শ্রেণীভুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করিয়া, শাস্তি দিবার অধিকার ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নাই।

৩। যদি আপনি এমতই মীমাংসা করেন যে, ভারত-গভর্ণমেণ্টের এরূপ ক্ষমতা আছে। তথাচ আমার নিবেদন এই যে, ভারত সাম্রাজ্ঞীর সৈন্যগণের বিপক্ষতাচরণ করিতে আমি কখনই ইচ্ছা করি নাই এবং কার্য্যতঃও কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করি নাই।

৪। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মণিপুর সিংহাসন ত্যাগ করায় আমি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি। ভারত-গভর্ণমেণ্ট যে আমাকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করা স্থির করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহা সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে। আমি একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি। আমি সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করা বা না করা সম্বন্ধে মীমাংসার সম্পূর্ণ অধিকার আমার ছিল। আমার সেরূপ স্বাধীনতা ছিল না

বলিয়াই যদি আপনি বিবেচনা করেন, তথাচ আসামের চিফ্ কমি-শনারের ইচ্ছামত আমার ভ্রাতাকে সমর্পণ করিতে অথবা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার লিখিত হুকুম দিতে ইতস্ততঃ করায়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রম প্রদর্শন করা, আমার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল না।

৫। মোকদ্দমাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, যুবরাজ (টিকেন্দ্র-জিৎ) নিজেও ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মত মণিপুর পরিত্যাগ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল, অধিকন্তু মিষ্টার কুইণ্টন্ সহসা ঐ কথা বলায় শরীর ভাল হইবার ও সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাইবার আশায় তিনি কয়েক দিন মাত্র সময় চাহিয়াছিলেন। আমি সবিনয়ে জনাইতেছি যে, মিষ্টার কুইণ্টন যুবরাজের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতগভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে নিশ্চয়ই মণিপুর পরিত্যাগ করিতেন (সুতরাং কোনরূপ গোলযোগই ঘটিত না)।

৬। ভারত গভর্ণমেণ্ট যুবরাজকে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক দেশান্তরিত করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যদি আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন অথবা গ্রিমউড সাহেবকে এ বিষয়ে তাঁহার নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আদেশ দিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ জরুরি হুকুম দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হইত না। সে ক্ষেত্রে বিগত ২৪শে মার্চ্চ রাত্রে সঙ্ঘটিত দুর্ঘটনাবলীও ঘটিত না।

৭। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সৈন্যের আকস্মিক ও অভাবনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে মণিপুরীরা কেবল আত্মরক্ষা করিতে-ছিল। এ ক্ষেত্রে আমি মণিপুরী সৈন্যগণের তদ্রূপ ব্যবহার কার্য্যতঃ

[প্র]দান করায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধ স্বরূপ পরিগণিত হওয়া উচিত নহে।

৮।৯। আমার সুবিচার হয় নাই এবং কোন উপযুক্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারি নাই। যে অপরাধে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, সকল বিষয় বুঝিয়া আমাকে তাহা হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত।

১০। বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখের দুর্ঘটনার সময় আমার পক্ষে যদি কিছু ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অবনত হইয়া, ভারত সাম্রাজ্ঞীর এবং সকাউন্সিল আপনার নিকট দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমি সবিনয়ে প্রার্থনা জানাইতেছি, যে, মোকদ্দমার আমূল বৃত্তান্ত এবং আমার পক্ষ সমর্থনকারী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের বাদানুবাদ অবগত হইয়া, আমার যে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, আপনি তাহা রহিত করিবেন। তাহা হইলে আমি চিরদিন আপনার মঙ্গল কামনা করিব।"

---

[২২]

আবেদন—২৫শে জুলাই, ১৮৯১ সাল।

(এখন প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদী) মণিপুরের টিকেন্দ্রজিৎ বীরসিংহ হইতে মন্ত্রী-সভা-ধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেলকে।

"সকাউন্সিল আপনার আদেশানুসারে মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক আমি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের রাণী ও ভারত

সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও নরহত্যা সহায়তাকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছি। সেই আদালত আমার প্রতি যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। সেই বিচার ও প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমি সবিনয়ে আপীল করিতেছি।

১। যুদ্ধ করা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, আমি ব্রিটিশ প্রজা নহি। মণিপুরের রাজাগণ ভারতগভর্ণমেণ্ট হইতে সময়ে সময়ে যে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। তথাচ আমি নির্ভয়ে নিবেদন করিতেছি যে, মণিপুর রাজ্যের প্রজাগণ ইংলণ্ডের রাণী এবং ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞীর অধীন বা অনুরক্ত থাকিতে কোন কালেই বাধ্য ছিল না। অতএব সেই মহামান্যা মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মণিপুরের অধিবাসীগণ কখনই শাস্তি পাইতে পারে না।

২। মণিপুরের কোন মহারাজা কখনও ব্রিটেনেশ্বরীর এরূপ বাধ্যতা স্বীকার করেন নাই বা তাঁহার সহিত এরূপ কোন সর্ত্ত করেন নাই, যাহাতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতি আনুরক্তি দেখাইতে বা কোনরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে মণিপুরী প্রজাগণ বাধ্য থাকিবে।

৩। বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে, কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষণাধীন হইলেও মণিপুর সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। অতএব ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় আমি কোনরূপেই দোষী নহি।

৪। আমাকে ভারত সাম্রাজ্ঞীর অনুরক্ত ও বাধ্য থাকিতে যে কোন কারণে উচিত ছিল, তাহার প্রমাণ কিছুই দেওয়া হয় নাই। অতএব আমি এই অভিযোগে শাস্তি পাইতে পারি না।

৫। যে কোন রূপেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, কোন ব্রিটিশ আদালতেরই আমার মত লোকের বিচার করিবার ক্ষমতা বৈধরূপে জন্মিতে পারে না। যদি তাহা হইতে পারে বলিয়াই বিবেচনা

করেন, তথাচ সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারত সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না। ব্রিটিশ কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করিবার জন্য অন্যায়রূপে আমার বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। আমি তাহা নিবারণ করিয়াছিলাম মাত্র। আমাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিবার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা কেবল মাত্র মণিপুর মহারাজের ছিল। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমাকে ঐরূপ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছিল।

৬। মণিপুরাধিপতির বিরুদ্ধে মিষ্টার কুইণ্টন কোনরূপে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু মণিপুর রাজ-প্রাসাদ-প্রাঙ্গন-মধ্যস্থিত, আমার আবাস বাটী অকস্মাৎ ব্রিটিশ সৈন্যগণ আক্রমণ করিয়াছিল। আমি সসম্ভ্রমে জানাইতেছি যে, আমার সৈন্য ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ (যাহারা সে সময়ে আমার বাটী রক্ষা করিতেছিল) সেই আক্রমণ নিবারণ করায় ভারত সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যদি এমন কথাই ধরিয়া লয়েন যে, মণিপুর মহারাজের অনুমতি ব্যতীতও আমাকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা ভারত-গভর্ণমেণ্টের বা তৎস্থলাভিষিক্ত মিষ্টার কুইণ্টনের ছিল, তথাচ আমি সাহস করিয়া বলিতেছি যে, আমাকে মণিপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিবার হুকুম দিবার পূর্ব্বে আমার আত্মবিবরণ ও সাফাই জবাব শুনা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্তই কর্ত্তব্য ছিল। এরূপ করিলে গভর্ণমেণ্ট সম্ভবতঃ আমাকে অকস্মাৎ মণিপুর পরিত্যাগ করিবার জন্য জিদ করা উচিত মনে করিতেন না।

৮। আমি কোনরূপেই আসামের চিফকমিশনারের অধীন ছিলাম না। তিনি যে কোন আদেশ প্রদান করিবেন, তাহাই পালন

করা আমার কর্ত্তব্য ছিল, এরূপ ভাবিলেও যেরূপে মিষ্টার কুইণ্টন আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কারণে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সে সময়ে আমি অসুস্থ ছিলাম এবং কেবল সেই জন্যই আমার প্রতি সুবিবেচনা করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে সুবিধামত গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্রিটিশ রেসিডেন্সির মধ্যে দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে ছলনা পূর্ব্বক তাহাতে উপস্থিত হইতে আহ্বান করা, নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ২৩শে মার্চ্চ রাত্রে ব্রিটিশ রেসিডেন্সির মধ্যে নাচের বন্দোবস্ত করা ভাল হয় নাই। কেন না আমি বিলক্ষণ সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, তাহাতে উপস্থিত হইলেই আমাকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করা হইবে। সমস্ত আয়োজনের পর প্রস্তাবিত নাচ আর সে রাত্রে দেওয়া হয় নাই। চতুর্থতঃ, সকাউন্সিল আপনার অভিপ্রায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমি আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকার কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেবল আরোগ্য হইবার এবং মণিপুর পরিত্যাগের আবশ্যকীয় আয়োজন করিবার জন্য কয়েক দিনের সময় চাহিয়াছিলাম মাত্র। তখন আমার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, সদ্বিবেচনার পরিচয় দেওয়া চিফ-কমিশনারের নিতান্তই উচিত ছিল। পঞ্চমতঃ, শেষ রাত্রে আমার আবাস বাটী আক্রমণ না করিয়া, (কয়েক দিনের) সঙ্গতমত সময়ের মধ্যে আমাকে পাঠাইবার জন্য, মহারাজাকে জিদ্ করা চিফকমিশনারের উচিত ছিল।

৯। চিফ্-কমিশনার মণিপুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে, ব্রিটিশ সৈন্যের গতিরোধ করিবার আয়োজন আমি করিয়াছিলাম—বিশেষ আদালতের যে এইরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা ভুল। মহারাজা শূরচন্দ্র বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মণিপুর সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অভিযোক্তার পক্ষে প্রমাণ আছে যে, তিনি রাজপাট বল পূর্ব্বক পুনরধিকারু করিবার জন্য সসৈন্যে আসিতেছেন, এইরূপ রটনা চারিদিকে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে বাধা দিবার পরামর্শ কিয়ৎ পরিমাণে মণিপুরে হইয়াছিল। কিন্তু বলপূর্ব্বক ভারত-গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ অথবা চিফ কমিশনারের মণিপুর প্রবেশ নিবারণ করিবার ইচ্ছা আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও হয় নাই।

১০। নরহত্যার সহায়তা অভিযোগ সম্বন্ধে আমার কথা এই যে, আমাকে এবিষয়ে কোনরূপে অপরাধী সাব্যস্ত করার পক্ষে কিছু মাত্রও প্রমাণ নাই।

১১। ব্রিটিশ রেসিডেন্সি হইতে "সমর স্থগিতের" সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিতে পাইবা মাত্রই আমি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমি যদিও অসুস্থতা ও শ্রান্তি নিবন্ধন শয্যাগত ছিলাম, তথাচ মিষ্টার কুইণ্টনের সহিত সকল বিষয় তর্ক বিতর্ক ও মীমাংসা করিবার জন্য অবিলম্বে অগ্রসর হইয়াছিলাম। মিষ্টার কুইন্টন ও তাঁহার সঙ্গীগণ যাহাতে নিরাপদে রেসিডেন্সিতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে সে সময়ে আমার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে উদয় হইয়াছিল, আমি তাহাই করিয়াছিলাম। অঙ্গ মিঙ্গতো একজন প্রধান রাজমন্ত্রী। আমি তাঁহাকেই সাহেবদের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলাম। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে সকল ব্রিটিশ কর্ম্মচারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

১২। যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহাতে সে সময়, মিষ্টার কুইণ্টনের কেবল মৌখিক অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে ইতস্ততঃ করা, আমার পক্ষে কোন মতেই অস্বাভাবিক বা অন্যায় হয় নাই। সেরূপ

ইতস্ততঃ করা যদি অন্যায়ই হইয়া থাকে, তথাচ তাহা এই অভি-যোগে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা, কখনই উচিত হয় নাই।

১৩। আমি উত্তেজিত সৈন্যগণের চীৎকার ও কোলাহলধ্বনি শুনিতে পাইবামাত্রই, মিঃ কুইন্টন ও তাঁহার সঙ্গীগণের সাহায্যার্থ আসিয়াছিলাম এবং কতক ক্লেশে মিঃ গ্রিমউড ভিন্ন অপর সকলের প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার ফিরিবার পূর্ব্বেই শেষোক্ত ব্যক্তি হত হইয়াছিলেন। বিশেষ আদালত, এই ঘটনা আমার স্বপক্ষে ব্যবহার না করিয়া, তাহা ভ্রমক্রমে আমার বিরুদ্ধভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন।

১৪। আমার মনে হইয়াছিল যে, রক্ষক মণ্ডলী সঙ্গে থাকিলেও, তখন সাহেবদের পক্ষে, বাহির হওয়া, সম্পূর্ণ বিপজ্জনক। আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, সে রাত্রি দরবার গৃহে অতিবাহিত করাই, সাহেবদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। দরবার হল ভিন্ন, রাজ-পাটের মধ্যে অন্য কোন ঘরই নাই, যাহাতে তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। আমি পূর্ব্বোক্ত অন্যতর মন্ত্রী অঙ্গমিঙ্গতোকে, সাহেবদের রক্ষার্থে, চতুর্দ্দিকে প্রহরী শ্রেণী স্থাপিত করিতে বলিয়াছিলাম। সাহেবদের রক্ষাহেতু আমি উপযুক্ত মত সতর্কতা অবলম্বন করি নাই—বিশেষ আদালত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, যেরূপ প্রমাণ আদালত পাইয়াছেন, তাহাতে ঐরূপ ধারণা হইবার কোনই কারণ নাই।

১৫। থঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার কথা বলিয়া-ছেন—আমি এইরূপ শুনিবা মাত্রই, তাহা নিষেধ করিয়াছিলাম এবং তিনি সেইরূপ হুকুম দিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, আমি অবিলম্বে তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। আমি বারম্বার তাঁহাকে

বলিলাম যে, সাহেবদের প্রাণদণ্ড দূরে থাকুক—কোন ক্রমেই কিছুমাত্র অনিষ্ট করা উচিত নহে। তাহাতে, তিনি নিরুত্তর রহিলেন * ও তিনি সম্মত হইয়াছেন বলিয়া আমি বুঝিলাম। আমি তেমন দৃঢ়-রূপে প্রতিবাদ করার পর যে, তিনি পূর্ব্ব অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করিবেন, এরূপ ধারণাও আমার মনে হয় নাই। আমার শরীর একে দুর্ব্বল ছিল; তাহাতে আবার সমস্ত দিনের উত্তেজনা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ায়, নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম। এই মোকদ্দমার সাক্ষীগণের এজেহার প্রভৃতিতে এই সকল কথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১৬। যখন আমি নিদ্রিত হই, তখন সাহেবদের জীবন রক্ষা বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই হয় নাই। আমার মতের বিরুদ্ধে যে, থঙ্গাল জেনারেল কোন কার্য্যই করিবেন না, আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল। অধিকন্তু, সাহেবদের যেন কোন বিপদ না ঘটে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিবার ভার, রাজ্যের অন্যতর মন্ত্রী অঙ্গমিঙ্গতোর হস্তে দিয়াছিলাম এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ, থঙ্গাল জেনারেলের হুকুম মত কার্য্য কোনরূপেই না করিতে, প্রহরী দলের সর্দ্দার কর্ম্মচারী উসর্ব্বাকে আমি তৎপূর্ব্বে বিশেষরূপে বলিয়াছিলাম। এই সকল কারণে আমার মনে কোন সন্দেহই জন্মায় নাই।

১৭। আমার প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ও আমার অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধ জেনারেল সাহেবদের মস্তক ছেদন করাইয়াছিলেন। আমি তাহার

---

* "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" আমাদের মধ্যে চির প্রবাদ। টিকেন্দ্রজিৎ পরম হিন্দুর সন্তান এবং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শিক্ষিত ও দীক্ষিত।

পূর্ব্বে বা পরে কোন কথা বা কার্য্যের দ্বারা কখনই সে বিষয়ে অনুমোদন করি নাই। অতএব নরহত্যার সহায়তাকারী-অপরাধী—আমি নহি।

১৮। পরদিন প্রাতঃকালে, থঙ্গাল জেনারেলের কুকার্য্যের কথা, আমি মহারাজাকে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু থঙ্গাল সামান্য লোক নহেন—তিনি রাজ্যের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন। সে সময় মণিপুরে যে ভয়ানক বিভ্রাট বাধিয়া গিয়াছিল, তাহাতে মহারাজা বা আমি থঙ্গালকে কোনরূপে শাস্তি দিতে সাহস করি নাই।

১৯। সাহেবদের প্রাণনাশ করা উচিত—এমন ইচ্ছা যে আমার কখনও হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ, মোকদ্দমার কাগজ পত্রে নাই। বিশেষ আদালত, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২০। আমি এতৎসহ বাবু ব্রজমোহন সিংহ ও বাবু জানকীনাথ বসাকের প্রতিজ্ঞাপত্র (এফিডেবিট) পাঠাইলাম। তদ্দ্বারা এবং মোকদ্দমার অন্যান্য কাগজ পত্রে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, মণিপুরে আমার সুবিচার হয় নাই এবং কোন আইনজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিও আমার পক্ষসমর্থনকারী ছিলেন না।

২১। আদালত আমার প্রতি সুদীর্ঘ কূট প্রশ্ন করিয়া তদুত্তর সকল যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা উচিত নহে।

২২। ইংরাজী ভাষায় লিখিত যে বিবরণ আমি মণিপুর আদালতে দাখিল করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কোন কথা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত নহে। তাহা যেরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জানকী বাবুর প্রতিজ্ঞাপত্রে (এফিডেবিটে) প্রকাশ আছে।

২৩। কাছাড় অথবা অন্যস্থান হইতে ভাল উকীল লইয়া যাইবার জন্য বা আইন ঘটিত পরামর্শ লইবার জন্য আমাকে সময় দেওয়া উচিত ছিল।

২৪। সাক্ষীগণের এজেহার যে ধরণে ভাষান্তরিত ও লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক কথা (আমার বিরুদ্ধে) গুরুতররূপে অন্যায় ভাবে দাঁড়াইয়াছে। একথাও জানকী বাবুর এফিডেবিটে প্রকাশ আছে।

২৫। যদি আমার কোনরূপ সুবিবেচনার ত্রুটি হইয়া থাকে, অথবা যদি আমার কোন কার্য্যে ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অবনত হইয়া সেই মহা-মান্যা ভারত সাম্রাজ্ঞী ও সকাউন্সিল আপনার নিকট দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, উপর্য্যুক্ত কারণে এবং এতৎসহ প্রেরিত আমার আপীল সম্বন্ধে নিযুক্ত বারিষ্টারের মুদ্রিত হেতুবাদ-পত্র ও বিগত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে মিষ্টার গ্রিমউড আমাকে যে যথার্থই পীড়িত দেখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের প্রমাণ সূচক (এই দরখাস্ত সহ সংযোজিত) মিসেস গ্রিমউডের তারের সংবাদটি দেখিয়া, আমার প্রতি প্রদত্ত মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকাউন্সিল আপনি রহিত করিবেন। এবং আমিও চিরদিন জগদীশ্বর সমীপে আপনাদের মঙ্গল কামনা করিব।”

[২৩]

এফিডেবিট—২৫শে জুলাই, ১৮৯১ স্যাল।

ভারতগভর্ণমেণ্টের নিকট, মণিপুরের মহারাজা কুলচন্দ্র সিংহ এবং টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের দরখাস্তের সহিত জানকী বাবু ও ব্রজ বাবুর প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠান হয়। এ গুলিতে বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের হেতুবাদ ও সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের দরখাস্ত লিখিত অনেক কথার প্রমাণ আছে। আমরা আবশ্যকীয় কথা গুলি মাত্র দিলাম।

বাবু জানকীনাথ বসাকের প্রতিজ্ঞা পত্র। (এফিডেবিট।)

আমি রূপচাঁদ বসাকের পুত্র—আমার নাম জানকীনাথ বসাক। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতেছি। আমি ব্যবসাদার। যুবরাজের বিচারারম্ভের দুই দিন পরে, গভর্ণমেণ্ট-পক্ষে তদ্বিরকারী মেজর মেক্স্ওয়েল, বামাচরণ বাবু ও আমাকে (যুবরাজের * ইচ্ছা-মত) যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য, তাঁহার সহিত, ৩রা জুন ১৮৯১ সাল বেলা ৯ টার মধ্যে দেখা করিতে লিখেন। আমি ১০০০ টাকা লইয়া, যুবরাজের পক্ষে দাঁড়াইলাম। আমি উকীল নহি এবং কিরূপে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে হয়, তাহার কিছুই জানিনা। ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে জানি, কিন্তু ভাষাবোধ ভাল নাই। মণিপুরে দুই বৎসর থাকায়, মণিপুরী ভাষা কতক শিখিয়াছি। বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা—উর্দ্দু ও জানি।

যাত্রা সিংহের এজেহার আমি মন দিয়া শুনিয়াছিলাম। যাত্রা সিংহের কথা, পার্থ সিংহ নামে একজন পেন্সন-ভোগী পুলিস কর্ম্মচারী

---

* কুলচন্দ্র রাজা হইবার পর, টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হইয়াছিলেন। বিচারের সময় গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে যুবরাজ বলিয়াছেন।

হিন্দুস্থানীতে তর্জ্জমা করিয়াছিল। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, "যুবরাজ থঙ্গাল্ জেনারেলের সহিত সাহেবদিগকে হত্যার হুকুমের বিষয়ে কথারম্ভ করিলে, থঙ্গালের উত্তরে যুবরাজ কি বলিলেন, তাহা শুনিতে অপেক্ষা না করিয়াই, সে চলিয়া গিয়াছিল"—ঠিক এই কথাই যাত্রা সিংহ বলিয়াছিল। বিশেষ আদালত, এ বিষয়ে "যুবরাজ কোন কথাই বলিলেন না" ইত্যাদি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

আরুসিংহের অন্য নাম উসর্ব্বা। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, অন্যান্য কথার সহিত সে এইরূপ বলিয়াছিল—"যুবরাজ থঙ্গাল জেনারেলকে বলিলেন যে, সাহেবদিগকে কোন ক্রমেই বধ করা হইবে না" ইত্যাদি।

মণিপুরী সাক্ষীরা যাহা জানিত, তাহা দুই তিন মিনিট, কখনও বা আরও অধিকক্ষণ ধরিয়া বলিবার পর, পার্থসিংহ মণিপুরী কথার ভাব উর্দ্দুতে বলিত; এবং সরকার পক্ষের তদ্বিরকারী মেজর মেক্সওয়েল, তাহা পুনরায় ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া আদালতকে বুঝাইতেন। মণিপুর-বিশেষ-আদালতে এইরূপে সাক্ষীর এজেহার লওয়া হইয়াছিল। উহাতে সময়ে সময়ে বড় গোলযোগ হইয়াছিল। পার্থসিংহের তর্জ্জমা যে ঠিক হইতেছে না, একথা আমি অনেকবার আদালতকে জানাইয়াছিলাম এবং বিচারকদের মধ্যে একজন (মেজর রিজওয়ে) অনেকবার তাহার ভুল ধরিয়াছিলেন।

যুবরাজের সকল কথা শুনিয়া, তাহার স্থূল স্থূল বিষয় দিয়া আমি তাঁহার পক্ষে, দরখাস্ত লিখি। তাঁহার দস্তখত হইয়া, আদালতে দাখিল হইবার পর আদালতের সভাপতি (প্রেসিডেণ্ট) বলিলেন যে, আমার "ইংরাজী লেখায় ভুল আছে, অতএব দরখাস্তের ভাষা সংশোধন

করা উচিত—কেননা সেখানিকে ছাপাইতে হইবে।" দরখাস্তখানি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া, দাখিলের দুই দিন পরে, আদালতের সভাপতি আমাকে ফেরত দেন এবং তাহা সংশোধনের পক্ষে কাপ্তেন ডিউমাউলিনের উপদেশ ও সাহায্য লইতে বলেন। মণিপুর রাজকুমারগণের স্বার্থবিরোধী পাইওনিয়ার ও অন্যান্য ইংরাজী কাগজের বিশেষ সংবাদদাতারূপে, এই কাপ্তেন সাহেব আদালতে উপস্থিত থাকিতেন।

দরখাস্ত তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইবার পর, আমি তাহা নকল করিয়া, যুবরাজের সহি করাইয়া লইলাম। আমাকে বুঝাইয়া দেওয়ায় এখন জানিতেছি যে, আসল দরখাস্তের এমন কয়েকটি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহার* মর্ম্মানুসারে যুবরাজ যাহা বলেন নাই বা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই, তাহা বলিয়াছেন বা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া বুঝাইতেছে। পরিবর্ত্তনে যে অর্থ বিপরীত হইতেছে তাহা আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই এবং যুবরাজও জানিতে পারেন নাই। মূল দরখাস্তখানি, আদালতের প্রেসিডেন্ট কাপ্তেন সেণ্ট জন মিচেল ও কাপ্তেন ডিউমাউলিনের হস্তাক্ষরে পরিবর্ত্তন সহ, আমি ১৯শে জুলাই তারিখে, কলিকাতা আসিয়াই কাউন্সিল (ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষকে) দিয়াছিলাম, এখন এতৎসহ পাঠাইতেছি। মহারাজ কুলচন্দ্র এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ কেহই কিছুমাত্রও ইংরাজী জানেন না। * * আমি মহারাজ কুলচন্দ্রের দরখাস্তের

---

* জানকী বাবুর কলিকাতায় আগমনের পর, ব্যারিষ্টার ঘোষজা মহাশয় বুঝাইয়া দেওয়াতে জানকী বাবু নিজের ভুল দেখিতে পাইয়াছেন—অনুমান হয়। মূল দরখাস্তে উক্তমত পরিবর্ত্তন হেতু, যে যে স্থলে অর্থ বিপরীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ জানকী বা যু দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালাতে সে সকল কথা বুঝান অসাধ্য।

যে খসড়া করিয়াছিলাম, তাহারও অনেক স্থলে উক্ত কাপ্তেন ডিউমাউলিন পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন।

অদ্য ২৫শে জুলাই, ১৮৯১ সাল,

আমার সমক্ষে উক্তমত (স্বাক্ষর)

প্রকাশ করিলেন। মোহর। শ্রীজানকীনাথ বসাক।

ককরেল এ, স্মিথ,

নোটারি, পব্লিক।

[২৪]

বাবু ব্রজমোহন সিংহের প্রতিজ্ঞাপত্র (এফিডেবিট)

(ইহাও লাটসাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল।)

মণিপুর রাজ্যান্তর্গত, নিজপুরের অধিবাসী, নদেরচাঁদ সিংহের পুত্র, ব্রজমোহন সিংহ, শপথ পূর্ব্বক এইরূপ বলিলেন।

১। আমি মণিপুরের যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের খাসকর্ম্মচারী (প্রাইভেট সেক্রেটারী) ছিলাম।

২। যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কাছাড় হইতে উকীল আনিবার সময় প্রার্থনায়, আমি মণিপুরী ভাষায় এক দরখাস্ত লিখি। তাহা যুবরাজ স্বাক্ষর করিয়া, মণিপুরের বিশেষ আদালতে (চন্দ্র সিংহের দ্বারা) দাখিল করেন। আদালত সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ও ফেরত দিয়া বলেন যে, "মণিপুরে যদি কাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহাকে একার্য্যে নিযুক্ত কর"।

৩। তৎপরে পার্থসিংহ যে বিভাষীর কার্য্য করিতেছিল, এবং পুলিস কর্ম্মচারী কালেন্দ্রসিংহ যে যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল,

তাহাদের পরামর্শমতে বাবু জানকী নাথ বসাক ও বামাচরণ মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিই। এই দুই জন বাঙ্গালী ভিন্ন, এই কার্য্যার্থে অন্য কোন ইংরাজীতে অভিজ্ঞ লোক সে সময়ে মণিপুরে পাওয়া যায় নাই।

৪। যে পার্থসিংহ দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিল, সে ইতিপূর্ব্বে যুবরাজের নিকট (তাঁহার সেনাপতি থাকার আমলে) সৈন্যগণের কাওয়াজ-শিক্ষক ছিল। তৎপরে সে কার্য্য ছাড়িয়া, যুবরাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও পরম শত্রু পাক্কাসিংহের অধীনে চাকরীতে নিযুক্ত হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীব্রজমোহন সিংহ।

("ব্রজমোহন সিংহ মণিপুরী ভাষায় উপরের যে সকল কথা বলেন, মণিপুরের অধিবাসী এখন কলিকাতা-প্রবাসী, মেজর গোলাপ সিংহ তাহা হিন্দিতে এবং হিন্দি হইতে আমি ইংরাজীতে ঠিক তর্জ্জমা করিয়াছি।" ইত্যাদি আইনানুযায়ী বিবরণ ককরেল সাহেব এই স্থলে দিয়াছেন।

(স্বাঃ)

ককরেল, এ, স্মিথ,
নোটারি, পব্লিক, মোহর
কলিকাতা।

[২৫]

পত্রাংশ—২৫শে মার্চ্চ। ১৮৯১ সাল।

মণিপুরের রাজ-অছি কুলচন্দ্র সিংহ হইতে—
মহারাণীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়কে)।

"তখন আমার করমর্দন করিয়া, তিনি বলিলেন যে, সেই দিনই

বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, তিনি একটি রেসিডেন্সিতে দরবার করিবেন এবং গভর্ণর-জেনারেল যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সে সমুদয় সেই খানে ব্যক্ত করিবেন। সকল ভ্রাতার সহিত একত্রে, ১২ টার সময় সেই দরবারে আমাকে উপস্থিত হইতে তিনি বলিলেন। * * *

ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্যটিকে গভর্ণমেণ্ট এতাবৎকাল মিত্রভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নির্ব্বন্ধতাতিশয় সহকারে বারম্বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, চিফ-কমিশনার সাহেব কেন যে সেই চির-বন্ধুত্বভাব ভঙ্গ করিয়া তেমন অন্যায় ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তিনি যে মহামান্য গভর্ণর-জেনারেলের পরিচালনাধীনে এইরূপ করিয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

[২৬]

পত্রাংশ—নং ৩ এম, ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৯১ সাল।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কলেট হইতে—গভর্ণমেণ্টকে।

"এ প্রদেশবাসীদের সর্ব্ববাদী-সম্মত ধারণা ছিল যে, চিফ-কমিশনার যে রক্ষক দল সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা বিপুল বলসম্পন্ন ও সর্ব্বপরাভবকারী। সুতরাং তেমন ভয়ানক দুর্দ্দৈব যে ঘটিবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। অনুমান হয় যে, ৪০৮ জন গুর্খা, (মণিপুর রেসিডেন্সির) স্থায়ী ১০০ গুর্খা সৈন্যের সহিত যোগ দিলে এবং সিলচর হইতে মণিপুরাভিমুখী আরও ২০০ গুর্খা তাহাদের পৃষ্ঠ-পোষক হইলে, অসন্তুষ্টচিত্ত ও বিরুদ্ধাচারী সকলকেই সন্ত্রাসিত করা যাইতে পারে। কর্ণেল স্কীনে একজন বহুদর্শী কর্ম্মচারী। তিনি

অনেক যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াছেন এবং আসামেই তাঁহার জীবন কাটাইয়াছেন। চিফ-কমিশনার যে কার্য্যের জন্য যাইতেছেন, তাহা তিনি জানিতেন—কেননা, আমি তাঁহাকে সকল কথা বিশ্বস্ত ভাবে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে কার্য্যের জন্য যে নিতান্ত অল্প সংখ্যক রক্ষক-সেনা লইয়া যাওয়া হইতেছে, ইঙ্গিতেও তিনি এমন কথা আমাকে বলেন নাই।"

[২৭]

পত্রাংশ—নং ১, ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৯১ সাল।

মণিপুর পলিটিকেল রেসিডেন্সির প্রধান কেরাণী বাবু রসিকলাল কুণ্ডু হইতে—আসামের চিফ-কমিশনারকে।

(রসিক বাবু ১২ই মে, ১৮৯১ তারিখে, যে বিবরণ পত্র দিয়াছেন—তাহাতে তিনি বলেন যে সেনাপতি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সেনাপতি নিজে বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা এবং তাঁহার পত্রের নিম্নাংশ গভর্ণমেণ্ট দলীল স্বরূপ গণ্য করিয়াছেন।) * * * * *

সেনাপতির বিষয়—তাঁহার কথা এই যে, বরাবরই তিনি প্রধান শক্তির (অর্থাৎ ইংরাজের) মতানুবর্ত্তী আছেন। বহুদিন যাবৎ যে সকল মনোদুঃখ তিনি ভোগ করিতেছেন, গভর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে সমুদায়ের প্রতি কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে এখনও তিনি আত্ম-সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ইংরাজ সাহসী জাতি—তাঁহারা স্বভাবতঃই সাহসের আদর ও সম্মান করিতে চাহেন, অতএব তাঁহাকে শাস্তি না দিয়া, তাঁহার সৎসাহস সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিলে, তিনি অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। সেনাপতি এ কথা

ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি বিখ্যাত বভ্রুবাহন-বংশ-সম্ভূত ক্ষত্রিয় সন্তান। তিনি কেবল আত্মরক্ষার্থই যুদ্ধপ্রিয় জাতির নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছেন। তথাচ যদি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধ্বংস করাই আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনিত্য জীবনের জন্য তিনি কিছু মাত্রও ভীত নহেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্ট একটি ক্ষুদ্র, অধীন ও নিতান্ত অসমকক্ষ রাজ্যকে নষ্ট করিলে, গভর্ণমেণ্টেরই অপযশ হইবে।

[২৮]

তারের সংবাদ—২৫২ এম, ৮ই মে, ১৮৯১ সাল।

আসামের চিফ-কমিশনার হইতে—গভর্ণমেণ্টকে।

(পূর্ব্ব চিফ-কমিশনার কুইণ্টন সাহেব মণিপুরে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে দেহত্যাগ করিয়াছেন—এখন নূতন লোক এপদে বাহাল হইয়াছেন।)

"আপনার ৬ই মে তারিখের ৯০৫ নং পত্র পাইয়াছি। তদুত্তরে গর্ডনসাহেবর নিকট হইতে (৭ই মে তারিখের) যে পত্র পাইয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"আপনার ২৫০ এম পাই-য়াছি। পরামর্শ ধার্য্য হয় যে, দরবারে ভারত গভর্ণমেণ্টের হুকুম জানান এবং সেনাপতিকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইবে। তিনি অস্বীকার করিলে, দরবারের মধ্যেই কর্ণেল স্কীনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন। প্রতিরোধের আশঙ্কা নিবারণার্থ, রেসিডেন্সির চারিদিকে, সৈন্যগণকে সুসজ্জিত ও প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। (মিঃ কুইণ্টন কর্ত্তৃক অগ্রে প্রেরিত হইয়া তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে)

আমি মিঃ গ্রিমউডকে সেনাপতির নির্ব্বাসনের কথা সর্ব্ব প্রথমে জ্ঞাত করিয়া জিজ্ঞাসা করি "যাহাতে তিনি গ্রেপ্তার নিবারণার্থে বল প্রদর্শন করিবার সুবিধা না পান, অথচ তাঁহাকে হস্তগত করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় কি?" গ্রিমউড বলিলেন যে "সেনাপতি নিজে যতদুর সাধ্য প্রতিরোধ করিবেন।" উল্লিখিতরূপে, দুইদিক বজায় রাখিয়া গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায়ই গ্রিমউড স্থির করিতে পারেন নাই। সেনাপতির অনুচরদের সংখ্যা কত, অথবা সাধারণ লোকের আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, এমন কথা গ্রিমউড বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভয় ও মৈত্রতার দ্বারা রাজ-অছিকে বাধ্য করিয়া, তাঁহারই দ্বারা সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করাইতে পারেন কিনা, আমি গ্রিমউডকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন—"না"। অন্যান্য বিষয় তত আবশ্যকীয় নহে। ৬ই মার্চ্চ তারিখে গোলাঘাটে মণিপুর যাত্রার উদ্দেশ্যে, কর্ণেল স্কীনেকে বলা হইয়াছিল। ৪ঠা তারিখের ইংলিসম্যান সংবাদ পত্র আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।"

[২৯]

রিপোর্ট (কিয়দংশ) তারিখ বিহীন—১৬ই মে, ১৮৯১ সালে প্রাপ্ত।

লেফ্‌টেনাণ্ট পি, আর, গর্ডন হইতে—

আসাম চিফকমিসনারকে।

"আমাদের তর্কবিতর্ক শেষ হইল। চিফকমিসনারকে আমি নিম্নলিখিত তারের সংবাদ পাঠাইলাম। তাহাতে পলিটিকেল এজেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল।

১। কালক্রমে তাঁহাকে মণিপুরে ফিরিতে দেওয়া হইবে,

এইরূপ অঙ্গীকার সেনাপতির নিকট করিলে, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা যাইতে পারে।

২। দোলরাই-হামজাবা ও জিল্লাসিংহ এই দুইজন রাজকুমারকে দেশান্তরিত করার প্রয়োজন নাই।

৩। পাক্কা-সেনা ও ভূতপূর্ব্ব মহারাজের দলস্থ অন্যান্য রাজকুমার-দিগকে, কোন মতেই মণিপুরে ফিরিতে দেওয়া উচিত নহে। মিঃ গ্রিমউড ঐ তার-সংবাদ-লিপি নিজে দেখিয়া অনুমোদন করিলেন। * *

আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম যে, মিঃ গ্রিমউডকে আনাইয়া তিনি যাহা বলেন, তাহা চিফকমিসনারের নিজে শুনা উচিত। মিঃ কুইণ্টন তাহাই করিলেন এবং ২১ শে তারিখে, সেঙ্গমাই গ্রামে মিঃ গ্রিমউড আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিবামাত্রই, তিনি চিফ-কমিসনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। কি স্থির হইল আমি জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয় যে. চিফকমিসনার সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া থাকিবেন। এইরূপ সাক্ষাৎ শেষ হইবার পর মিঃ কুইণ্টন, কর্ণেল স্কীনে, মিঃ গ্রিমউড এবং কমিসনারের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি মিঃ কমিনন্স, একত্রে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্রণায় আমি উপস্থিত ছিলাম না। প্রায় আধঘণ্টা পরামর্শের পর মিঃ গ্রিমউড দল ছাড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কতকদূর গিয়া পড়িলেন—ইহা আমি দেখিলাম। তাঁহার ভাবভঙ্গীতে বোধ হইল যে, তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। আমি এই ভাবে মিঃ গ্রিমউডকে দেখিবার অনতিবিলম্বেই চিফকমিসনার আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, পরদিন দরবারে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইবে; এবং গ্রেপ্তারের পরই (অপরাহ্নে) আমাকে একাকী মণিপুর হইতে তাঁহাকে লইয়া সেঙ্গমাই আসিতে হইবে।

ইহা হইতেই আমি সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রণায় ধার্য্য হইয়াছিল যে পরদিন দরবারে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইবে। আমার লেখা উচিত যে, ঐরূপ মতলবের কথা আমি আজি এই প্রথম শুনিয়াছিলাম।”

---

[৩০]

তার-সংবাদ—২৮শে মে, ১৮৯১ সাল।

মহারাণীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়) (সিমলা) হইতে,—সেক্রেটারী অফ ষ্টেটকে (লণ্ডন)।

“মণিপুর শাস্তির বিষয়—“ব্রিটিশ রাজত্ব সুদৃঢ়রূপে ও নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য এই কথা যাবতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রজা সকলকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক যে, সেই রাজ্যের যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমানুসারেই হউক না কেন, যদি তাহারা ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা বা হত্যার সহায়তা করে, তবে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা স্পষ্টই বিধান করা হইয়াছে যে, যাহাতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাণদণ্ড হইবে, এরূপ মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করিবার অধিকার কোন দেশীয় রাজ্যেরই নাই। আমি বিবেচনা করি যে এই অকাট্য মতটি সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখা অতি আবশ্যক।”

* * * * *

---

[৩১]

তার-সংবাদ—৩রা জুন, ১৮৯১ সাল।

সেক্রেটারী অফ ষ্টেট, (লণ্ডন) হইতে—

রাজ-প্রতিনিধিকে (সিমলা)।

"আপনার ২৮শে মের তার-সংবাদ অনুসারে, মণিপুর-শাস্তির বিষয়ে আপনার মতেই আমার মত।"

[৩২]

তার-সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন, ১৮৯১ সাল।

রাজ-প্রতিনিধি (সিমলা) হইতে—ষ্টেট-

সেক্রেটারীকে (লণ্ডন)।

[স্বীয় মত সমর্থনার্থ ভাইসরয়—লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাদুর যে সকল পত্রাংশ প্রভৃতির নকল দিয়াছেন, সে সমস্তই আমরা দলীলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, এতএব এই পত্রের দফায় দফায়, আমরা তাহার সংখ্যা মাত্র উল্লেখ করিলাম। পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।]

"মণিপুর সম্বন্ধে, এই সকল বিষয়ে, আমরা আপনার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

১ম। অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহে, উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণয় করা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এবং সে পক্ষে গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর না করিলে কোন দেশীয় রাজ্যে, কেহই উত্তরাধিকারী সূত্রে, রাজা হইতে পারে না—ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত এবং সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত।

২য়। অধীনস্থ রাজ্যসমূহের মধ্যে মণিপুর একটি। আমরা মণিপুরকে বর্ম্মা হইতে স্বাধীন করিয়াছি। আমরা মণিপুরের উত্তরা-

ধিকারিত্ব মঞ্জুর করিয়াছি এবং নানারূপে প্রভুত্ব দেখাইয়াছি। মণিপুরের রাজপরিবার বারম্বার আমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত—১৮৭৪ সালে মহারাজা (ভাইসরয়কে) রাজপ্রতিনিধিকে নজর দিয়াছিলেন এবং খেলাত পাইয়াছিলেন। আবার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ (শূরচন্দ্র), যিনি এখন কলিকাতায় আছেন, তাঁহার পিতার ইচ্ছাক্রমে এবং তদীয় জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকারী বলিয়া, আমাদের কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ আবার ভূতপূর্ব্ব রাজার অনুরোধে, বর্ত্তমান যুবরাজ কুলচন্দ্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া আমরা গণ্য করিয়াছিলাম। স্বদ্ধ ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নহেন—বিদ্রোহের পরে, রাজ-অছি॰ কুলচন্দ্র এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎও মণিপুর রাজ্যের অধীনতার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

(দলীল ১২।২৫।২৭)

৩য়। আমাদের মঞ্জুরী-প্রাপ্ত দেশীয় রাজাগণ নিতান্ত কুশাসন না করিলে, তাঁহাদিগের পোষকতা করা এবং তাঁহাদের রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ বিদ্রোহের দমন করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং এরূপ করিবার অধিকার আমাদের আছে। তদনুসারে আমরা মণিপুরাধিপতিগণের, পৃষ্ঠ-পোষকতা কয়েকবার করিয়াছি এবং তাঁহাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহীগণকে শাস্তি দিয়াছি। (দলীল ৫।১২)

৪র্থ। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মহারাজার বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান হইয়াছিল, তাহা অবৈধ বিদ্রোহ বটে এবং আমরা তাহা বলপূর্ব্বক নিবারণ ও দমন করিলে, এবং বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিলে ন্যায়-সঙ্গত কার্য্যই করা হইত। মহারাজা সিংহাসনাধিকার ত্যাগ না করিলে এবং সে বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় না জানিয়া, গ্রিমউড কথঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত তাহাতে সম্মত না হইলে, আমরা

উল্লিখিত মতই কার্য্য করিতাম। চিফকমিশনার গ্রিমউডকে কোহিমা হইতে সশস্ত্র সাহায্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন।

(দলীল ৬।৯।১০।১৫)

৫ম। যখন মহারাজা রাজপদ-পরিত্যাগের কথা প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে পুনঃস্থাপিত ও মণিপুর রাজ্যে তাঁহার প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু কুইণ্টন পত্রদ্বারা ও মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধির নিকট তদ্বিরুদ্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত মৌখিক আপত্তি করায়, আমরা ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। গ্রিমউডও মহারাজের পুনঃস্থাপন বিরোধী ছিলেন।

(দলীল ১৩।১৬।১৭)

৬ষ্ঠ। তথাচ আমাদের মঞ্জুরী-প্রাপ্ত একজন অধিপতির বিরুদ্ধে যে কোন রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবে—ষড়যন্ত্রকারীরা যে কোন শাস্তি পাইবে না এবং মণিপুরের রাজশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে সেনাপতির হস্তগত হইবে—ইহা আমাদের অসহ্য হইয়াছিল। সেনাপতি (টিকেন্দ্রজিৎ) অতি কুস্বভাবের লোক এবং তিনিই বিগত সেপ্টেম্বরমাসের রাজবিপ্লবের প্রকৃত নেতা ছিলেন। * * * * এই হেতু সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত করা আমরা উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম এবং কুইণ্টন যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই।

(দলীল ১০।১১।১৩)

৭ম। সেনাপতির নির্ব্বাসন যেরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা আমরা কুইণ্টনকে কিছুই বলি নাই। সেনাপতিকে বল প্রদর্শন করিবার সুবিধা না দিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সদুপায় সম্বন্ধে, আমরা তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। (দলীল ১৮)

২১শে ফেব্রুয়ারির ৩৬০ই নং পত্রের লিখিত উপদেশ ভিন্ন, আমরা কুইণ্টনকে এবিষয়ে (পত্রে বা মৌখিক) অন্য কিছুই বলি নাই।

৮ম। কুইণ্টন যে তৎসময়েই গ্রিমউডের মত জানিতে চাহেন নাই, তাহার কারণ গুপ্তপ্রকাশের আশঙ্কা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তার বা ডাক কার্য্যালয় হইতে সংবাদ পাইবার বিশেষ চেষ্টা দরবার নিঃসন্দেহই করিত এবং পাইতেও পারিত। এজেন্সী সংক্রান্ত কোন কোন লোক দরবারকে গোপনে সকল কথা জানাইয়া দেয়, বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে। কুইণ্টন্ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেন। কুইণ্টন্ যে নিজের অভিপ্রায়, গ্রিমউডের নিকটেও সযত্নে সংগোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার কারণ এইরূপে বুঝিতে পারা যায়। (দলীল ১৯)

৯ম। সুবিধা পাইলেই গ্রিমউডের সহিত পরামর্শ করিবার ইচ্ছা যে কুইণ্টনের ছিল, তাহা একসপ্তাহ পূর্ব্বে গর্ডনকে মণিপুর প্রেরণে প্রকাশ পায়। সে সময় গর্ডন, সেনাপতির নির্ব্বাসনের কথা গ্রিমউডকে পরিষ্কাররূপে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রেপ্তারের বিষয় পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। গ্রিমউড কোন সুযুক্তিই দিতে পারেন নাই। সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া গর্ডন ইটালী ভাষায় কুইণ্টনকে যে তার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা গর্ডন দেখিয়াছিলেন এবং অনুমোদনও করিয়াছিলেন।

১০ম। গর্ডন মণিপুর হইতে ফিরিবার পর, কুইণ্টন, আমাদিগকে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে তার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। (দলীল ২০)

* * * * *

১১শ। আমরা জানিতাম না—কুইণ্টনের, ১৮ই মার্চ্চ তারিখের তার সংবাদ পড়িয়াও বুঝিতে পারি নাই—যে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করি-

বার জন্য, তিনি রীতিমত দরবার (অর্থাৎ সাধারণ সভা) আহ্বান করিবার মতলব করিয়াছিলেন। সেই সংবাদে, "রাজ-অছি ও দরবারের" অর্থ "রাজ-অছিও তাঁহার পারিষদবর্গ"। দরবার কথাটি এই ভাবেই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১২। সেনাপতিকে দরবারে (বা প্রকাশ্য সভায়) গ্রেপ্তার করিবার যুক্তি, বোধ করি ২১ মার্চ্চ তারিখে সেঙ্গমাইয়ে স্থির হয়, (দলীল ২৮।২৯) এবং গর্ডনের ৭ই মে তারিখের তারের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে কুইণ্টন যে কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠিক জানিতাম না।

১৩। গ্রিমউড, সেনাপতিকে স্থানান্তরিত ও গ্রেপ্তার করার বিরোধী ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৪। কুইণ্টনের প্রস্তাবিত কার্য্যপদ্ধতির দোষ গুণ বিচার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সেনাপতির নির্ব্বাসন-আদেশ সহ আমাদের অন্যান্য হুকুম, প্রকাশ্য দরবারে ব্যক্ত করা, কোনরূপে অনিয়মিত বা অসঙ্গত হইত না। সহজ অবস্থায়, এইরূপ করাই উচিত ও সঙ্গত হইত। এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করিবার সময় ও পদ্ধতির কথা কিছুই উঠিত না। কারণ যাহাকে নির্ব্বাসন করিতে হইবে, সে গভর্ণমেণ্টের হুকুম প্রকাশ হইবার সময় হইতেই, আপনাকে কুইণ্টনের অনুগ্রহাধীন বলিয়া মনে করিত।

১৫। এইরূপ হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ সম্ভাবনা এত অল্প যে, দরবারে গ্রেপ্তার করিবার বিবরণ অধিক লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাচ এই কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সাণ্ডিম্যানের অহ্বান অনুসারে খেজের নায়ক উপস্থিত হইলে, সাণ্ডিম্যান তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। ইহা অতি অল্প দিনের ঘটনা। ১৮৭৯ সালে, জেনারেল রবার্টস, আড়ম্বরের সহিত (আফগানিস্থানে)

বেলাহিসারে প্রবেশ করেন এবং প্রধান ব্যক্তিগণকে একত্রিত করিবার জন্য একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এরূপ করিবার পর তিনি প্রধান মন্ত্রীদিগকে (আমাদের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া সন্দেহ হওয়ায়) অবগত করেন যে, তাঁহাদিগকে আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে। এ সকল স্থলে, তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিরই মনে বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা আদৌ উদয় হয় নাই।

১৬শ। ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত যে, মণিপুরের প্রস্তাবিত দরবারটি, সমকক্ষদের মন্ত্রণাস্থল কিম্বা আতিথেয়তা প্রদর্শন বা আলাপ-আপ্যায়িতের স্থান নহে। বিসম্বাদিত উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তির প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সেই মজলিস আহুত হইয়াছিল। সেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মহারাজা এবং রাজ-অছি উভয়েই আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন; অধিকন্তু পূর্ব্বাপর প্রথা অনুসারে আমরা তাহা মীমাংসা করিবার অধিকারী এবং তাঁহারা আমাদের বিচারমত চলিতে বাধ্য। রাজ-অছি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আমাদের মীমাংসা শুনিবার জন্য ভ্রাতাগণের সহিত তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। (দলীল ২৫) সেই দরবার অনুষ্ঠানে কোনরূপ ছলনার ভাবই ছিল না। রাজ-অছির মত সেনাপতিও তাহাতে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। দরবারে রাজ-অছিকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করা ও সেনাপতির প্রতি নির্ব্বাসন-আজ্ঞা প্রদান করা হইত। ইতিমধ্যে সাধারণ সভ্যতার সহিত উভয়ের প্রতি ব্যবহার করা কুইণ্টনের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছিল। সেনাপতিকে দেশান্তরিত করা হইত বটে; কিন্তু সেই নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞার মুখ্য কারণ কোন সামাজিক অপরাধ নহে—রাজনৈতিক দুর্ব্যবহার মাত্র।

১৭। সেনাপতিকে গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিষয় পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া এবং সহজে বশীভূত না হইলে, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করা হইবে, ইত্যাদি স্পষ্ট জানান কুইণ্টনের উচিত ছিল— এইরূপই বলা, আর সেনাপতি ভয়ানক উগ্রস্বভাবের লোক এবং গোলযোগ বাধাইতে পারেন বলিয়া, তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতে এবং অনর্থ ঘটাইবার আয়োজন করিবার বিশেষ সুবিধা তাঁহাকে দিতে কুইণ্টন বাধ্য ছিলেন—এরূপ বলাও, প্রকৃত প্রস্তাবে সমান কথা। সেনাপতি আমাদের হুকুম অমান্য না করিলে, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজনই হইত না। আমাদের যে প্রভুত্বের কথা, পরে সেনাপতি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (দলীল ২৭) সেই সর্ব্বপ্রধান রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে, তিনি দুর্বিনীত ভাবে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেই কেবল, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করা হইত।

১৮। দরবারের মধ্যে, কি জন্য কুইণ্টন গ্রেপ্তার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ তিনি, আমাদের হুকুম যথারীতি প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কুইণ্টন যে বক্তৃতা করিতেন, তাহার (মণিপুরী ভাষায়) অনুবাদ সাঙ্গ হইবার জন্য, দরবার বসিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে এরূপ ধারণারই সমর্থন করিতেছে। সাক্ষাতের জন্য গোপনে ডাকাইয়া, অপেক্ষাকৃত সহজে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা যাইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা উচিত বলিয়া সম্ভবতঃ কুইণ্টনের মনে হয় নাই। সে যাহা হউক, কুইণ্টনের কার্য্যে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার লেশ মাত্রও ছিল না।

১৯। কুইণ্টন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিলে, তাহা কঠিন ছিল না। মিত্রভাবে কথাবার্ত্তা দ্বারা, সেনাপতির মনের সকল সন্দেহ

দূর করিয়া তিনি বিশ্বস্তভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কুইণ্টন তাঁহাকে অনায়াসেই গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন।

২০। প্রস্তাবিত দরবারটি যে কিরূপ ধরণের, তাহা ভালরূপে বুঝিতে না পারায় প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে হইতে পারে। কতকগুলি আনুষঙ্গিক ঘটনায় (যাহার জন্য কুইণ্টন দায়ী নহেন) সেই ধারণা দ্বিতীয়তঃ আবার পরিবর্দ্ধিত হয়। দৃষ্টান্ত—গ্রিমউডের নিকট গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রেরিত হইবার পরেও তিনি এবং সিম্‌সন সেনাপতির সহিত শিকার করিতে গিয়াছিলেন।

২১। আমি কুইণ্টনকে মুখে বলিয়া ও পত্র দ্বারা সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, যেন তিনি প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান। এই পর্য্যন্ত যে সকল কাগজ পত্র পাইয়াছি, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, কুইণ্টনের নিজের এবং আসামের ভার-প্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারীগণের মতে, যে রক্ষক সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাই তাৎকালিক সঙ্গত ও সম্ভাবিত প্রতিরোধকতা নিবারণের পক্ষে, যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল।

(দলীল ২৬)

২২। পূর্ব্বোক্ত বিষয় গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—মণিপুরের বিসম্বাদিত উত্তরাধিকার স্বত্ব মীমাংসা করা আমাদের কর্ত্তব্য ছিল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের মতানুসারে, মহারাজাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্ত্তে যুবরাজকে মণিপুরাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেনাপতি অতি মন্দ ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক, তিনিই মহারাজ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালিত করিয়াছিলেন। এজন্য আমরা ধার্য্য করিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে রাজ্য-ছাড়া করিতেই হইবে। আমরা তাঁহার নির্ব্বাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই স্থির করি নাই এবং কুইণ্টন যে তাঁহাকে দরবারের মধ্যে গ্রেপ্তার করিবার

সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জানিতাম না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ভারত গভর্ণমেণ্টের হুকুম (সেনাপতির নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা সহ) প্রকাশ করিবার জন্য দরবারই উপযুক্ত স্থান। সেনাপতি আমাদের অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যের প্রজা—তিনি আমাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য। তিনি তদনুসারে আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে, সেই দরবারে সেই সময়েই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার কুইণ্টন যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস-ঘাতকতার আভাস মাত্রও আমরা দেখিতে পাই না। রক্ষক সম্বন্ধে কুইণ্টনকে আমরা প্রচুর সৈন্য লইয়া যাইতে বলিয়াছিলাম ; এবং তিনি নিজে ও সমর বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারীরা যেরূপ আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গে লইয়াছিলেন।”

---

[৩৩]

পত্র (গোপনীয়)—নং ৩৫—২৪শে জুলাই ; ১৮৯১ সাল।

লণ্ডন, ইণ্ডিয়া আফিস হইতে—মহা সম্মানিত, সকাউন্সিল ভারত-বর্ষের গভর্ণর-জেনারেল্ বাহাদুরকে।

[মণিপুর সম্বন্ধে, ভারত গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, —মহামান্যা মহারাণীর (খাস বিলাতী) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার অনুমোদন।]

“১। আপনার গভর্ণমেণ্টের, বিগত ৪ঠা মার্চ্চের ৩৬ নং (গোপনীয়) পত্র আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। এবং তল্লিখিত বিষয় লইয়া পার্লিয়ামেণ্টের (হাউস্ অফ্ লর্ডস্ ও

হাউস্ অফ্ কমন্স) উভয় বিভাগেই তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ হইয়াছে। মণিপুর ব্যাপারে আপনার কার্য্য সম্বন্ধে, আমার মত প্রকাশ করিবার এখন উপযুক্ত সময় হইয়াছে।

২। আপনার গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ও যে হুকুম দিয়াছেন, আপাততঃ আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব। আপনার সেই সকল আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের—কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে—আপনি মণিপুরে যে অনুসন্ধান সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মত ও তদুপরি আপনার আদেশ ইত্যাদির বিবরণ না পাওয়া পর্য্যন্ত—আমি কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারি না।

৩। বিগত ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দুইজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার আকস্মিক অভ্যুত্থানে ভীত হইয়া রাজবাটী ছাড়িয়া মহারাজা পলায়ন করেন,—সেনাপতি প্রাসাদ ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি অধিকার করিয়া, মহারাজের আক্রমণ-বিরুদ্ধে যে সমস্ত রক্ষার বন্দোবস্ত করেন, —মহারাজা ভ্রাতাগণের সহিত বিরোধ করিতে নিজে অক্ষম ভাবেন এবং পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ গ্রিমউডের এবং তাঁহার মন্ত্রীগণের উপদেশের বিরুদ্ধে রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া, কোন তীর্থস্থানে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

৪। ইহাতে, ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ (যিনি বিপ্লবের সময় অনুপস্থিত ছিলেন) রাজ্যাধিকার করেন। ইংরাজ রাজত্বে পৌঁছিয়া, মহারাজ শূরচন্দ্র স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিলেন এবং একখানি আবেদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ ও মণিপুর পুনরধিকার করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, আসামের চিফ-কমিশনারকে তারের সংবাদ প্রেরণ

করিলেন। মিঃ কুইণ্টন তৎপূর্ব্বেই, তারযোগে, সমস্ত সংবাদ আপনাকে অবগত করিয়াছিলেন; এবং কেবল আপনার মঞ্জুরির অপেক্ষা রাখিয়া তিনি যে, যুবরাজকে রাজ-অছি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, একথাও জানাইয়াছিলেন। তিনি ৯ই অক্টোবর তারিখে আপনাকে অনুরোধ করেন যে, মহারাজের আবেদন না পাওয়া পর্য্যন্ত, যেন যুবরাজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন হুকুম না দেওয়া হয়।

৫। মহারাজের আবেদন নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি মিঃ কুইণ্টনের নিকট পাঠান হয়; এবং পলিটিকেল এজেণ্ট ও মিঃ কুইণ্টনের মন্তব্য সহ তাহা জানুয়ারির পূর্ব্বে আপনার নিকট প্রদর্শিত হয় নাই। এ বিলম্বের জন্য আপনার গভর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন। তথাচ ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এইরূপে এবং পরে চিফ-কমিশনারের সহিত যুক্তি পরামর্শ জন্য কালক্ষেপের ফলে, মণিপুর রাজ্যসংক্রান্ত যে নূতন ব্যবস্থা তৎকালে অল্প সময়ের জন্য স্বীকার করিয়া লওয়া গিয়াছিল, তাহা অবিবাদে ছয় মাস কাল চলিল।

৬। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে, মিঃ কুইণ্টন যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে প্রধানতঃ কেবল মহারাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে কথা থাকে। তিনি, মিঃ গ্রিমউডের মতানুসারে সুপারিস করেন যে, মহারাজকে পুনঃ স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে—তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া যুবরাজকে স্বীকার করা গভর্ণমেণ্টের উচিত। রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করা অন্যায় হইয়াছিল, এইরূপ অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা ভিন্ন সেনাপতি বা বিদ্রোহের অন্যান্য নেতৃগণের আচরণ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্যই তাঁহার রিপোর্টে নাই।

৭। ২৪শে জানুয়ারি তারিখে, আপনি চিফ-কমিশনারকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাপারের মূল কথাগুলির পুনরুল্লেখ ও

মিঃ গ্রিমউডের কার্য্য পদ্ধতির ত্রুটি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেনাপতির উদ্ধত ব্যবহারে আপনি পূর্ব্ব হইতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি দেখাইয়াছেন যে, সেনাপতির কার্য্যের জন্যই বিদ্রোহ সফল হইয়াছিল। এখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মণিপুরের বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুমোদন করিয়া যুবরাজকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, রাজ্যের প্রকৃত শক্তি সেনাপতিরই হস্তে থাকিয়া যাইবে। আপনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মণিপুরে শান্তি রক্ষা বিষয়ে এখন গভর্ণমেণ্টের বিশেষ স্বার্থ থাকায় তাঁহারা সেখানে কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা সহ্য করিতে পারেন না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজা যদি মণিপুরী প্রজাদের নিকট হইতে সঙ্গত-মত পোষকতা পান, তবে তাঁহাকেই পুনঃস্থাপিত করিতে সে সময় আপনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু যাহাই ঘটুক, সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য ছাড়া করা কর্ত্তব্য বলিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ঐরূপ মত কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে আপনি প্রস্তাবিত বিষয় সকলে চিফ-কমিশনারের অভিপ্রায় কি, তাহা ত্বরায় জানিতে চাহিয়াছিলেন।

৮। মিঃ কুইণ্টন ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাঁহার মত প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজা দুর্ব্বল-প্রকৃতি ও রাজ্যশাসনে অক্ষম ব্যক্তি, অতএব তাঁহাকে কোনক্রমেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য নহে—যুবরাজকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে উচিতমত তদন্ত করিয়া, সেনাপতিকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। আপনার সহিত মন্ত্রী সভায় সাক্ষাৎ ও যুক্তি করিবার পরেই তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে স্বীয় মত পুনরায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনিও ২১শে ফেব্রুয়ারির পত্রে, তাঁহাকে এ বিষয়ের শেষ উপদেশ দিয়াছিলেন।

৯। আপনার সেই পত্রের ভাব এইরূপ ;—"সেনাপতি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ না করিয়া, যদি তিনি মণিপুরে থাকিতে পান, তবে প্রকৃত রাজশক্তি তাঁহারই হস্তগত থাকিয়া যাইবে।" গভর্ণমেণ্ট সে প্রকার বন্দোবস্তে মত দিতে পারেন না ; কেননা, তাহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সুখ্যাতি হইবে না এবং মণিপুর রাজ্যের প্রজাদের পক্ষেও ভাল হইবে না। মহারাজা দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোক— তাঁহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করিয়া, যুবরাজকে মহারাজ বলিয়া স্বীকার করিলে, মণিপুরের পক্ষে ভাল হইবে ; অধিকন্তু তাহাতে ব্রিটিশ স্বার্থ সাধনের বিশেষ সুবিধা হইবে।" আপনি মিঃ কুইণ্টনের এই যুক্তির অনুমোদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেনাপতিকে নির্ব্বাসিত করিবার বিষয়ে আপনার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তেরও স্থিরতা রাখিয়াছিলেন। সেনাপতিকে কোথায় আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত? যাহাতে তিনি বল প্রয়োগ ও প্রতিকুলতাচরণ করিতে না পারেন, অথচ তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হয়, এমন যুক্তি কি? ইত্যাদি বিষয়ের যুক্তিও আপনি চাহিয়াছিলেন। পরিশেষে আপনি চিফ-কমিশনারকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন নিজে মণিপুরে গিয়া, গভর্ণমেণ্টের মীমাংসার কথা, সেখানে ব্যক্ত করেন এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কা না করিলেও যেন প্রচুর সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান।

১০। উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত বিভাগের সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত যুক্তি মতে, কুইণ্টন, গোলাঘাট হইতে ৪০০ রক্ষী সৈন্য লইয়া যাইবার যুক্তি স্থির করেন। কাছাড় হইতে আরও ২০০ শত সৈন্য আনাইবার কথা ধার্য্য থাকে। কুইণ্টন ১৮ই মার্চ্চ তারিখে, আপনাকে তারযোগে সংবাদ দেন যে, তিনি পৌঁছিয়াই, রাজ-অছি ও দরবারকে তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন; তাহাতে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৫শে মার্চ্চ তারিখে লইয়া আসিবেন। আপনি ইতিপূর্ব্বেই ভূতপূর্ব্ব মহারাজকে জানাইয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি অতীত বিদ্রোহের জন্য, সাক্ষাৎভাবে দায়ী ও দোষী হইয়াছেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া, যুবরাজকেই মহারাজা বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য বলিয়া, আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখন কুইণ্টনের প্রস্তাবেও আপনি সম্মতি দিলেন।

১১। ভূতপূর্ব্ব মহারাজকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করা হইবার পরে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের আছে কিনা, এরূপ কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের সাধারণ আশ্রিত রাজ্যসমূহের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার যে গভর্ণমেণ্টের আছে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করাও যে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বস্বীকার্য্য কথা। আবার এ কথা বিশেষ রূপেই মণিপুর সম্বন্ধে খাটে; কেননা আমাদের মধ্যস্থতা ও অনুগ্রহেই মণিপুরের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান। ১৮৫১ সালে, "বর্ত্তমান রাজার পোষকতা করিতে এবং যে কেহ তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকে শাস্তি দিতে" গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে বাক্যদান করেন। এবং সেই সময়ের পূর্ব্বে এবং তাহার পরেও—এমন কি মহারাজা শূরচন্দ্রের রাজত্ব কালেও—গভর্ণমেণ্ট যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বলপূর্ব্বক দমন করিয়াছেন, এবং বিদ্রোহী রাজকুমারদিগকে, ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে মণিপুর হইতে নিরাপদ-জনক দূর স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তে মণিপুরের ইতিহাস পূর্ণ।

১২। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে, বলপূর্ব্বক মহারাজাকে যদি মণিপুর সিংহাসনে, আপনার গভর্ণমেণ্ট পুনঃস্থাপিত করিতেন, তাহা

হইলে ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যই করা হইত। তিনি ত্বরায় পলাইয়া না আসিলে, বোধ হয়, তাহাই হইত। তাহার পর অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল; স্থানীয় (ইংরাজ) কর্ম্মচারীরাও, রাজবিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন: তথাচ আপনি যখন ভূতপূর্ব্ব মহারাজার দরখাস্ত পাইলেন, তখন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মীমাংসা বিষয়ে প্রধান রাজশক্তির ক্ষমতা ও অধিকার বজায় রাখার পক্ষে, আপনি ঔদাসীন্য দেখাইলে, আমার মতে, উচিত কার্য্য করা হইত না। মণিপুরে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি আছে এবং সেনাপতির যেরূপ স্বভাব, তাহাতে তাঁহাকে শাস্তি না দিলে, বারম্বার সেইরূপ বিভ্রাট ঘটিতে পারিত. অতএব সেই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ করা উচিত তো ছিলই, অধিকন্তু এই কয় বৎসর মধ্যে মণিপুরও তদধীনস্থ জাতি সকলের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাপেক্ষা যেরূপ অধিকতর নৈকট্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে সেখানে বিশৃঙ্খলতা ঘটিলে, এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা কোনমতেই চলে না। অতএব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষার জন্যও আপনার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন ছিল। সে পক্ষে ভারতের অন্যান্য আশ্রিত রাজাদের স্বার্থবিবেচনাও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ। কেননা, সেইরূপ গৃহবিবাদ জনিত বিদ্রোহ বিষয়ে আপনি উদাসীন থাকিলে, সকল রাজাই স্ব স্ব প্রভুত্বের স্থায়িত্ব বিষয়ে বড়ই সন্দিহান হইতেন।

১৩। হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তি, আপনার গভর্ণমেণ্ট যে ঠিক করিয়াছিলেন, সেপক্ষে আমার সন্দেহ নাই। সেনাপতি যেরূপ উশৃঙ্খলতা ও ভয়ানক স্বভাবের জন্য বিখ্যাত, তাহাতে তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত না করিলে, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাধিকারী থাকিতেন

এবং আপনার হস্তক্ষেপ করাতেও কোন ফল হইত না; অতএব তাঁহাকে মণিপুর হইতে সরাইয়া, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে আবদ্ধ রাখিবার সঙ্কল্প যে আপনি করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমশূন্য ও যথার্থই রাজনীতির অনুমোদিত। আমি আপনার এই কার্য্যে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

১৪। মহারাজকে পুনঃস্থাপিত করা বা যুবরাজকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করা উচিত—ইহা মীমাংসা করা (সেনাপতির নির্ব্বাসনের মত) সহজ কথা নয়। আপনার গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রথমে ইচ্ছুক ছিলেন। তদ্বিরুদ্ধে চিফ-কমিশনার দৃঢ়রূপে বিস্তর প্রতিবাদ করায়, আপনি সে মত ত্যাগ করেন। কুইণ্টনের আপত্তি-গুলি আমি উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি; তদনুসারে আপনার গভর্ণমেণ্ট, মত পরিবর্ত্তন করিয়া ভালই করিয়াছেন। ১৮৫১ সালে, গভর্ণমেণ্ট যে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তদনুসারে গভর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তব্য কেবল মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহেতেই সীমাবদ্ধ নয় বটে, কিন্তু মহারাজ শূরচন্দ্রের নিজের শাসন-কর্ত্তৃত্ব-ক্ষমতা ও আমাদের উপদেশ মত চলার উপর সেই কর্ত্তব্য অবশ্যই নির্ভর করিতেছে। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, মহারাজা স্থির চিত্তে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসন পরিত্যাগ করায় এবং আপনার উপদেশমত কার্য্য করিতে প্রস্তুত না থাকায়, আপনি তাঁহার সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। কেবল শান্তি ও সুশাসনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই আপনি তখন বাধ্য ছিলেন। পক্ষান্তরে মহারাজার পূর্ব্ব বিবরণ দৃষ্টে ও স্থানীয় (ইংরাজ) কর্ম্মচারীদের মতানুসারে, স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বার্পিত ক্ষমতা রীতিমত চালনা করিতে জানে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক পুনঃস্থাপিত করা অপেক্ষা, ভাবী

উত্তরাধিকারীকে, মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, অধিক মঙ্গল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

১৫। মহারাজা শূরচন্দ্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করায়, যুবরাজকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিবার সিদ্ধান্ত স্বতঃই হইয়াছিল। তিনি বিদ্রোহে যোগ দেন নাই; তিনিই ভাবী উত্তরাধিকারী; তাঁহাকে সক্ষম এবং আমাদের উপদেশমত চলিতে ইচ্ছুক বলিয়া বোধ হইয়াছিল; এবং প্রতিবাদী আর কেহই ছিল না।

১৬। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার গভর্ণমেণ্টের নীতি, মহারাণীর গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেছেন। আপনি সম্মানসূচক রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং করদ রাজাগণকে নিশ্চিন্ত করিবার পক্ষে, তাহাই সবিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। আপনার মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, তদ্ধেতু চিফকমিশনারের বিবেচনার প্রতি নির্ভর করিয়াও আপনি যে ভালই করিয়াছেন, সে পক্ষেও আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

১৭। আর একটি কথা কেবল অবশিষ্ট আছে; সে পক্ষে আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করা অপেক্ষা, সে বিষয়ে আপনার গভর্ণমেণ্ট যে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারেই বিচার করা ভাল। সেনাপতি আত্মসমর্পণ না করিলে, মিঃ কুইণ্টন যে তাঁহাকে দরবারেই গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি। আপনি ১১ই মে তারিখে, আমাকে যে তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ৭ই মে তারিখের গর্ডনের নিকট হইতে তারের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে, আপনি সে বিষয়ের বিশেষ ও বিশ্বাস-

যোগ্য কথা কিছুই শুনেন নাই। তদনুসারে এ বিষয় আমি অতি সাবধানে ভাবিয়া দেখিয়াছি। মিঃ কুইণ্টনের প্রতি যে এজন্য কিছুমাত্রও বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দেওয়া যায় না, সে পক্ষে আমি আপনার সহিত এক মত। কিন্তু (রাজ্যাভিষেকাদি বিবিধ) শুভানুষ্ঠানিক কার্য্যের জন্যই যে দরবার করা হইয়া থাকে ইহাই প্রায় সাধারণের ধারণা; অতএব দরবারে আহ্বান করিয়া যেন কাহাকেও আর গ্রেপ্তার করা না হয়, এবিষয়ে (ভবিষ্যতে) সাবধান হইতে হইবে।

আপনার—ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর)—ক্রস।"

---

[৩৪]

নং ৮২ এ।

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আদালত, মণিপুর।

ভারতসাম্রাজ্ঞী বঃ মণিপুরের যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ।

অভিযোগ।

১। ভারতসাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

২। চারি জন ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীর হত্যায় সহায়তা।

৩। নরহত্যা।

"আমার বিরুদ্ধে তিনটি অতি গুরুতর ও জঘন্য অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমি নিরপরাধী। আমার নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত করিতে হইলে, আমাকে নিজের দুঃখ ও কষ্টের সুদীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করিতে হইবে। এই জন্য আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, আদালত আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি দেখাইবেন; এবং করযোড়ে প্রার্থনা এই যে, বাজে রটনা

উড়ো কথা ও অমূলক গুজবে বিশ্বাস করিয়া, আমার বিরুদ্ধে কোনরূপ কুসংস্কারাপন্ন ও কুধারণা-বশ হইবেন না।

সর্ব্বাগ্রে আমি সবিনয়ে জানাইতেছি যে, আমার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আসামের চিফ-কমিশনার মিষ্টার কুইন্টন ও কর্ণেল স্কীনে প্রভৃতিকে হত্যা করার বিষয়ে আমি যে কোনরূপ সহায়তা করিয়াছি তাহা কিছুমাত্রও প্রতিপন্ন হয় নাই। বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে, যে ছয় জন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রাণনাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিন জন (মিষ্টার গ্রিম-উড, লেঃ সিম্‌সন ও লেঃ ব্র্যাকেন্‌বরি) আমার পরম বন্ধু ছিলেন। দানশীল ও সদাশয় প্রকৃতির লোক, প্রায়ই নরঘাতক হয় না; এবং নিজের বন্ধুগণের প্রাণহানি করাও কোনমতেই সম্ভবপর নহে। এ পক্ষে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণও কিছুই উপস্থিত হয় নাই। অতএব আমার প্রতি নরহত্যা অথবা তাহার সহায়তা দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না।

প্রথম অভিযোগ (অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা) সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে, ব্রিটিশ সৈন্যগণ শেষরাত্রে অতর্কিত ভাবে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা আমার পৈতৃক বাস্তুদেবতা শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমন্দির ভগ্ন ও তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিল। দেবতা জীউয়ের সমস্ত অলঙ্কার লুটিয়া লইল। তাহারা বিনাদোষে আমার কয়েকজন ভৃত্যের প্রাণনাশ ও দাম্মু সর্দ্দার নামক জনৈক মুসলমান মন্ত্রীর পরিবারস্থ সকলকে হত্যা করিয়া তাহার ঘরবাড়ীতে অগ্নি লাগাইয়া জ্বালাইয়া দিল। তৎপূর্ব্বে আমি কিছুমাত্রও অন্যায্য ব্যবহার করি নাই। তথাচ সৈন্যগণ আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য উল্লিখিত রূপ অকার্য্যের

সহিত অকারণ অসহ্য উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল। তাই আমি আত্মরক্ষার্থ অগত্যা অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি অসভ্য, উদ্ধত-স্বভাব, জঙ্গলী জাতির অশিক্ষিত নির্ব্বোধ রাজকুমার—আমি ঐরূপ ভয়ানক অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে যাহা করিয়াছিলাম, তাহা ভারত-সাম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্রোহাচরণ অপরাধ বলিয়া যে কি প্রকারে গণ্য হইতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধিবিবেচনায় অগম্য।

বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখের শোকাবহ ঘটনাবলীর বিবরণ দিবার পূর্ব্বে আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতা মহারাজা শূরচন্দ্র সিংহের রাজসিংহাসন পরিত্যাগের মূল বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ করা আবশ্যক। কেননা এই শেষোক্ত ব্যাপারই পরবর্ত্তী বিপদের মূল হেতু।

মণিপুর রাজবংশে আট ভ্রাতা—তন্মধ্যে মহারাজ ও অপর তিন ভ্রাতা এক মায়ের ও অপর চারি ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন চারি জন বিমাতার গর্ভজাত। প্রথমোক্ত চারি ভ্রাতাই প্রকৃত প্রতিপত্তিশালী—অপর চারি জন নামে মাত্র পদস্থ ছিলেন। ক্ষমতাবান্ ভ্রাতা চতুষ্টয় অপর চারিজনকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের মনোকষ্ট দিবার সুযোগেরও অপ্রতুল ছিল না। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে সচরাচর যেরূপ মনোমালিন্য ও হিংসা জন্মিয়া থাকে, এ পরিবারেও সেইরূপ ছিল। মহারাজের সহোদর তৃতীয় ভ্রাতা এবং আমাদের পরলোকগত পিতাঠাকুর মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহের সন্তানদের মধ্যে জীবিত পঞ্চম পুত্র কুমার পাক্কা সিংহ অপরাবধারক ছিলেন। তাঁহার দুই জন দাস আমার একটি সখের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে শাসন করিয়াছিলাম। সেই হইতে পাক্কা সিংহের আমার সহিত সদ্ভাব নাই।

মণিপুরের পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথামত মহারাজের পরেই যুবরাজ রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ক্ষমতাধারী। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের কর্ত্তৃত্ব করা যুবরাজের কার্য্য। কুলচন্দ্র-ধ্বজ সিংহ ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ ছিলেন এবং নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মহারাজ শূরচন্দ্র "বিচার" নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পাক্কা সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ গ্রিমউড পাক্কা সিংহের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় মহারাজ কৌশলে পাক্কা সিংহকে ঐরূপে উন্নত ও যুবরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহাতে যুবরাজ কুলচন্দ্র অবশ্যই বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

আমাদের পিতার মৃত্যুর সময় সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাজকুমার জিল্লা গম্বা সিংহের বয়স ৯।১০ বৎসর মাত্র ছিল। রাজকীয় কোন পদ বা সম্মান তাঁহাকে প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার বয়স বাড়িয়াছে—আনুষঙ্গিক খরচ পত্র বাড়িয়াছে—কিন্তু মহারাজ শূরচন্দ্র তাঁহার মাসহারা বাড়াইয়া দেন নাই। নানা সময়ে, তাঁহাকে নানারূপে অত্যাচারিত ও অপমানিত করা হইয়াছে। মণিপুর রাজবংশধরগণ বাড়ীর বাহির হইলে বা কোথাও গেলে, শিঙ্গা বাজাইবার রীতি আছে। জিল্লা গম্বা এক দিন বাহিরে যাইবার সময় শিঙ্গা বাজিতেছিল। "এরূপ শিঙ্গা বাজান অপরাধ হইতেছে—মহারাজের অপমান করা হইতেছে" ইত্যাদি রূপ বলিয়া পাক্কা সিংহ তাহা বন্ধ করিলেন। মহারাজও তাহা একবারে রহিত করিবার আদেশ দিলেন। এই প্রচলিত সম্মান ও সম্ভ্রমের চিহ্ন বিলুপ্ত হওয়ায় জিল্লা গম্বার মনে দারুণ কষ্ট হইল। কিন্তু তিনি এই সকল লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতেছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব কুমার দোলারাই হাঞ্জাবা (রাজ্য তত্ত্বাবধারক) অন্যের

সিংহকে আমি বাল্যকাল হইতেই বড় ভাল বাসিতাম। কেবল এই জন্যই পাক্কা সিংহ তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। পাকা সিংহ মহারাজ শূরচন্দ্রকে হঠাৎ মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে, অঙ্গেয় সিংহ গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহারাজও সে বিষয়ের সত্যাসত্যের কোন তদন্ত না করিয়াই একবারে হুকুম দিলেন যে, ২৩ সে সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে অঙ্গেয় সেনা ও জিল্লা গম্বাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরস্ত্র করা হইবে। কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য পাক্কা সেনা গুপ্তভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন এবং সেরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃ-সিংহাসন সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু হওয়াও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইলে যে লোকদেখান বিচার হইত, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি চিরনির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, ইহা নিশ্চয়—ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা উভয়ে একত্রে ২২শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে রাজবাটী আক্রমণ করিলেন এবং বন্দুকাদি চালাইতে লাগিলেন। * * আমি রাজপ্রাসাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রজাবর্গের সম্মিলিত হইবার চিরপ্রচলিত সঙ্কেত ৫টী তোপ দাগা হইয়াছিল। মহারাজার পলায়নের কথা সকলেই বলিতেছিল।

প্রজাগণ তৎক্ষণাৎ রাজবাটীর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে দশ হাজারের অধিক লোক একত্রিত হইল। সকলেই পাক্কা সিংহকে তাঁহার কু-অভিসন্ধির জন্য অভিসম্পাত এবং অঙ্গেয় সিংহকে ক্ষত্রিয়োচিত সাহস ও বিজয়ের জন্য সুখ্যাতি করিতে লাগিল। জগতের অন্যান্য রাজপরিবারেও তো রীতি এই

যে, বিজয়ী ব্যক্তিই রাজসিংহাসন অধিকার ও রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মণিপুর রাজ্যের পদ্ধতি বিশেষরূপেই এই মত। কিন্তু সেই দুই জন রাজকুমার বা আমি—কেহই আমরা রাজা হইতে চাহি নাই, যুবরাজ কুলচন্দ্রকে রাজপাটাধিকারী করিবার যুক্তি ধার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সে রাত্রে যুবরাজকে কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না এবং মহারাজা ও তাঁহার সহোদর তিন ভ্রাতারও কোন সংবাদ জানা গেল না।

২৩ শে সেপ্টেম্বর তারিখে জানা গেল যে, যুবরাজ কুলচন্দ্রধ্বজ-সিংহ কয়েকজন অনুচর সঙ্গে, বিষেণপুরের দিকে গিয়াছেন এবং মহারাজা তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়াছেন। এই সকল বিবরণের উল্লেখ করিয়া এবং যুবরাজকে গদিতে অভিষিক্ত করিবার কথা লিখিয়া আসামের চিফ কমিশনারের নিকট—আমার ১টি, মহারাজের ১টি এবং পলিটিকেল এজেন্টের ১টি—তিনটি তারের সংবাদ পাঠান হইল। পরদিন সমস্ত তারের সংবাদেরই উত্তর পলিটিকেল এজেন্টের নিকট আসিল। তদনুসারে গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সাহেব যুবরাজকে রাজ-অভিষিক্ত, আমাকে যুবরাজ, অঙ্গেয় সিংহকে সেনাপতি, জিল্লা গম্বাকে সামুহাঞ্জাবা (রাজকীয় হস্তীতত্ত্বাবধারক) বলিয়া স্বীকার করিলেন। *

---

* এই দরখাস্তে অনেক নূতন কথা আছে। কতকগুলি ঘটনা ও সময়াদির সহিত আমাদের ইতিহাস বর্ণিত বিবরণের মিল হয় না। আবার ইহাতে কোন কোন বিষয়ের আদৌ উল্লেখ নাই। টিকেন্দ্রজিতের মনস্কামনা-সিদ্ধির জন্য কোন কোন কথা তিনি উল্টা বলিয়াছেন বা জানকী বাবুর লেখার দোষেই এইরূপ হইয়াছে, কিম্বা সত্য কথা এইরূপই কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে, একথা নিশ্চয় যে, সমর সূচনার পর মহারাজা চিফ কমিশনারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা টিকেন্দ্রজিৎ জানিতেন না।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এই সকল ব্যাপার যখন ঘটে, তখন আমি মূত্রকোষে পাথরী রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম এবং রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের ডাক্তার লক্ষ্মণ প্রসাদের চিকিৎসাধীনে ছিলাম। গভর্ণমেণ্ট ভূতপূর্ব্ব মহারাজার একতরফা কথা শুনিয়া এবং মহারাজ কুলচন্দ্রের নিকট কোনরূপ তদন্তই না করিয়া একেবারে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টই তো আমাকে যুবরাজ বলিয়া মঞ্জুর করিয়াছেন। যে ছয় মাস আমি সেই পদে ছিলাম, তাহার মধ্যে এমন কোন অপরাধই করি নাই যে, তজ্জন্য আমাকে উৎপীড়ন সহকারে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করণার্থ সসৈন্যে চিফ কমিশনারকে পাঠান, গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইতে পারে।

হঠাৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে চিফ কমিশনারের মণিপুর আসিবার কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বা পলিটিকেল এজেন্টের নিকট কিছুই জানা যায় নাই; কিন্তু এখানে গুজব উঠিয়াছিল যে, ভূতপূর্ব্ব মহারাজা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চিফ কমিশনারের সহিত আসিতেছেন। শূরচন্দ্র যে তাঁহার সাবেক দলের সহিত পুনরায় মণিপুরে আধিপত্য করিবেন, তাহা কেহই পছন্দ করে নাই; অতএব তাঁহার পুনঃস্থাপনে বাধা দিতে সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পলিটিকেল এজেন্টের সহিত পরামর্শ করা হইল; এবং ধার্য্য হইল যে অকারণ আশঙ্কা না করিয়া (কলিকাতাপ্রবাসী মণিপুরী) গোলাপ সিংহের নিকট হইতে শূরচন্দ্রের সংবাদ জানা হউক। তদনুসারে গোলাপকে একটি তারের সংবাদ পাঠান হইল; তাহার উত্তর আসিল যে, শূরচন্দ্র তখনও কলিকাতাতেই রহিয়াছেন। তৎপরে রাস্তার ধারের আড্ডাস্থান সকল তদারক এবং চিফ কমিশনারকে যথাসাধ্য সকল প্রকারের সাহায্য করিবার জন্য থঙ্গাল জেনারেলকে

মেয় থানা পর্য্যন্ত পাঠান হইল। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিগত ২১শে মার্চ্চ নব-সেনাপতি অঙ্গেয় সিংহ সেঙ্গমাই থানায় গিয়াছিলেন। মেঙ্গমাইস্থ তাম্বু হইতে (২১ শে তারিখে প্রেরিত) চিফ কমিশনারের একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে তিনি "পর দিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রেসিডেন্সিতে দরবার করিবেন—তাহাতে যেন রাজকুমারেরা ও মন্ত্রীরা সকলে উপস্থিত হন।" পূর্ব্ব হইতেই অসময়ে নিয়মাতিরিক্ত সংখ্যক রক্ষক সমভিব্যাহারে কমিশনারের আসার কথা শুনিয়াই মণিপুরের লোকের মনে নানা সন্দেহ হইয়াছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্ব প্রথামত প্রথমে দরবার-গৃহে না হইয়া রেসিডেন্সিতে এবং আসিবামাত্রই (তায় আবার রবিবারে) দরবার করিবার কথায় সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। এই সত্বরতা ও এরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বনের কারণ কি, তাহা মিঃ গ্রিমউডকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজ-অছিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, পরদিনই কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য চিফ কমিশনারকে টামু যাইতে হইবে। এই জন্যই তিনি আসিয়াই দরবারের কার্য্য সমাধা করিবেন। কতকগুলি কুলি ঠিক করিয়া রাখিবার কথাও মিঃ গ্রিমউড বলিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে চিফ কমিশনারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি (প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী) কৈরঙ্কাই নদীতীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের জঙ্গলে নাগারা আগুন লাগাইয়া দেওয়াতে, সেই নদীর কাঠের পুলটিও দৈবাৎ পুড়িয়া গিয়াছিল। এজন্য আর অধিক দূর যাইতে না পারিয়া আমি চিফ কমিশনারের পার হইবার সুবিধার্থ নদীর উপর দিয়া একটি পথ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তৎপরে চিফ কমিশনার ও তাঁহার দলবলের সহিত বেলা ১০ টার সময় রেসিডেন্সিতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ঠিক উপযুক্ত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য রেসিডেন্সির ফটকে গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ে কমিশনার প্রস্তুত না হওয়ায়, আমাকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করাইয়া রাখা হয়। ইহা নিতান্তই সভ্যরীতি-বিরুদ্ধ; আমি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম এবং জ্বলন্ত সূর্য্যোত্তাপে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় বিরক্ত ও দুঃখিত হইলাম। ভিতরে যে সব সাজ সজ্জা ও নড়ন-চড়ন হইতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাইয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য (মুসলমান) দাস্থ সর্দ্দারকে পাঠাইলাম। দাস্থ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, রেসিডেন্সি বাঙ্গালার সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে সশস্ত্র সিপাহীগণ স্থাপিত হইতেছে এবং উচ্চতম সামরিক কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণ সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন। দরবারটি কেবল আমাকেই গ্রেপ্তার করিবার ছলনা জাল মাত্র— আমার মনে পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এখন তাহা বদ্ধমূল হইল। অধিকন্তু, পূর্ব্ব-দিন আমি একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম এবং চিফ কমিশনারের অভ্যর্থনার্থ নদীতীর পর্য্যন্ত যাতায়াতে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সুতরাং আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি সন্ধ্যার সময় শুনিলাম যে, মিঃ গ্রিমউড ও লেঃ সিম্‌সন আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন; আমি অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় তাঁহারা আমার বাড়ীতে আসিয়া আমাকে পীড়িত ও শয্যাগত দেখিলেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, চিফ কমিশনার গভর্ণমেণ্ট হইতে যে হুকুম আনিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান মহারাজার রাজপদ মঞ্জুর হইল; কিন্তু

গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন সময় পর্য্যন্ত আমাকে ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি, এমন কথা বলিলাম। কেবল শরীর সুস্থ ও সকল আয়োজন স্থির করিতে কিছু দিন সময় চাহিলাম। সন্ধ্যার সময় মহারাজা নিজ মহলে একটি দরবার করেন, তাহাতে আমাকে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়াতে আমি একথানি ডুলি করিয়া গেলাম। সেই দরবারে যাবতীয় মন্ত্রী ও প্রধান ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। চিফ কমিশনারের নিকট হইতে যে পত্রথানি আসিয়াছিল, তাহার ভাব (অর্থাৎ মহারাজার রাজপদ মঞ্জুর ও আমার নির্ব্বাসনের কথা) আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল, আমি পূর্ব্বে মিঃ গ্রিমউড ও লেঃ সিম্পসনকে যেমন বলিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপই বলিলাম। চিফ কমিশনারের পত্রের তদনুরূপ উত্তর তথনই পাঠান হইল।

২৪শে মার্চ্চ শেষ রাত্রে হঠাৎ ব্রিটিশ সৈন্যেরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজবাটীতে প্রবেশ করিল এবং আমার বাড়ীর উপর গুলি চালাইতে লাগিল। আমি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রাসাদের ভিতর মহলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। ব্রিটিশ সৈন্যেরা আমার কতকগুলি ভৃত্য এবং স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে হত্যা করিল; আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; আমার বাস্তুদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমন্দির অপবিত্র করিয়া তাঁহার গহনাদি লুটিয়া লইল এবং দেওয়ান দাসু সর্দ্দার গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিল বলিয়া তাহার সমস্ত পরিবারকে বিনাশ করিয়া তাহার ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিল। তদ্বাদে তাহারা কতকগুলি মণিপুরী (স্ত্রী, বালক, বালিকা) প্রজার প্রাণনাশ করিল এবং দেবমূর্ত্তি ও গবাদির সহিত ১২ থানি ঘর জ্বালাইয়া দিল।

সুতরাং কোন বিশেষ নেতার আজ্ঞা ব্যতীতও উত্তেজিত মণিপুরীরা আপনা হইতেই রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

যুদ্ধ সমস্ত দিনই চলিল। সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ (বিগেল) রণ-শিঙ্গা "সমর স্থগিতের রব" করিবামাত্রই উভয় পক্ষই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইল। তৎপরে চিফ কমিশনারের একখানি পত্র পাওয়া গেল। সেখানি ইংরাজীতে লিখিত। তর্জ্জমা করিবার জন্য রাজ-অফিস কেরাণীর নিকট পাঠান হইল। কিন্তু সেই কেরাণী তখন অনেক দূরে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া চিঠি খানি অনুবাদ করাইতে অনেক সময় লাগিল। ওদিকে পত্রের উত্তর পাইবার জন্য ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হইয়াছিলেন; মিঃ গ্রিমউড বাহির হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন। কথা ধার্য্য হইল যে, রাজবাটীর দরবার গৃহে আসিয়া তাঁহারা একটি সভা করিবেন। মিঃ কুইন্টন, মিঃ গ্রিমউড়, মেঃ সিম্‌সন এবং আরও দুই জন (ইংরাজ) ভদ্রলোক আমার এবং অন্যের মিত্রতার সহিত দরবারে বসিলেন।

যথারীতি তোপধ্বনি, সম্মান প্রদর্শন ও হস্তামর্ষণের পর, আমি বিবী গ্রিমউডের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি নিরাপদে আছেন। আমি তৎপরে বলিলাম যে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, চিফ কমিশনার তেমন নির্দ্দয় ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপর যে বন্ধুতা ও সদ্ভাব ছিল, তাহা তিনি নষ্ট করিয়াছেন। আমি একথাও প্রকাশ করিলাম যে, ব্রিটিশ পক্ষ অগ্রে শত্রুতাচরণ করায়, (মণিপুরী সৈন্যাদি) সকল লোক বড়ই উত্তেজিত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা প্রায় আমার সাধ্যাতীত হইয়াছে। অতএব সুনিয়ম স্থাপনান্তে আর বৈরিতাচরণ না করাই উচিত। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরাও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা কোহিমা চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং আর

কোন পক্ষই যেন শত্রুতাচরণ না করে। আমি বলিলাম যে, ব্রিটিশ সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করুক (সে সমস্ত নিজের কুলির দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে কোহিমায় পৌঁছিয়া দিবার প্রতিজ্ঞাও করিলাম), নচেৎ কেবল মুখের কথা আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কমিশনার বন্ধুতার ভাণ করিয়া, পুনরায় আক্রমণের বন্দোবস্ত জন্য, কেবল সময় পাইবার যোগাড় করিতেছিলেন; তিনি নানারূপ চাতুরী খেলিতেছিলেন—টামু যাইবেন বলিয়াছিলেন—নাচ দিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাকে দরবারে আহ্বান এবং শেষে কোহিমা যাইবার কথা, এ সমস্তই আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য ছলনা মাত্র। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা আমার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, আমি অঙ্গেয় মিঙ্গতোকে তাঁহাদের নিকট রাখিয়া, তোপগারদে মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। আমি তোপগারদে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই দরবার-হলের নিকট একটি হল্লা শুনিতে পাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা দরবার হলের বাহিরে আছেন, বহুলোক তাঁহাদিগকে ঘিরিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গেয় মিঙ্গতো জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তখন ভিড় কমাইবার আদেশ দিলাম। মিঃ গ্রিমউড ও লেঃ সিম্‌সনকে দলের মধ্যে না পাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে মিঃ গ্রিমউড মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং লেঃ সিম্‌সন আহত হইয়া ধাপের নীচে শুইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহাকে ধরিয়া দরবার হলের মধ্যে লইয়া গেলাম এবং হিন্দীভাষাভিজ্ঞ যাত্রাসিংহকে নিকটে দেখিয়া সাহেবদের সেবা শুশ্রূষা করিতে এবং সমস্ত গোলযোগ না চুকিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বাহিরে না যাইতে দিতে বলিলাম। তৎপরে আমি প্রাসাদের ভিতর দিকের প্রাচীর দেখিতে গেলাম এবং সেখানে যে সকল লোক যুদ্ধ করিবার জন্য স্থাপিত ছিল, তাহাদিগকে তৎকার্য্য করিতে নিষেধ করিলাম। ইহার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দক্ষিণ দ্বারের নিকট যাত্রাসিংহ ও উসর্ব্বা আমাকে ডাকিয়া বলিল যে, থঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছেন। আমি অত্যন্ত

বিস্মিত হইয়া বলিলাম "তাহা হইতে পারে না। চল, সেই বৃদ্ধের নিকট গিয়া পরামর্শ করি।" এই শুনিয়া তাহারা দ্রুতপদে তোপ-গারদের দিকে গেল। আমি গিয়া বলিলাম "ইপু! (ঠাকুরদাদা) আপনি কি এমন ভয়ানক হুকুম দিয়াছেন?" তিনি বলিলেন—"হাঁ"। আমি তাঁহাকে সেরূপ করা যে কত অন্যায়, তাহা বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দিলাম। তিনি আমার কথায় সম্মত হইলেন, এরূপ আমি বুঝিলাম। আমি পীড়িত ছিলাম, অধিকন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে, বিছানায় বিশ্রাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি এইরূপে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রিত ছিলাম; কামানের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আমার নিদ্রিতাবস্থায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আর একটি ভয়ানক কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, থঙ্গাল সেই সময়ে সাহেবদের হত্যার হুকুম দিয়াছেন। থঙ্গাল তখন সেখানে ছিলেন না, আমি প্রগাঢ় চিন্তায় ও ভয়ে আকুল হইয়া রহিলাম। তৎপরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, ব্রিটিশ সৈন্যেরা রেসিডেন্সি ছাড়িয়া কাছাড়ের দিকে গিয়াছে এবং মণিপুরীগণ গভর্ণমেণ্টের ধনাগার লুটিয়া রেসিডেন্সি জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ মহা-রাজাকে সমস্ত কথা জানাইলাম; তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে তিরস্কার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে থঙ্গাল, মহারাজ সকাশে আনীত হইয়া ভয়ানকরূপে তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন যে, রাষ্ট্র করিয়া দিবেন যে সাহেবেরা যুদ্ধে হত হইয়াছেন।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, যে সকল ব্রিটিশ সিপাহী ও প্রজা বন্দীকৃত হইয়া আনীত হইয়াছিল, আমি সে সমস্তকে মুক্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে খাদ্য, বস্ত্র ও খরচ এবং রীতিমত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, যে, যেখানে যাইতে চাহিয়াছে, সেইখানেই পাঠাইয়া দিয়াছি। আমি উত্তেজিত রণোন্মত্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীদের ক্রোধ ভয়ে কিছু দিন গুপ্তভাবে থাকিয়া, আবার এখন নিজ ইচ্ছায় ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।"

[সর্ব্বশেষে নাগাযুদ্ধে তিনি ইংরাজের যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক টিকেন্দ্রজিৎ দয়া ও সুবিচার ভিক্ষা করিয়াছেন।]

[৩৫]

কলিকাতা, ২৭শে জুলাই, ১৮৯১ সাল।

মহারাজা কুলচন্দ্র ও যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের যুক্তি প্রদর্শন।*

১। নিতান্ত অধমতম ব্রিটিশ প্রজারও অধিকার আছে যে, তাহার বিরুদ্ধে যতই গুরুতর ও জঘন্য অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত হউক, সে তাহার বিচারকালে উকীল ব্যারিষ্টারের দ্বারা নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। ব্রিটিশ সুবিচারের মূলতত্ত্বই এই যে, সকল কথা না শুনিয়া কাহাকেও কোনরূপে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। কিন্তু মণিপুরের মহারাজ ও যুবরাজের আপীলে ব্যারিষ্টার দিবার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে। কেবল লিখিত হেতুবাদ দাখিল করিবার অনুমতি মাত্র গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন।

২। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক, ও কথা গুলি একবারে লিখিয়া দেওয়ায়, প্রভেদ বিস্তর। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারকের মনে নানা কু-ধারণা এবং আইন ঘটিত বা ঘটনা বিষয়ক নানা ভ্রম ও কুসংস্কার থাকিতে বা জন্মিতে পারে; তর্ক বিতর্কে তাহা ন্যায্য-পক্ষে সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু কি কথা, কি সন্দেহ বা কিরূপ ধরণের প্রশ্ন বিচারকের মনে উঠিবে, তাহা জানা বা অনুমান করা উকীল বা ব্যারিষ্টারের পক্ষে একবারে অসম্ভব, সুতরাং লিখিত হেতুবাদ কোনমতেই প্রচুর ও সন্তোষজনক হইতে পারে না।

৩। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুবিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ বিচারকেরাও প্রথমে যেরূপ সংস্কার ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিচার আরম্ভ

* ইহার সহিত ২১।২২।২৩।২৪ দলীল লিখিত দরখাস্ত একত্রে লাটসাহেবে সীমলা-শৈলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আমরা কেবল সংক্ষিপ্তসার দিলাম।

করেন, উকীল ব্যারিষ্টারের যুক্তি, তর্ক শুনিয়া ক্রমে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট সেইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যারিষ্টারের কথা শুনিতে অস্বীকার করাতে মণিপুর-রাজকুমারেরা সেই সকল মহা সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

৪। মণিপুরের মহারাজ, যুবরাজ প্রভৃতি ইংরাজের প্রজা নহেন —সুতরাং কোনরূপ ব্রিটিশ আদালতেই তাঁহাদের বিচার হইতে পারে না। মণিপুরে যেরূপ বিশেষ আদালতে তাঁহাদের প্রথম বিচার হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের বা ব্রিটিশ ভারতের আইন-সভার কোন বিধান মতে স্থাপিত হয় নাই। সেটি কেবল বিজয়ী গভর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে বিজিতদের অপরাধের বিচারের জন্য নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অধিকন্তু যে গভর্ণমেণ্ট অভিযোক্তা, সেই অভিযোক্তার কর্ম্মচারীরাই প্রথম বিচারক এবং এক্ষণে সেই গভর্ণমেণ্টই আপীলের আদালত।

৫। যে দুই জন সামরিক এবং একজন পলিটিকেল কর্ম্মচারী লইয়া মণিপুরের বিশেষ আদালতটী গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কাহারই আইন ও বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুমাত্রও শিক্ষা নাই। তাঁহারা আসামীদিগকে যেরূপ জেরা করিয়াছিলেন তাহা ব্রিটিশ ন্যায়-বিচারের নিতান্ত বিরুদ্ধ। এখানকার কোন জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট সেরূপ বিচার করিলে, হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপেই ভৎর্সিত হইতেন। অধিকন্তু তাঁহাদিগকে কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার নিয়োগের সুবিধা দেওয়া হয় নাই। বিচার আরম্ভের দুই দিন পরে, বাবু জানকীনাথ বসাককে যুবরাজ পক্ষে তদ্বিরকারক নিযুক্ত করা হয়। জানকী বাবু একজন ব্যবসায়ী লোক মাত্র—আইন আদালতের কিছুই জানেন না। তিনি সেখানে থাকায়, মণিপুরী ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং ইংরাজী ভাষা কিছু কিছু জানায়, মোকদ্দমায় যে সকল কথা ইংরাজীতে হইয়াছিল, তাহা মণিপুরীতে তর্জ্জমা করিয়া যুবরাজকে বুঝাইয়া দিবার সহকারী স্বরূপ হইয়াছিলেন। জানকী বাবুর ইংরাজী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকাতে যুবরাজের পক্ষে তাঁহার

লিখিত (ইংরাজী ভাষায়) দরখাস্ত, একজন দায়িত্বহীন ইংরাজ কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া, নানা গোলযোগ ঘটিয়াছে।

(দলীল ২৩।২৪ দেখুন।)

৬। অভিযোক্তার পক্ষ যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিয়াছেন, প্রায় সেই পর্য্যন্তই প্রমাণাদি লইয়াছেন। আসামীর পক্ষে কোনই উপযুক্ত লোক না থাকায় এবং ভাল জেরা সওয়াল না হওয়ায়, সাক্ষীগণের মুখে সকল কথা প্রকাশ পায় নাই। ইহা এবং যে সকল লোক বিচারক ছিলেন, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনায় এমত বলা যাইতে পারে না যে, রাজকুমারদের বিচার ন্যায্যরূপে ও পক্ষপাতশূন্যভাবে হইয়াছে।

মহারাজ কুলচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

৭। মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে মহারাজ কুলচন্দ্রের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে "মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা" সম্বন্ধে যে ধারাটি আছে, তদনুসারে এই অভিযোগটি গঠিত। কিন্তু সেই বিধানের মর্ম্মানুসারে কেবল ইংরাজের প্রজা বা ইংরাজের অধীন-ভাবাপন্ন ব্যক্তিরই এই অপরাধ হইতে পারে। ব্রিটিশ রাজ্যসীমার বাহিরে, ভিন্ন রাজ্যের লোক যতই কেন যুদ্ধ করুক না, তাহাকে এই আইনমত অপরাধী বলিয়া কেহই গণ্য করেন না। আইনের অভিপ্রায়ও সেরূপ নহে।

৮। মণিপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত নহে এবং মহারাজা কুলচন্দ্র ব্রিটিশ প্রজা বা ইংরাজরাজ্যপ্রবাসী ছিলেন না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ শূরচন্দ্রের দেশত্যাগের পর, মণিপুরের দরবার অর্থাৎ রাজসভা ও রাজ্যের প্রজা সাধারণ যথারীতি অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহাকে সেই দেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

৯। (বিগত ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) ইংরাজেরা কস্মিনকালে মণিপুর পরাজয় করেন নাই। মণিপুর রাজ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোনরূপ

করপ্রদান করে না। এ রাজ্যের আইন আদালত সমস্তই পৃথক—মহারাজা স্বরাজ্যের প্রজাদের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। তত্রত্য কোনরূপ রাজকার্য্যই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন নহে।

১০। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য মণিপুরের সহিত ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সন্ধি করিয়াছেন বটে। (দলীল ১।২) গভর্ণমেণ্ট মণিপুরকে সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়াছেন এবং নিজেও অনেকবার তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তথাচ পরস্পরের মধ্যে এমন সন্ধি কিছুই হয় নাই, যাহাতে মণিপুর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট কোনরূপে অধীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইংরাজ সময় বিশেষে মণিপুরকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন উপদেশাদি দিয়া আসিতেছেন কিনা, তাহারও প্রমাণ নাই। কিন্তু মণিপুরের আভ্যন্তরীণ রাজকার্য্যে কখনও সেরূপ হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিলেও, মণিপুরের স্বাধীনতা তিলমাত্রও কখনই নষ্ট হয় নাই। মণিপুর ক্ষুদ্র রাজ্য—সুতরাং দুর্ব্বল ; পক্ষান্তরে ব্রিটিশ ভারত-গভর্ণমেণ্ট প্রবল পরাক্রমশালী বটে। কিন্তু তাই বলিয়া মণিপুর তো ইংরাজের অধীন রাজ্য হইতে পারে না।

১১। ভারত-গভর্ণমেণ্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের যে দুইটি সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে শেষোক্তের অধীনতার কথাও নাই। ইউরোপীয় অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্যসমূহের অপেক্ষা মণিপুরের মর্য্যাদা কোনমতেই কম নহে—বরং নিশ্চয়ই বেশী। অতএব সাদৃশ্যময় দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেইরূপ একটি রাজ্যসম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত ব্যাপার সকলে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। ১৮১৫ সালে পারিসের সন্ধি অনুসারে সেই রাজ্যটি ব্রিটিশ আশ্রয়াধীন হয়। সেই সন্ধির সর্ত্ত এইরূপ ;—

(ক) এই রাজ্যটি ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সম্পূর্ণ রক্ষণাধীনে থাকিবে—অন্য কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(খ) ইংলণ্ডের রাজা একজন (লর্ড হাই কমিশনার) সর্ব্বোচ্চ

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং ব্রিটনেশ্বরের সম্মতি অনুসারে, আইওনিয়ান রাজ্যের ব্যবস্থা-সভার দ্বারা সমস্ত আইনকানুন প্রস্তুত ও প্রচলিত হইবে।

(গ) আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য এবং নিজের প্রভুত্ব রক্ষার্থ ইংলণ্ডেশ্বর রাজ্যের কেল্লা সমূহ ও অন্যান্য স্থান দখল ও সেই সমস্তে নিজের বিবেচনামত সৈন্য স্থাপন ও অন্যান্য সামরিক বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন এবং রাজ্যের সমস্ত সৈন্যসামন্ত তাঁহারই নিজের সেনাপতির আজ্ঞাধীন হইবে।

(ঘ) আইওনিয়ান দ্বীপ-পুঞ্জের রাজ-পতাকায় যেরূপ চিত্র বর্ণাদি প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ইংলণ্ডেশ্বর নিজের কর্ত্তৃত্বের ও আশ্রয়-দানের নিদর্শন স্বরূপ যে সকল চিহ্নাদি মঞ্জুর করিবেন, সেই সমস্ত ভবিষ্যতে একত্রে ব্যবহৃত হইবে।

আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ইংলণ্ডের এইরূপ অধীনতায় প্রায় ৪০ বৎসর থাকিবার পরে, (১৮৫৩ সালে) ক্রিমিয়া যুদ্ধ বাধে এবং ইংলণ্ড রুসিয়ার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধের সময় একখানি আইওনিয়ান বাণিজ্য-জাহাজ কোন রুসিয়া বন্দরে যাইবার কালে, ইংরাজ হস্তে বন্দী হয়। তৎপরে প্রশ্ন উঠে যে, সেই বাণিজ্য-পোত বাজেয়াপ্ত হইবে কি না? বিলাতের য়্যাড্‌মিরাল্‌টি আদালত তাহাতে এইরূপ রায় প্রকাশ করেন;—"যদিও আইওনিয়ান দ্বীপের অধিবাসিগণ সন্ধির নিয়মানুসারে, ইংলণ্ডের মহারাণীর অধীন, তথাচ তাহারা ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা নহে। সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে যখন তাহারা বাণিজ্য-ব্যাপারে, ব্রিটিশ প্রজাদের মত সুবিধাভোগী নহে, তখন তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কখনই ন্যায়-সঙ্গত হয় না। ইংলণ্ডের শত্রুগণের সহিত যে তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে না, এমন সর্ত্ত সন্ধির মধ্যে নাই। এরূপ স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে, ধর্ম্মাধিকরণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মীমাংসা করিতে পারেন না। অতএব তাহাদের বাণিজ্যপোত সর-কারে জব্দ হইবে না।

ব্রিটিশ আদালত ইংলণ্ডে যেমন সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, মণিপুর সম্বন্ধে এইরূপ পক্ষপাতশূন্য এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত বিচার হওয়া উচিত।

১২। উড়িষ্যায় করদমহল সমূহ মণিপুর অপেক্ষা অনেক নিম্ন পদবীস্থ এবং সে সমুদয় ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের অত্যধিক কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানাধীন হইলেও ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বীকার্য্য বাক্যানুসারে হাইকোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন যে, সে সমুদয় ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের মধ্যে নহে। এইরূপে ময়ূরভঞ্জকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং একথা নিশ্চয় যে, কিয়ঞ্জুড়ী বা ময়ূরভঞ্জ অপেক্ষা মণিপুর অনেক উচ্চ শ্রেণীর রাজ্য।

১৩। ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় রাজ্য মহারাণীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য আছে বটে। কিন্তু মণিপুর (২৪শে মার্চ্চ তারিখে) নেপাল প্রভৃতির মত স্বাধীন ছিল। ভারত-গভর্ণমেণ্টও মণিপুরের সহিত বরাবরই সেই ভাবেই চলিয়াছেন। ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান এই যে, "কোন ব্যক্তি, মহারাণীর সহিত মিত্রভাবাপন্ন এসিয়া দেশের কোন নৃপতির সহিত যদি যুদ্ধ বা তাহার সহায়তা অথবা তাহার উদ্যোগ করে, তবে সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে"—ইত্যাদি। এই ধারা অনুসারে মণিপুরের রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট ১৮৬৫ সালে কৈফা সিংহ নামক এক ব্যক্তির নামে কাছাড়ের আদালতে নালিশ করেন এবং তাহার দণ্ড হয়। সে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করাতেও আদালত দণ্ডবিধির ১২৫ ধারা অনুসারে তাহার দণ্ড স্থির রাখিয়া তদনুরূপ রায় প্রকাশ করেন। সেই রায়ে "মণিপুরের মহারাজাকে মহারাণীর সহিত মিত্র-ভাবাপন্ন একজন এসিয়া দেশের নৃপতি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার ১৮৬৭ সালে এইরূপ অপরাধে গভর্ণমেণ্ট সাজোপার নামে নালিশ করেন; তাহাতে সেও শাস্তি পাইয়াছিল।

১৪। ১৮৬৭ সাল হইতে এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহাতে মণিপুরের চির-স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে এমন কোন সন্ধি হয় নাই, যাহাতে মণিপুর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

১৫। কোন ব্রিটিশ আদালতে মণিপুরের মহারাজ ও যুবরাজ

প্রভৃতির নামে এইরূপ মোকদ্দমার বিচার হইলে গভর্ণমেণ্টকে মণিপুরের অধীনতা সর্ব্বাগ্রে সাব্যস্ত করিতে হইত এবং সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ না থাকায়, এরূপ মোকদ্দমা আদৌ টিঁকিত না।

১৬। বিগত ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের প্রতিনিধি মিঃ কুইণ্টনও মণিপুরকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। নচেৎ কুইণ্টন "যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার লিখিত হুকুম দিতে" অনুরোধ করিবার জন্য উক্ত দিবস অপরাহ্নকালে মিঃ গ্রীমউডকে মহারাজা কুলচন্দ্রের নিকট পাঠাইবেন কেন?

১৭। তৎপরে শেষ রাত্রে বিনা যুদ্ধ ঘোষণায়, ইংরাজ সৈন্যগণ অকস্মাৎ রাজবাড়ী আক্রমণ করিলে মণিপুরাধিপতির কর্ম্মচারী, সৈন্য ও অনুচরগণ তাহাদের প্রতিরোধ করায় উচিত কার্য্যই করিয়াছে। এক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ অগ্রে গোলাগুলি চালাইয়াছিল, তাহা আদৌ বিচার্য্যই নহে। যে মুহূর্ত্তে ইংরাজ-পক্ষ শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া আপনাদের মহারাজের প্রাসাদাদি রক্ষা ও শত্রুগণকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা মণিপুরী সৈন্য প্রভৃতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মই দাঁড়াইয়াছে। অতএব মহারাজের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করা অপরাধে অভিযোগ হইতেই পারে না, সেইরূপ সেই যুদ্ধে লিপ্ত কোন মণিপুরী প্রজাই কোনরূপে অপরাধী হইতে পারে না।

১৮। ইংরাজ-পক্ষ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলে, মণিপুরী সৈন্যসামন্তগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিয়াছিল, সেই কার্য্যে মহারাজ কুলচন্দ্র অনুমোদন করিলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তিনি ইংরাজরাজ্য আক্রমণ করেন নাই। রেসিডেন্সীর ইংরাজ কর্ম্মচারী বা সৈন্যগণের প্রতিও তাঁহার সৈন্যসামন্তগণ অগ্রে কোনরূপ শত্রুতাচরণ করে নাই।

যুবরাজ (ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি) টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

১৯। টিকেন্দ্রজিৎ পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলেন। পরে মহারাজ কুলচন্দ্র এবং মণিপুরের রাজদরবার ও প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক যুবরাজের পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

২০। সাক্ষীগণের এজেহারে পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা টিকেন্দ্রজিতের ছিল না। কুইণ্টনের পৌঁছিবার পূর্ব্বে রাজদরবারে (ইংরাজ পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ জন্য নহে) কেবল শূরচন্দ্রের মণিপুর প্রবেশ নিবারণের মন্ত্রণা হইয়াছিল। পরে যখন জানিলেন, শূরচন্দ্র সঙ্গে নাই, তখন টিকেন্দ্রজিৎ নিজে কুইণ্টনকে অভ্যর্থনা করিতে দুই ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত যান। ২৩শে মার্চ্চ রাজদরবারে ও মিঃ গ্রীমউডের নিকট এবং ২৪শে সন্ধ্যার পরে মিঃ কুইণ্টন প্রভৃতির সহিত সন্ধি সম্বন্ধে পরামর্শের সময় টিকেন্দ্রজিৎ যেরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ করিবার অভিপ্রায় আদৌ প্রকাশ পায় না। বরং তাঁহার সদ্ভাবপূর্ণ ইচ্ছাই বিশেষরূপে বুঝা যায়।

২১। টিকেন্দ্রজিৎ মণিপুরের মহারাজের ভ্রাতা, কর্ম্মচারী এবং প্রজা। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার বা কোনরূপ শাস্তি দিবার অধিকার কেবল তাৎকালিক মহারাজা কুলচন্দ্রেরই ছিল। ভারত-গভর্ণমেণ্ট ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কুলচন্দ্রের সাহায্য ও সম্মতিতেই তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মিঃ কুইণ্টনও ঠিক এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, মহারাজের নিকট "তাঁহাকে" অথবা "তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার লিখিত হুকুম" চাহিতে গ্রীমউডকে ২৩শে মার্চ্চ বৈকালে পাঠাইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের সাক্ষী বাবু রসিকলাল কুণ্ডুর এজেহারে প্রকাশ যে, তৎপরে মিঃ গ্রীমউডের সহিত যুবরাজের দেখা হওয়ায় গ্রীমউডও এমন কথা বলেন নাই যে, মহারাজার অনুমতি ব্যতীতও ইংরাজেরা নিজের জোরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবেন।

২২। দরবার বা নাচের মজলিস প্রভৃতির ছলনা করা নিতান্ত

অন্যায় হইয়াছিল। তাহাতে যুবরাজের মনে শঙ্কার জন্মিয়াছিল যে, সেইরূপ স্থলে (তিনি আহ্বানমত উপস্থিত হইলে) মহারাজাকে সম্মতি দিতে বাধ্য করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

২৩। রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণের মধ্যে মহারাজের খাস মহলের নিকটেই যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী অবস্থিত। শেষ রাত্রে অবৈধরূপে ইংরাজ সৈন্যগণ প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সহসা তাঁহার বাড়ী আক্রমণ ও মহারাজের সৈন্য ও রক্ষক প্রভৃতির সহিত বিরোধ বাঁধানতে রাজ্যপাট ও আত্মরক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই টিকেন্দ্রজিৎ মনে করিয়াছিলেন। ইংরাজগভর্ণমেণ্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের পূর্ব্বাপর যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে এইরূপ ধারণা হওয়াই সঙ্গত। সে ধারণা গভর্ণমেণ্টের মতে যদি ভ্রমাত্মকই হয়, তথাচ তিনি সেক্ষেত্রে যেরূপে ইংরাজ-সৈন্যের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহাকে "মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধ" বলিয়া কখনই গণ্য করা হইতে পারে না। আবার সমর-স্থগিতের শিঙ্গারব শুনিবামাত্রই, তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়াতেও তাঁহার মনের ভাব বেশ জানা যাইতেছে।

২৪। ইংরাজ সৈন্যগণ সেরূপ ব্যবহার না করিলে তিনি কখনই কোনরূপে বিরুদ্ধাচারী হইতেন না। সেরূপ ব্যবহার না করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিবার অথবা গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দিবার জন্য মহারাজাকে জিদ করা উচিত ছিল।

২৫। সেনাপতি নিজেও গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত দেশত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনামতে কিছু সময় দিলে এবং মহারাজাকে আবশ্যকমত অনুরোধ করিলে মণিপুরে সেই মহাবিভ্রাট আদৌ ঘটিত না।

২৬। কুইণ্টন প্রভৃতির মৃত্যু সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজ ও যুবরাজ যে মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কেবল (যুবরাজের

দরখাস্ত অনুসারে) থঙ্গাল জেনারেলের কুবুদ্ধিতেই ঘটিয়াছিল।* তাঁহারা সে সময়ে মহাভয়ে আকুল হইয়া কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সৈন্য মণিপুরে পৌঁছিয়াই দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই বিপদ ঘটাইবে। মণিপুরের অসভ্য পাহাড়ী জাতিদের ধরণ বাল্যকাল হইতে দেখিয়া যুবরাজ প্রভৃতির মনে এই কু-সংস্কার জন্মিয়াছিল। শিক্ষা, অভ্যাস, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির ভিন্নতা অনুসারে মনুষ্যের ধারণা ও কার্য্য-পদ্ধতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে কতদূর পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায্য-বিচারপ্রিয়, তাহা তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন নাই।

২৭। সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই জগৎ সমক্ষে দেখাইবেন যে, শত্রুগণকে দমন ও পেষণ করিবার প্রভূত শক্তি থাকিলেও, তাঁহারা কোনরূপ অন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করেন না। বরং সত্য, ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণের উচ্চ আদর্শ জগতকে দেখাইয়া তাঁহারা ভারতবাসীর আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অধিকার করিয়া থাকেন।”

* মণিপুর রাজ্য মধ্যে থঙ্গাল জেনারেলের প্রতিপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে “বিচার” অধ্যায়ের শেষ ভাগে বিস্তারিত লেখা আছে। ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষও এখানে সেইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই মন্তব্যে এবং বিচার বিষয়ের অধ্যায়ে আমাদের নিজের কথাও কতক কতক আছে।

[৩৬]

পররাষ্ট্র বিভাগ।

সিমলা, ২১শে আগষ্ট, ১৮৯১ সাল।

[মণিপুর বিশেষ আদালতের রায় ও ব্যারিষ্টার ঘোষের মন্তব্যাদি পাঠের পর ইহাই গভর্ণমেণ্টের শেষ হুকুম।]

নং ১৭০০ ই, মণিপুরের অপরাধীদের বিচার ও মণিপুর রাজ্য প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও ঘোষণাপত্র সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের আদেশানুসারে প্রকাশিত হইল।

ভারত-গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগীয় কার্য্যবিবরণীর সারাংশ।

মন্তব্য।

বিগত মার্চ্চ মাসে মণিপুর রাজ্য প্রকাশ্যভাবে, অস্ত্র-বলসংযোগে ভারত-সাম্রাজ্ঞীর সৈন্যগণকে প্রতিরোধ করিয়াছিল; এবং এইরূপ প্রতিরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ যখন চলিতেছিল, তখন সেই মহারাণীর একজন প্রতিনিধি ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ নাশ করিয়াছিল। তজ্জন্য ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা মণিপুর অধিকৃত হইয়াছিল এবং যে সকল ব্যক্তিকে হত্যাকারী বা তাহার সহায়তাকারী বা বিদ্রোহী বা বিদ্রোহ-উত্তেজক বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে বিচারাধীন করিতে সৈন্যদলের প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সেই আজ্ঞানুসারে রাজ-অছি কুলচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ (টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ ও অঙ্গেয় সিংহ) এবং অন্যান্য ব্যক্তি বন্দীকৃত হইয়া বিচারাধীন হইয়াছিল।

১। এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ অত্যাবশ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি সকলকে গুরুতর অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে সে সমস্ত হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

২। একথাই যথার্থই বটে যে, একজন (ব্রিটিশ প্রজা নিরঞ্জন) ভিন্ন অন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রিটিশ ভারতের প্রচলিত রাজবিধি অনুসারে বিচারাধীন হইতে পারে না। যে প্রকার আদালতে তাহাদের বিচার হইয়াছিল, সেই আদালতগুলি যে বিশেষ হুকুমের বলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেবল সেইরূপ বিচারের ক্ষমতা পাইয়াছিল, ইহাও সত্য। মিঃ মনোমোহন ঘোষ যথার্থই বুঝিয়াছেন যে, যে সব গুরুতর অপরাধ কোন ব্রিটিশ আদালতেই বিচার্য্য নহে, তেমন অপরাধের বিচার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি পরিচালন করিয়া সেইরূপ আদালত স্থাপনের হুকুম দিয়াছিলেন। যে আদালতে, রাজ-অছি ও তাঁহার ভ্রাতাদের বিচার হইয়াছিল, তাহাতে (মণিপুরে যে সকল সৈন্যদল ছিল, তাহাদের দুই জন প্রবীণ সামরিক কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের সহকারী স্বরূপ একজন বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞ ডেপুটী কমিশনার ছিলেন) অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মণিপুরের প্রধান (পলিটিকেল) রাজ্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিচারাধীন হইয়াছিল।

৩। রাজ-অছি মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং আসামের চিফ কমিশনার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের হত্যাসহায়তাকারী সাব্যস্ত হওয়াতে আদালত তাঁহারও প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অঙ্গেয়সেনাও টিকেন্দ্রজিতের মত অপরাধী সপ্রমাণ হওয়াতে তাঁহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল।

এই সকল দণ্ড মঞ্জুরের জন্য (পূর্ব্ব আদেশমত) সমস্ত কাগজ পত্র ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইয়াছিল।

প্রধান পলিটিকেল কর্ম্মচারী নিম্নস্থ এই সকল লোকের বিচার করিয়াছিলেন ;—(১) থঙ্গাল সিংহ বা থঙ্গাল জেনারেল, (২) কজেয় মণিপুরী, (৩) নিরঞ্জন সুবেদার, (৪) সামুসিংহ বা লুয়াঙ্গ নিংথো কর্ণেল, (৫) নীলমণি সিংহ বা আইয়া পারেল মেজর, (৬) মায়াসিংহ মেজর, (৭) লোকেন্দ্র বীরজিৎ সিংহ বা ওয়াংখাই লাকৃপা, (৮) উরু সিংহ বা উসর্ব্বা, (৯) অবঙ্গজয় বা এক্কর্ব্বা (১০) চোবে হাইদার মাকাহাল, (১১) ঘন সিংহ কাঙ্গদ্রা (১২) কম্বা সিংহ লাইশ্রবা (১৩) ধ্বজসিংহ মানের্ব্বা (১৪) ননীসিংহ নেপ্রামাকাহাল (১৫) ত্রিলোক সিংহ নংথোলবা সাতোয়ালও (১৬) ধানসিংহ সুগোল সেনবা।

চিফ কমিশনার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর হত্যাকারী বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে, থঙ্গাল সিংহের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল। মিঃ গ্রীমউডের হত্যাকারী সাব্যস্ত হওয়ায় কজেয় মণিপুরীর প্রতিও প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল।

সামুসিংহ কর্ণেল এবং আয়া পারেল মেজর, মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও হত্যাসহায়তাকারী—মায়াসিংহ মেজর এবং (ব্রিটিশ প্রজা ও মহারাণীর দেশী সৈন্যদলের ভুতপূর্ব্ব সৈনিক) নিরঞ্জন সিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রমাণিত হওয়ায়, প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অপর সমস্ত আসামীই চিফ কমিশনার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের হত্যাকারী সপ্রমাণ হওয়াতে, তাহাদের সকলেরই প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল।

৪। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দুই জন আসামী (কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ) আপীল করিয়াছেন। তাঁহাদের আপীলের দরখাস্ত, তাঁহাদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের যুক্তি ও তর্কপূর্ণ বিবরণ পত্র এবং উপরোল্লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র এক্ষন সকাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেলের নিকট আসিয়াছে।

৫। রাজ-অছি ও সেনাপতির পক্ষে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের

মোকদ্দমার সময় উকীল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার সুবিধা তাঁহারা পান নাই। এটি ভ্রম। মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহারা সে জন্য কোন দরখাস্তই করেন নাই। তৎপরে ব্যারিষ্টারের দ্বারা তাঁহাদের মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ প্রদর্শন করিবার প্রচুর সময় দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের বর্ণনাপত্রে লিখিত এবং ভারতগভর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে।

৬। আসামীদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন যে, মণিপুর স্বাধীন রাজ্য ছিল, সুতরাং মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানকার শাসনকর্ত্তাগণের (রাজা কর্ম্মচারী প্রভৃতির) আদৌ বিচারই হইতে পারে না। একথাও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা পর্য্যন্তও করেন নাই; অথচ সৈন্যগণ সেনাপতির বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল; সেক্ষেত্রে তাহার প্রতিরোধ করায় তাঁহাদের কিছুমাত্রই অন্যায় হয় নাই।

সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল এ যুক্তি আদৌ স্বীকার করিতে পারেন না। মণিপুর রাজ্য যে পরিমাণে ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীন তাহা এই সকল মোকদ্দমার সংস্রবে একাধিকবার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া মানিতেই হইবে যে, মণিপুর সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তির অধীন ও আশ্রিত রাজ্য। সেই শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে মণিপুর অবশ্যই বাধ্য এবং মণিপুর রাজ্যে ভারত-গভর্ণমেণ্টের আইনসঙ্গত হুকুম বিরুদ্ধে যে বল প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, (তাহা যুদ্ধ করা, বিদ্রোহ, রাজদ্রোহিতা অথবা যে কোন নামেই অভিহিত করা হউক) তাহা এরূপ অপরাধ অবশ্যই বটে, যে জন্য তৎকার্য্য-সংলিপ্ত ব্যক্তিগণকে এবং মোটের উপর সমস্ত রাজ্যকে এমন শাস্তি ও শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে তাহা অন্যান্য স্থলে আদর্শ স্বরূপ হইবে। ভারত-গভর্ণমেণ্ট মহারাণীর স্থলাভিষিক্ত মাত্র এবং সমস্ত দেশীয় রাজ্যই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন। অতএব ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যের সংস্রব সম্বন্ধে অন্তর্জাতিক নিয়ম-সূত্র আদৌ খাটে না। এক টির সর্ব্বপ্রাধান্য

থাকাতেই অপর সমস্তের অধীনতা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। মণিপুর কিম্বা অন্য কোন আশ্রিত রাজ্যে যে কোন ব্যক্তির থাকা আপত্তিজনক মনে হয়, তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিবার অধিকার ভারত-গভর্ণমেণ্টের অবশ্যই আছে। এ অধিকার কোন আইনকানুন অনুসারে নহে—ইহা সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তি পরিচালনা হইতে সমুৎপন্ন। এ সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তিও করিতে পারে না। স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় (পলিটিকেল) প্রতিনিধি দ্বারা দরবার বসিবার আদেশ দিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের ছিল এবং সেনাপতির নির্ব্বাসন সম্বন্ধে আমাদের আজ্ঞা প্রতিপালিত না হইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তার করাও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল। সকাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেলের মত এই যে, সেইরূপ গ্রেপ্তার বলপূর্ব্বক নিবারণ ও সশস্ত্র প্রতিরোধিতা, বিদ্রোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রিটিশ ভারতে মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট লইয়া পুলিশ কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার করিতে গেলে, যেমন কোন ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে আত্মরক্ষার দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, ইহা ঠিক সেইরূপ।

৭। অতএব মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে, আসামীরা বিচার যোগ্য; উকিল, ব্যারিষ্টার দিবার সম্পূর্ণ সুবিধা ও সুযোগই তাঁহাদের ছিল এবং বিচার পদ্ধতির কোনরূপ গোলযোগেই, তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই।

৮। সংগৃহীত সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির উপর যেরূপ বিচার হইয়াছে, তাহার ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেলের মীমাংসা নিম্নে বিবৃত হইল।

৯। রাজ-অছি কুলচন্দ্র (কার্য্যতঃ) বিদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। যে সময় প্রস্তাবিত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, তখন তিনি মণিপুরের (সর্ব্ববাদিসম্মত) শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বে যুবরাজ ছিলেন; এবং মহারাজ শূরচন্দ্রের মনের মধ্যে যাহাই কেন থাকুক না, (ইহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে) তিনি তরবারি ও রাজ-পরিচ্ছদ অর্পণ করিয়া যেরূপ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছিল যে, তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে আসামী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি মহারাজার উপাধি ও প্রভুত্ব গ্রহণ করায়, রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির দায়িত্বও তিনি অবশ্যই লইয়াছিলেন। তাঁহার স্বপক্ষে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি কার্য্যতঃ তাঁহা অপেক্ষা সমধিক তেজীয়ান প্রকৃতির একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভিমতের অধীন হইয়াছিলেন। * * অতএব তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিকই হইয়াছে। তথাচ তাঁহাকে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক বিবেচনায়, গভর্ণর-জেনারেল, তাঁহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে, চির-নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

১০। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতই বিদ্রোহের প্রকৃত নেতা ছিলেন; এবং মণিপুর রাজ্য মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ব্যক্তি। একথা অস্বীকার করা হয় নাই যে, তিনি ভারতসাম্রাজ্ঞীর সৈন্যগণের বিরুদ্ধে, মণিপুরী সৈন্যদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির বাসস্থান—যাহা আক্রমণ-সহনোপযোগী রূপে প্রস্তুত হয় নাই এবং যাহাতে কামানাদি কিছুই ছিল না এবং যাহাতে তখন কয়েক জন আঘাতপ্রাপ্ত লোক ও বিশেষতঃ একজন ইংরাজ-মহিলা ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া অনধিক দূর হইতে কামান দাগিয়াছিলেন। হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে সকল বিষয় প্রমাণ হইয়াছে, তাহারও যথার্থতা বিষয়ে তিনি স্বীকার করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। সন্ধি-ধার্য্য সম্বন্ধে মৌখিক পরামর্শ জন্য, চিফ-কমিশনার ও তাঁহার সঙ্গী-গণকে কেল্লার মধ্যে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেনাপতি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অধিক যুক্তি তর্ক না করিয়াই, ব্রিটিশ সৈন্যগণের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিবার কথা দৃঢ়তার সহিত বারম্বার জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। সেই প্রস্তাবে কমিশনার সম্মত না হওয়ায়, তিনি চলিয়া গেলেন। চিফ-কমিশনার ও তাঁহার সঙ্গীদের চারিদিকে ভয়ানক উত্তেজিত ও বিষম আশঙ্কাপ্রদ লোকের দল ঘিরিয়া থাকিলেও তিনি তাঁহাদের নিরাপদে রেসিডেন্সিতে ফিরিবার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত বা সতর্কতা অবলম্বনই করিলেন না। কিন্তু সাক্ষী অঙ্গেয় মিঙ্গতো তাঁহাকে বলায়, তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন যে যদি সে পারে, তবে যেন তাঁহাদিগকে রেসিডেন্সি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া আসে। যখন

তাঁহারা আক্রান্ত ও মিঃ গ্রীমউড বর্ষা-বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেনাপতি ফিরিয়া, বিশৃঙ্খল লোক জনকে তাড়াইয়া দেন এবং সাহেবদিগকে দরবার গৃহে রাখেন। তৎপরে তিনি দুর্গ-প্রাচীরে চলিয়া গিয়াছিলেন ; সাক্ষী উসর্ব্বা এবং যাত্রা সিংহ অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, তাঁহাকে সেই স্থানে দেখিয়া বলিয়াছিল যে, থঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছেন। সেনাপতি উত্তর করিলেন যে, তিনি আসিয়া থঙ্গালের সহিত সে কথা কহিবেন। তৎপরে তিনি দুর্গ-প্রাচীর পরিভ্রমণ করিয়া, তোপ-গারদে ফিরিলেন ; এবং সাহেবদিগকে হত্যা করা উচিত কিনা, এসম্বন্ধে থঙ্গাল জেনারেলের সহিত কথা বার্ত্তা করিলেন। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে থঙ্গাল জেনারেল আবার সাহেবদিগকে হত্যা করিবার স্পষ্ট হুকুম দিলেন ; তৎকালে সেনাপতিও সেই ঘরে শুইয়াছিলেন। যে সকল অনুচরেরা ইতিপূর্ব্বে থঙ্গাল জেনারেলের নিজের হুকুম অনুসারে কার্য্য করে নাই, তাহারাই এখন সরকারী জল্লাদদিগকে ডাকাইয়া, সাহেবদিগকে হত্যা করাইল।

সেনাপতির জবাব এই যে, তিনি একে পীড়িত ছিলেন, তাহাতে আবার অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সাহেবদের হত্যার পর, কামান-বন্দুকের আকস্মিক শব্দে, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল ;—নিদ্রার পূর্ব্বে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহার যুক্তি তর্কে থঙ্গাল জেনারেল, সাহেবদিগকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সেনাপতি যে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, পীড়ার জন্য তাহার কিছুই প্রতিবন্ধক হয় নাই। তিনি জানিতেন যে দরবার হলে, ইংরাজ কর্ম্মচারীরা তাঁহার ক্ষমতাধীন রহিয়াছেন। * * * * ভারত-গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, সেনাপতির ইচ্ছার বিরুদ্ধ,

থঙ্গাল জেনারেল ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিতে সাহস করিলেন; অতএব মীমাংসা হইল যে, (অনুচরেরা যেমন বুঝিয়াছিল) সেই হত্যার হুকুম (থঙ্গাল জেনারেল ও সেনাপতি) উভয় কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং অভিযোগের দুইটি বিষয়েই তিনি দোষী; এজন্য তাঁহার প্রতি যে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

১১।১২।১৩। থঙ্গাল জেনারেলের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই; অতএব তাঁহারও প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে।

কজেয় মণিপুরী গ্রীমউডকে হত্যা করা স্বীকার করিয়াছে; নিরঞ্জন সুবেদার ব্রিটিশ প্রজা হইয়াও মহারাণীর সৈন্যগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

রাজকুমার অঙ্গেয় সিংহ সৈন্যাধ্যক্ষতা করিয়াছেন; সামু সিংহ, নীলমণি সিংহ, মায়া সিংহ এবং লোকেন্দ্র বীরজিৎ সিংহ, ইহারা সকলেই মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে; ইহাদের সকলেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ও তাহাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জব্দ হইল।

উরুসিংহ প্রভৃতি অপর সমস্ত আসামীরা হত্যার অপরাধে জড়িত বটে; কিন্তু তাহারা আজ্ঞাধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছিল; এজন্য তাহাদের সকলেরই যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইল।

ঘোষণাপত্র।

যেহেতু মণিপুর রাজ্য সম্প্রতি মহারাণী ভারত-সাম্রাজ্ঞীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহী হইয়াছিল; এবং যেহেতু সেই বিদ্রোহের সময়, সেই মহারাণীর প্রতিনিধি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে, বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে তাহারা হত্যা করিয়াছিল এবং যেহেতু ১৮৯১

সালের ১৯শে এপ্রেল তারিখের ঘোষণার দ্বারা রাজ-অছি কুলচন্দ্রের প্রভুত্ব লোপ হওয়ার কথা ব্যক্ত করিয়া সেই রাজ্যের শাসনভার মণি-পুরস্থিত মহারাণীর সৈন্যগণের প্রধান অধিনায়ক নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্ত হইতেছে যে, মণিপুর রাজ্য যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহা ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছে এবং আপাততঃ তাহা মহারাণীর অনুগ্রহ ও স্বেচ্ছাধীন আছে।

ইহা ও ব্যক্ত করা যাইতেছে যে, মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া মণিপুর রাজ্যটিকে তাঁহার ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিবেন না ; তিনি পরম দয়াপরবশ হইয়া মণিপুরে দেশীয় শাসনকর্ত্তা পুনঃস্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন ; অতএব সকাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেল যাঁহাকে যেরূপ সর্ত্তে মনোনীত করিবেন, তিনি তদনুরূপ শাসনকর্ত্তা (রাজা) হইবেন।

বিদ্রোহের নেতাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইল, তাহাতে এবং মণিপুর প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম ধার্য্য হইবে, তাহাতে মহারাণীর আধিপত্য বিলক্ষণ প্রকাশিত হইবে—এই বিশ্বাসে, মহারাণী এইরূপ দয়ার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহাকে যেরূপ সর্ত্তে মণিপুর রাজ্য শাসন করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাহা সকাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেল, ইহার পরে প্রকাশ করিবেন।

এইচ, এম, ডুরাণ্ড।
ভারত-গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।